প্রবাহ

পঞ্চম সংখ্যা

মানিকের সংকলন

প্রবাহ (৫)
প্রকাশ কাল ঃ
২২ মে, ২০২৫

প্রকাশক ঃ
মানিক
প্রযত্নে, স্নেহময় গাঙ্গুলী
চারুপল্লী, বোলপুর, বীরভূম
দূরভাষ - ৯৪৭৫০০৭১৬৮

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা ও রূপায়ণে ঃ
জয়কৃষ্ণ চ্যাটার্জী

প্রচ্ছদ পরিচিতি ঃ
ব্রহ্মসমুদ্র থেকে ধেয়ে আসছে চৈতন্যের প্রবাহ।

বর্ণসংস্থাপক ঃ
এস. বি. প্রিন্টার্স
১৯ই/এইচ/৩৩, গোয়াবাগান স্ট্রিট
কলকাতা-৭০০০০৬

মুদ্রক ঃ
গ্যালাক্সি প্রিন্টার্স
২২, গিরিশ এভিনিউ
কলিকাতা-৭০০০০৩

মূল্য ঃ ১৫০.০০ টাকা

প্রাপ্তিস্থান

১) শ্রীধর ঘোষ
চারুপল্লী, ওয়ার্ড নং-৩
বোলপুর, বীরভূম।
দূরভাষ ঃ ৯৮৫১৬২৬৫৫৯

২) তরুণ ব্যানার্জী
জামবুনি, ওয়ার্ড নং-৫
বোলপুর, বীরভূম
দূরভাষ ঃ ৭৯০৮১৮৮৫৭৩

৩) রাজীব রায়চৌধুরী
সখের বাজার, কলকাতা-৩৮
দূরভাষ ঃ ৮৬১৭৭৯৬১৭৯

৪) অমরেশ চ্যাটার্জী
ইলামবাজার, বীরভূম।
দূরভাষ ঃ ৮২৫০৭১৩৮৯৯

৫) পার্থসারথি ঘোষ
বেলঘড়িয়া, কলকাতা
মোঃ ৭৯৮০৪৪৫৪৭২

৬) গীতা বসাক
আমতলা, দঃ ২৪ পরগণা
মোঃ ৭৪৩৯৬১২৩৪৬

৭) রুদ্রনাথ দত্ত
গড়গড়িয়া, বীরভূম
মো ঃ ৯৭৩২২২৯৮২৫

৮) স্বপন ভট্টাচার্য
বাগুই আটি
মোঃ ৯৪৩১১৯০৩২৫

প্রাক্‌কথন

ঈশ্বর, ভগবান, আল্লাহ বা গড (God) যাই বলি না কেন আর মানুষের মধ্যে এর ধারণা যতই ভিন্নতর হোক না কেন, যে সাধারণ বিশ্বাসকে সব সম্প্রদায়ের মানুষই আঁকড়ে ধরে থাকেন তা হ'ল এর শাশ্বত কালের অস্তিত্বের ধারণা। এই নিয়ে কোন সম্প্রদায়ের মধ্যেই কোন মতভেদ নেই। বাস্তবিক ঈশ্বরের ধারণাটি যেমন অস্পষ্ট, এর প্রকাশের সূচনা কালটিও ঠিক তেমনি ভাবেই অস্পষ্ট থেকে গেছে মানুষের মধ্যে।

বস্তুতপক্ষে ঈশ্বর একটি চৈতন্যসত্তা। এখন প্রশ্ন এই চৈতন্যসত্তাটি কি প্রথম থেকেই সমানভাবে অস্তিত্ব নিয়ে বিরাজ করছে এই জগতে? দ্বিতীয়ত, এই চৈতন্যের কি আর কোন বিকাশের সম্ভাবনা নেই?

প্রথম প্রশ্নের উত্তরে এক কথায় বলা যায় যে প্রথম থেকেই এর অস্তিত্ব ছিল। কিন্তু তা বিভিন্ন মানুষের চেতনায় নানাবিধ খণ্ডচেতনা রূপে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল। কোন একজনের মধ্যে সমগ্র চৈতন্য সংগৃহীত ও সংকলিত হয়ে অখণ্ডচৈতন্য পূর্ণ রূপ পায় নাই। অন্যকথায় বলা যেতে পারে এটি মানব সম্পদের কাঁচামাল (Raw material) হিসাবে ছিল। যেমন কয়লা, পেট্রোলিয়াম লোহা ইত্যাদি মাটির নীচে ছিলই কিন্তু তাকে জানা এবং মাটির নীচ থেকে তুলে মানুষের ব্যবহার উপযোগী করে গঠন করা দরকার। তা না হলে তাকে সম্পদ বলা যায় না। যখন মানুষ সম্পদ নিয়ে ভাবতে শুরু করে তখন নানান ভাবনা শুরু হয়। কিন্তু একজন মানুষ যখন তা আবিষ্কার (discover) করে এবং তাকে সম্পদ হিসাবে একটি রূপ দান করে (invention) তখন থেকেই তা মানুষের জীবনে সম্পদ হিসাবে গণ্য হয়।

মানুষের ঈশ্বরীয় ভাবনার প্রথম প্রকাশ ঘটে তার উচ্চ জৈবী চেতনায় তথা বাহ্যচৈতন্যে যেখানে মন সর্বদা বহির্মুখী থাকে। এই বাহ্যচৈতন্যকে চিরন্তন বাহ্যচৈতন্যও বলা যায়। এই বাহ্যচৈতন্যে নানান অলৌকিক শক্তির কল্পনা এসে পড়ে। যাকে ধর্মচেতনা নামে অভিহিত করা হয়। কিন্তু এই ধর্মচেতনা মানুষকে সম্পূর্ণ বহির্মুখী করে তোলে। এখান থেকেই অনার্য কৃষ্টির জন্ম—নানা পূজা অর্চনা, ভয় ভক্তি, স্বর্গ নরকের ভাবনা ও অলৌকিক শক্তি নিয়ে মানুষ ঈশ্বরের উদ্ভট রূপ কল্পনা করতে থাকে।

পরবর্তীকালে বৈদিক যুগে আর্যদের মধ্যে কোন কোন ঋষির কিছু ঈশ্বরীয় দর্শন ও অনুভূতি শুরু হয়। এতে তাদের ধারণায় এসেছিল যে মানুষের মধ্যে অনন্ত শক্তি আছে। কিন্তু তাদের কোন একজনের মধ্যেও ধারাবাহিক সমস্ত অনুভূতি হয়ে অর্থাৎ সাধন হয়ে প্রাণশক্তির গঠনমূলক পরিবর্তন হয়ে অখণ্ড মানবচৈতন্য বা জগৎচৈতন্যের গঠন সম্পূর্ণতা না পাওয়ায় জগৎচৈতন্য সম্পর্কে তাদের ভাবনা বিভিন্ন দর্শন অনুভূতির প্রভাবে কিছুটা অন্তর্মুখী হয়েও পরে আবার বহির্মুখী হয়েছে। চেতনার পূর্ণ বিকাশ না হওয়ার কারনে তারা এই শক্তি অসীম, অনন্ত, এত বৃহৎ যে তার ইতি করা যায় না—ইত্যাদি কথা বলেছে। তার নাম দিয়েছে ব্রহ্ম, পরমব্রহ্ম, পরমাত্মা ইত্যাদি। কোন ঋষির সূর্যমণ্ডলস্থ পুরুষের দর্শন হলেও নিজে সূর্যমণ্ডলস্থ পুরুষ তথা জগৎচৈতন্যের ধারক বাহক হয়ে ওঠেন নি। তাই তার দর্শনের কথা শুনে পরবর্তী কোন ঋষি বলেছেন যে, সকল চৈতন্যের উৎস ঐ সূর্যমণ্ডলস্থ পুরুষ তথা জগৎচৈতন্য। এই সিদ্ধান্ত আত্মিক জগতের উপলব্ধি থেকে নয় বরং বাইরে সকল শক্তির উৎস সূর্যের সঙ্গে মিলিয়ে বলতে চেয়েছেন। তাই পরবর্তীকালে এইসব দর্শনের কথা শুনে ও পড়ে মানুষের মন বহির্মুখী হয়ে গেছে। বাইরের সূর্যের মধ্যে সেই পুরুষ আছে এটা ভেবে নিয়েছে। ফলে প্রতীকতত্ত্বে মন আবদ্ধ হয়েছে এবং প্রতীককেই সত্য বলে মনে করেছে।

তাই নানা কাহিনী ও ঈশ্বরীয় রূপের সৃষ্টি হয়েছে। কল্পবিজ্ঞানের মতো কল্প আধ্যাত্মিকতা চলে এসেছে। যেখানে ঈশ্বর, আল্লা, গডের কাল্পনিক ধারনা সমস্ত বাহ্য ধর্মের ভিত্তি হয়ে ওঠে। তাই স্বামীজী বললেন, All the religions are but hypothesis. এমনকি বেদান্তের আত্মার ধারণাকেও তিনি কাল্পনিক বলেছেন। কারণ এই আত্মার ধারণার কোন স্পষ্ট রূপ তার কাছে ধরা পড়ে নি। তাই বিভিন্ন ধর্মশাস্ত্র পড়ে তিনি বিভ্রান্ত হয়ে বলছেন—"সত্য কোনটা?" বিভিন্ন শাস্ত্র যে আলাদা আলাদা বিভ্রান্তিমূলক কথাবার্তা বলছে। আর সমস্ত ধর্ম "আচার" সর্বস্ব হয়ে উঠেছে। ফলে তা সত্যকার মানুষের ধর্ম থেকে সহস্রযোজন দূরে সরে এসেছে। জগতের সব কিছুর মধ্যেই যেন ঈশ্বর—এই বাহ্য ভাবনাই প্রভাব বিস্তার করেছে।

আমরা দীর্ঘসময় পেরিয়ে এসে দেখছি যে শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন, এই চৈতন্যের সর্বোচ্চ প্রকাশ মানুষের মধ্যে। কিন্তু সর্বোচ্চ প্রকাশ বললে আংশিক প্রকাশের কথাও মাথায় চলে আসে। ফলে অখণ্ড জগৎচৈতন্য সম্পর্কে আবার বিভ্রান্তি

আসে। মনে হয় অন্যপ্রাণীদের মধ্যেও এই চৈতন্যের অস্তিত্ব আছে। তাই মানুষের মন থেকে গরুপুজো, গাধাপুজো, সাপ পুজো বন্ধ হ'ল না। মানুষের মন অন্তর্মুখী হল না। জগৎচৈতন্যের পূর্ণ গঠন শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যেও হল না। কেননা তার ব্যষ্টির সাধন অর্থাৎ জগৎচৈতন্যের বীজ অবস্থা থেকে পূর্ণ বিকাশ যা সাধকের দেহসীমায় আবদ্ধ থাকে তা ষোলআনা হয় নি।

পরবর্তীকালে আমরা দেখছি শ্রীজীবনকৃষ্ণের মধ্যে ব্যষ্টির সাধন পূর্ণমাত্রায় হলো। তিনি সম্পূর্ণ রূপে সংস্কারমুক্ত এবং ঊর্ধ্বরেত পুরুষ হওয়ায় তার মধ্যে চৈতন্যের প্রকাশ সঠিক ধারায় ও পূর্ণ মাত্রায় হলো। আত্মিক চৈতন্যের বিকাশের সূচনায় প্রথমে দুটি ধারার চেতনার জন্ম হয়। অর্ন্তচেতনা ও বাহ্যচেতনা। অন্তর্চেতনার বিকাশ অন্তরে যেন এক ঊর্ধ্বমুখী সরলরেখায় চলতে থাকে আর বাহ্যচেতনা যা দিয়ে অর্ন্তচেতনার মনন করা হয় তা বহির্মুখী হয়। ফলে অন্তর্চেতনায় সৃষ্ট দর্শন অনুভূতির ব্যাখ্যা বাইরের দিক থেকে করা হয়। এতে অর্ন্তচৈতন্যকে ঠিক ঠিক জানা হয় না ও তার বিকাশ একসময় থেমে যায়। কিন্তু সংস্কার মুক্ত মানুষের বাহ্যচেতনাও অন্তর্মুখী হয় এবং ভিতরে হয়ে চলা দর্শন ও অনুভূতি তার অন্তর্মুখীনতার মাত্রাকে বাড়িয়ে তোলে। তখন আত্মিক দর্শনের মনন যথাযথ হয়। এই অন্তর্মুখী বাহ্যচৈতন্যই সাধকের ব্যক্তিচৈতন্য বা আত্মিক আমি। এই আমি দিয়েই তিনি জগৎচৈতন্যের বিকাশ ধারার মনন করতে থাকেন ও প্রাণশক্তির গঠন পুনর্গঠন চলতে থাকে।

শ্রীজীবনকৃষ্ণের আত্মিক অনুভূতি শুরু হয় মাত্র তিন বছর বয়সেই যখন তার আদ্যাশক্তি (কালী মূর্তি) দর্শন হয়। তখন থেকেই তার মন বিশেষভাবে অন্তর্মুখী হতে থাকে। এই মন আরও অন্তর্মুখী হয় ১২ বছর ৪ মাস বয়সে যখন সচ্চিদানন্দ গুরু লাভ হয়। এই অবস্থায় বিভিন্ন দর্শন অনুভূতিকে কেন্দ্র করে মনন গভীর থেকে গভীরতর হতে থাকে ও প্রতিটি স্তরে প্রাণশক্তির গঠন পুনর্গঠন চলতে থাকে। বিজ্ঞানময় কোষে পঞ্চমভূমিতে মন উঠলে ''আমি'-কে জানার ব্যাকুলতা বৃদ্ধি পায়। এরপর ষষ্ঠভূমিতে জ্ঞানচক্ষু উন্মোচন হয়। সাধক এক জ্ঞান ধারণের উপযুক্ত আধার হয়ে ওঠেন। আদ্যাশক্তি এখন আরও সক্রিয় হয়ে ভাগবতী তনু হয়ে ওঠে ও সাধকের মনকে প্রবলভাবে অন্তরে আকর্ষণ করতে থাকে। এ যেন বিষ্ণুর মোহিনীমূর্তি হয়ে শিবকে আকর্ষণ করা। অতঃপর আয়াপ্পার জন্ম হয়। শিবচৈতন্যের নির্যাস আত্মায় পরিবর্তিত হয় এবং তা অঙ্গুষ্ঠবৎ আত্মার রূপ নেয়। শাস্ত্রে আত্মার কথা থাকলেও আত্মা সম্পর্কে সুস্পষ্ট

ধারণা জীবনকৃষ্ণের আগে কেউ লাভ করেনি। কারণ পূর্ণাঙ্গ আত্মা সাক্ষাৎকার কারও হয়নি। এই আত্মা দর্শনে ব্যক্তির আত্মিক আমি সূক্ষ্ম আমি-তে পরিবর্তিত হয়। সূক্ষ্ম মন সৃষ্টি হয়, ও তা স্থায়ীভাবে অন্তর্মুখী হয়। মননশীল এই সূক্ষ্ম মনের ক্রিয়া আত্মিক বিবর্তনকে অব্যাহত রাখে, পরিণতিতে নিজের ভিতর জগৎচৈতন্যের গঠন সম্পূর্ণতা পায়। প্রথম এই আত্মাকে জানতে গিয়ে আমি দেহ নই, আমি আত্মা—এই জ্ঞান হয়। পরে আত্মার মধ্যে জগৎ দর্শন হলে সাধক আত্মিক জগৎকে আবিষ্কার করেন যা বীজবৎ অবস্থায় তার ভিতরে রয়েছে বলে উপলব্ধি হয়।

পরবর্তীকালে নির্গুণ সাধনে স্থিত সমাধিতে ব্যষ্টির এই 'সূক্ষ্ম আমি' বোধেরও সম্পূর্ণ লয় হয় ও বৃহৎ আমি জন্ম লাভ করে। পরে তত্ত্বজ্ঞানে জগৎচৈতন্যের গঠন সম্পূর্ণ রূপ লাভ করে এবং অনুভূত হয় যে আমিই জগৎচৈতন্য অর্থাৎ আমারই ব্যষ্টিচৈতন্য বস্তুত জগৎচৈতন্য। অবতারত্বের সাধনে এই বৃহৎসত্তা বোধে বোধ হতে থাকে। দেবলীলায় সাধক জগৎবিক্ষেপ করে আবার তা গুটিয়ে নিয়ে বৃহৎব্যষ্টি হয়ে ওঠেন। তখন নিজের জগৎচৈতন্যসত্তার স্বরূপ পূর্ণ উপলব্ধিতে আসে। শুরু হয় বিশ্বব্যাপীত্বের সাধন। এই জগৎচৈতন্যই এক ও একমাত্র মানব, বৃহৎ মানব। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন যে এই মানুষের উপলব্ধিতেই আমরা জীবসীমা অতিক্রম করে মানবসীমায় উত্তীর্ণ হই। ইনি সর্বজনীন ও সর্বকালীন মানব। কিন্তু এই মানুষের সত্যকার রূপটির কথা তিনি বলতে পারেন নি। এই বৃহৎ মানবচৈতন্যের ধারণাগত রূপটি সম্পূর্ণতা পেল শ্রীজীবনকৃষ্ণের মধ্যে।

জগৎচৈতন্য আগেও ছিল। যেমন, আগেও সমুদ্রপথ বা এরোপ্লেন যাবার পথ ছিল কিন্তু সুনির্দিষ্ট সমুদ্রপথ (Sea route) বা প্লেন যাবার রাস্তা জানা ছিল না। ফলে ইংরেজরা আফ্রিকা ঘুরে ভারতে এলো। কেউ ভুল করে আমেরিকা চলে গেল। তেমনি মানুষ ভগবানকে তথা জগৎচৈতন্যকে জানতে চেষ্টা করেছে কিন্তু তার ক্রিয়া, প্রভাব, বিক্ষেপিত রূপ কিছুই জানতে পারেনি। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডজ্ঞানের ধারণা লাভ হলেও একজ্ঞান বা এক চৈতন্যসত্তাকে জানা হয়নি। এতদিনে যেন সমুদ্র সম্বন্ধে পূর্ণজ্ঞান লাভ করে সেফটি রুট ম্যাপ (Safety route map) বানানো হ'ল। জগৎচৈতন্যসত্তা সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা লাভ করে জীবনকৃষ্ণ একজ্ঞানের সংক্ষিপ্ত কিন্তু সার্বিক ধারণাগত একটি রূপ জগৎকে দান করলেন নিজের সঙ্গে মানুষকে আত্মিকে এক করে নিয়ে

(Abstract equality–স্থাপন করে)। জগৎচৈতন্য সত্তা দ্বারা আত্মিক জগৎ বিক্ষেপিত হয়। সেখানে বহু সামন্তরাল জগৎ (parallel world) রয়েছে। জীবনকৃষ্ণকে অন্তরে দেখে বা তার তেজ লাভ করে প্রাণশক্তির পরিবর্তনের মাধ্যমে মানুষ সেখান থেকে উত্তীর্ণ হয়ে একত্বের চেতনা লাভের পথ খুঁজে পেল।

বেদে বহু ঋষির দর্শন ও অনুভূতি সংকলিত হয়েছে। সংকলন করেছেন বেদব্যাস। আর এক প্রকার সংকলন হলো ধারণাগত। কতটা বোধে আনতে পেরেছেন ও তার সারাংশ সুবিন্যস্তভাবে উপস্থাপন করতে পারেন তা দেখে বলা যায় সাধকের মধ্যে বেদ সংকলিত হয়েছে। দেহে জগৎচৈতন্যের সংকলনে জীবনকৃষ্ণ উপলব্ধি করলেন ব্রহ্মচৈতন্যসত্তা কী। তিনিই প্রথম জগৎকে শোনালেন প্রাণশক্তির পরিবর্তনের ভাগবৎ কাহিনী। তার চিন্ময় রূপ যা সর্বশ্রেণীর মানুষ অন্তরে দেখে তা বস্তুত জগৎচৈতন্যের ধারণাগত রূপ, ব্রহ্মসমুদ্রের রুট ম্যাপ, প্রাণশক্তির পরিবর্তনে এক জ্ঞানের চেতনা লাভের পথ।

বহুমানুষের মধ্যে জগৎচৈতন্য বা সমষ্টিচৈতন্য হিসাবে চিন্ময়রূপে ফুটে উঠে তিনি তাদের মধ্যে জগৎচৈতন্যের অনুচৈতন্য দান করেন। সেই অনুচৈতন্য জীবকে জীবিত করে, তাদের মন অন্তর্মুখী হয়। প্রাণশক্তির গঠন পুনর্গঠন হতে থাকে, শেষে তাদের ব্যক্তির আমি নাশ হয়ে ব্যক্তিচৈতন্য জগৎচৈতন্যের সাথে বিমূর্ত একত্ব (Abstract equality) লাভ করে। তাদের খণ্ডচেতনার বহুত্বে তার একত্বের চেতনা প্রতিষ্ঠিত হয়। আর তখনই জগৎচৈতন্য যথার্থ ব্যবহার উপযোগী সম্পদ হয়ে ওঠে। একত্বের চেতনা দ্বারা মানুষ পরিচালিত হয় এবং সকল ধর্মীয় বিভ্রান্তি দূরে গিয়ে এই একত্ব লাভ-ই যে ধর্ম তা উপলব্ধি করে। তখন ধর্মের তথা জগৎচৈতন্যের কল্যাণকর রূপ চেতনায় ক্রমাগত বেশি করে প্রকাশ হতে থাকে।

অগণিত মানুষ যারা পাঠচক্রে ঈশ্বরচর্চার সাথে যুক্ত তারা তাদের বিভিন্ন দর্শন ও অনুভূতির দ্বারা এর স্বাক্ষর রেখে চলেছে। এবারের প্রবাহে তারই কিছু অংশ তুলে ধরা হলো। পূর্ববর্তী সংখ্যাগুলোর মতই এবারের 'প্রবাহ'ও সাধারণ মানুষের একত্বের চর্চার উপাদান হিসাবে কাজ করবে এই দৃঢ় বিশ্বাস আমাদের আছে।

ইতি—

৬ই মার্চ, ২০২৫ **প্রকাশক**

সূচিপত্র

	পৃষ্ঠা
মানিক ৭৭ সংখ্যা	৯—৬৮
মানিক ৭৮ সংখ্যা	৬৯—১৩১
মানিক ৭৯ সংখ্যা	১৩৩—১৯৩
মানিক ৮০ সংখ্যা	১৯৫—২৪৭

মানিক (৭৭ সংখ্যা)

ভূমিকা

সমষ্টির সাধন হলো একজন মানুষের মধ্যে জগৎচৈতন্য সংকলিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়ে সেই চৈতন্যের দ্বারা আপনা হতে বহু সাধারণ মানুষের (সাধকের) প্রাণশক্তির তথা কারণ শরীরের গঠনের পরিবর্তন ঘটা যা প্রাণশক্তির স্বরূপ প্রকাশ করে। এই স্বস্বরূপ জগতাত্মা, যিনি একাই আছেন, যিনি পূর্ণ একজ্ঞানে অধিষ্ঠিত তার একত্বের এককণা তথা অনুচৈতন্য সাধক লাভ করে ও ধীরে ধীরে তা পুষ্টিলাভ করে, যা সাধককে দ্বিতীয় স্তরে ঐ একজ্ঞান ধারণা করিয়ে দেয়। দেহে বর্তায় অর্থাৎ ব্রহ্মত্ব লাভ করায়।

এই সমষ্টির সাধনের চারটি ধাপ আছে।

১) প্রথমে নিয়ন্ত্রিত জগৎচৈতন্য অর্থাৎ সমষ্টিচৈতন্য তথা নির্গুণের ঘনমূর্তির চিন্ময় রূপ মানুষের অন্তরে ফুটে ওঠে আপনা হতে। কারণশরীরের গঠনের পরিবর্তনের ফলে এই দর্শন হয়। এই দর্শনে প্রাণশক্তির স্বস্বরূপ প্রকাশ পায় ও সঙ্গে সঙ্গে তার একত্বের এককণা তথা অণুচৈতন্য লাভ হয় সাধকের। এই প্রকাশ ও জগৎচৈতন্যের বোধ লাভ হলেও তখনও ব্যক্তিপূজার সংস্কার থাকে সাধকের মাথায়।

২) দ্বিতীয় ধাপে, আমি কে?—এই প্রশ্নের উত্তর পান সাধক। নিজের ও অন্য অনেকের দর্শন বিশ্লেষণ করে সাধক উপলব্ধি করেন এই সমষ্টিচৈতন্য তারই আপন বৃহৎ সত্তা। বস্তুত তিনি বোধমাত্র হয়ে এই সমষ্টিচৈতন্যের আনন্দস্বরূপ সত্তায় অন্তর্লীন হয়ে আছেন। এই পর্যায়ে সাধকের কারণশরীরের গঠন স্থায়ী রূপ লাভ করে। গঠন সম্পূর্ণতা পায়। ফলে দ্বিতীয় স্তরে ব্রহ্মত্ব লাভের জন্য প্রয়োজনীয় সকল দর্শন-অনুভূতি ধারণের উপযুক্ত হয় এই নতুন কারণশরীর। অদ্বৈতজ্ঞানে উত্তীর্ণ হওয়ায় এখন আর ব্যক্তিপূজার সংস্কার থাকে না।

৩) তৃতীয় ধাপ—এই পর্যায়ে সমষ্টিচৈতন্যের সঙ্গে একত্ব স্থাপিত হয় ও সাধক জগতের অপরাপর মানুষগুলির সঙ্গে তার সত্য সম্পর্ক জানতে পারে। তিনি দেখেন সমষ্টিচৈতন্যের একক সত্তার মধ্যে সব মানুষই রয়েছে বোধমাত্র হয়ে। তাদের পৃথক সত্তা নেই অর্থাৎ এক অখণ্ড চৈতন্যসত্তার উপলব্ধি হয়। সব মানুষ যেন তাঁর কথাই স্মরণ করায়—তাঁরই সঙ্গে নিবিড় সম্বন্ধযুক্ত। তখন

অন্যের দর্শন শুনেও সে নিজের দর্শনের সমান আনন্দ পায় ও শিক্ষা লাভ করে। অন্যের দর্শনে নিজের সত্তাকেই খুঁজে পায়।

৪) চতুর্থ ধাপ—সমষ্টিচৈতন্য তথা বস্তুতত্ত্বের সাধনে পূর্ণ বিকশিত ব্রহ্মের, যিনি ভূমানন্দের ঊর্ধ্বে তার ব্রহ্মত্বের (abstract) পরিচয় লাভের উপযোগী হয়ে ওঠে সাধক তথা সাধারণ মানুষ। তাদের অনুচৈতন্যের বিকাশে দ্বিতীয় স্তরে তারাও ব্রহ্মত্ব লাভ করেও অর্থাৎ একজ্ঞানে স্থিতিলাভ করে এক জ্ঞানের সুস্পষ্ট ধারণা লাভ হয়। দেহেতে তার ফল বর্তায় ও স্থূলমন নিয়ন্ত্রিত হয় সূক্ষ্মমনের (যে সুক্ষ্মমন হিরণ্ময় কোষে পরিবর্তিত) দ্বারা। এককথায় সমষ্টির সাধনে বহু সাধারণ মানুষের সূক্ষ্মমনে সমষ্টিচৈতন্যের সূক্ষ্মমন বা চেতনা প্রতিস্থাপিত হয়, তারা তাঁর মননশীলতা লাভ করে ও একত্ব বোধ দ্বারা পরিচালিত হয়—ধীরে ধীরে নতুন কৃষ্টি জেগে ওঠে।

এর সূচনা পর্বের ইঙ্গিতবাহী স্বপ্ন ও তার আলোচনা দিয়ে সাজানো হল বর্তমান পত্রিকা।।

৭ই জ্যৈষ্ঠ ১৪২৯

স্বপন মাধুরী

জন্মদিন

● দেখছি—অতনু বর্মন এসেছেন। বললেন, জন্মদিন কাকে বলে? নিজেই উত্তরে বললেন, যেদিন নিজেকে চেনা ও জানা যায় সেদিনই জন্মদিন। কথাগুলি বেশ মনে ধরল।...

—রামরঞ্জন চ্যাটার্জী
চারুপল্লী, বীরভূম

ব্যাখ্যা—যেদিন আপন সত্তাকে একটি রূপে দেখা ও উপলব্ধি করা যায় সেদিনই মানুষটির জন্মদিন।

● পাঠে জয় যখন বলছিল, ''আত্মিকে যিনি অপরিবর্তনীয় হয়ে যান তিনি অন্য বহু মানুষের আত্মিক পরিবর্তনের কারণ হন''—অমনি দর্শন হ'ল—জয় ডান হাত বাড়িয়ে আর একজনের হাত ধরে টেনে নিল।.....

—রীণা দত্ত
পোড়া অশ্বত্থতলা, ঠাকুরপুকুর

ব্যাখ্যা—জয়ের কথা যে সত্য তা জানা গেল।

সত্তা জানা

● দেখছি—একটা বড় দোকান। সেখানে সব জিনিস পাওয়া যায়। আমি গিয়ে বললাম, এই দোকানে সত্তা পাওয়া যায়? বলল, না। ওটা ছাড়া সব জিনিস পাওয়া যায়। পাশে আর একটা দোকানে গেলাম। সেখানে জিনিসপত্র কিছু দেখছি না। দোকানের নাম রামকৃষ্ণ জীবনকৃষ্ণের দোকান। বললাম, সত্তা পাওয়া যাবে? বলল, হ্যাঁ। এখানে অন্য কিছু নেই। খুব অবাক হলাম। আনন্দও হলো।

—শ্রাবন্তী রায় (নিভা)
ইলামবাজার

ব্যাখ্যা—জগতে ভোগ্যবস্তুর নানা উপচার পাওয়া যায়। কিন্তু আপন সত্তার পরিচয় পেতে হলে রামকৃষ্ণ জীবনকৃষ্ণের দর্শন ও অমৃতবাণীর চর্চা অর্থাৎ সত্যিকার আত্মিক জগতে প্রবেশ ও অনুসন্ধান করতে হবে।

● গত ১০-০২-২০২২-এ দেখছি—একটা তুলোর পাহাড়ে শুয়ে আছি। চারিদিকে মিষ্টি জ্যোতির আলো। শুয়ে শুয়ে ভাবছি—এখানে এতো আনন্দ, এখানে জগৎ নেই, সংসার নেই, মায়া নেই, কেউ নেই, কিছু নেই। কিছু আছে বলে মনেই হচ্ছে না। আছে শুধু আনন্দ আনন্দ আর আনন্দ। তাহলে মানুষ মারা গেলে তো আর কষ্ট হয় না! এতো সুন্দর জায়গায় থাকে।.....

—চৈতালী পাল

আড়িয়াদহ, দক্ষিণেশ্বর

ব্যাখ্যা—আপন ব্রহ্মসত্তায় (Real Self) মন লীন হলে কী অবস্থা হয় তার ক্ষণিক আস্বাদন পেলেন দ্রষ্টা। মারা গেলে—অহং নাশ হলে। কষ্ট হয় না—ব্রহ্মানন্দ লাভ হয়।

● দেখছি (১৩-০২-২০২২)—একটা মোটা বুড়ো আঙুল ধরে আমি ঘুমাচ্ছি। কোথাও কিছু নেই—চারিদিক কালো অন্ধকার। আঙুলটা খুব নরম। কী শান্তি!...

—সান্ত্বনা চ্যাটার্জী

বেলঘরিয়া

ব্যাখ্যা—বুড়ো আঙুল—পরম এক সমষ্টি চৈতন্যের সঙ্গে একত্ব লাভে, তাঁকে আপন সত্তা বা আত্মা বলে উপলব্ধিতেই লাভ হয় যথার্থ শান্তি।

চিরগতিশীল

● গত ডিসেম্বরে-'২১ একদিন পাঠ শুনতে শুনতে ট্রান্সে দেখছি—একটা সাপ এগিয়ে যাচ্ছে আর সাপটাকে কেউ কাটছে খণ্ড খণ্ড করে। তবুও সাপটা ছোট হচ্ছে না বা থেমে যাচ্ছে না। এগিয়েই যাচ্ছে সামনের দিকে।....

তখন কথামৃতে পড়া হচ্ছিল শ্যামপুকুরে গেলে তেলী পাড়ার সন্ধান পাওয়া যায়।

—অর্পিতা সাহা

সখেরবাজার, বেহালা

ব্যাখ্যা—সাপটি জগৎচৈতন্য। কেউ কাটছে—সমষ্টি চৈতন্য কাটছে। খণ্ড খণ্ড করে—একটু একটু করে রহস্য উন্মোচন করছে এবং তার অখণ্ডতার, পূর্ণতার ধারণা লাভ হচ্ছে দ্রষ্টার।

● দেখছি (২০.১১.২১)—একটা সুন্দর জায়গা। জায়গাটা মধুর মধ্যে নিমজ্জিত। তাই চারদিক মিষ্টি লাল রঙের। সেখানে এক ভদ্রলোকের সঙ্গে গল্প করতে করতে হাঁটছি। আমার যেন খুব ঘনিষ্ঠ। আবার মাঝে মাঝে তাকে অপরিচিতও মনে হচ্ছে। কখনো মনে হচ্ছে আমরা দুজনে ওনার সন্তানকে খুঁজছি, আবার কখনো মনে হচ্ছে দুজনে মিলে আমার মেয়ে অলি-কে খুঁজছি। কিন্তু কোন উদ্বেগ নেই। মনে হচ্ছে পেয়ে যাব।...

—শুভাশিস দাস

বোলপুর

ব্যাখ্যা—ভদ্রলোক—সমষ্টিচৈতন্য। ওলি শব্দের দুটি অর্থ। (১) ভ্রমর বা মৌমাছি। (২) দায়িত্ব প্রাপ্ত রক্ষক। এখানে ২য় অর্থটি প্রযোজ্য। অর্থাৎ এখানে অলি—অনুচৈতন্য যা সমষ্টিচৈতন্যের সন্তান আবার দ্রষ্টারও দেহ হতে জাত। দ্রষ্টার চেতনার রক্ষক। উদ্বেগ নেই—কারণ রাজযোগে আপনা হতে আপন সত্তাকে জানা হবে।

ভদ্রলোককে মাঝে মাঝে অচেনা মনে হচ্ছে—সমষ্টিচৈতন্যকে কোনদিনই পুরোপুরি জানা হবে না।

নতুন অধ্যাপক

● দেখছি (১৯.১.২২)—প্রথম দিন আমি কলেজে গেছি। ইংরাজী ক্লাস নিচ্ছেন এক অধ্যাপক। ক্লাসে কিছু ছেলে গোলমাল করায় উনি ডায়াস থেকে নেমে এসে আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন। কে গোলমাল করছিল? আমি চুপ করে থাকলাম। উনি আমার এবং সামনের কয়েকজনের মাথায় গাঁট্টা মেরে ক্লাস থেকে চলে গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে অন্য দরজা দিয়ে একজন অধ্যাপক যিনি জ্যোতির্ময় মুখ সম্পন্ন সৌম্যকান্তি এক পুরুষ (যদিও গায়ের রং কালো) ঢুকলেন ও সকল ছাত্রছাত্রীর মাঝে এসে বসলেন। যেন এক হয়ে গেলেন। বসার পর একত্ব লাভের জন্য একজ্ঞানের শিক্ষা দিচ্ছিলেন।....ঘুম ভাঙল।

—স্বপন কুমার পাল

ইলামবাজার

ব্যাখ্যা—প্রথম পর্বে বিশ্বব্যাপী একক চৈতন্যের পাঠ (ইংরাজী-শিক্ষা) দান ও মাথায় অর্থাৎ চিন্তা-চেতনায় ধাক্কা দিলেন শ্রীজীবনকৃষ্ণ। ২য় পর্বে নির্গুণের ঘনমূর্তি সমষ্টি চৈতন্যের প্রকাশে একজ্ঞানের পাঠ ও একত্ব দানের প্রক্রিয়া শুরু হল।

● দেখছি (২৪.০১.২২)—আমি ও জয় কোন বিষয় নিয়ে আলোচনা করছি। এমন সময় স্নেহময়দা এল। এসেই জয়কে বললো, ‘‘জয়, সবাই বলছে, তুমি খুব জ্ঞানের কথা বলছ। তোমার কথা শুনে সবাই খুব খুশি।’’ শুনে জয় বললো, ওসব বললে হবে না। আমি কেবল এক-জ্ঞান দিচ্ছি। তখন স্নেহময়দার মুখমন্ডল আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। মনে হলো স্নেহময়দা কোন বিষয়ে নিশ্চিত হলো। তারপর বরুণকে বলছি, স্নেহময়দাকে স্বপ্নটা বলতে হবে। এরপর ঘুম ভাঙলো।

তারপর আবার ঘুমিয়েই স্বপ্ন দেখছি—স্নেহময়দাকে ঐ স্বপ্নটা বলছি। বললাম, স্নেহময়দা, তুমি জয়ের কথা শুনে হৃদয় উৎসারিত আনন্দ প্রকাশ করলে! তখনও দাদার আনন্দময় মুখখানা দেখলাম।

—তরুণ ব্যানার্জী
জামবুনি, বোলপুর

বাহির দুয়ারে কপাট

● দেখছি (৮.০১.২০২২)—বিরাট এক বাড়িতে ঢুকলাম। তার ভিতরে অনেক ঘর। এক একটা দরজার কাছে যাচ্ছি আর আপনা থেকে তা খুলে যাচ্ছে। এইভাবে ১৯টা দরজা খুলে গেল। ২০নং দরজার কাছে গিয়ে দেখি ওটা বাইরে থেকে বন্ধ। ওটাই মনে হচ্ছে শেষ দরজা। ওটা খুলে গেলেই বাইরে বেরিয়ে যাব। একজন বলল, ওটা সমর বাইরে থেকে বন্ধ করে দিয়েছে।....

—অমরেশ চ্যাটার্জী
ইলামবাজার

ব্যাখ্যা—১৯ সংখ্যার তাৎপর্য একের মধ্যে সকলে অর্থাৎ বহুই এক। ১৯নং ঘর— যেখানে সকলেই যে এক সত্তা তা উপলব্ধি হয়। চারুপল্লীর শিশির ঘোষ এক স্বপ্নে দেখেছিলেন শ্রীজীবনকৃষ্ণ সকলকে নিজের indentily card দিচ্ছেন আর ১৯ টাকা করে নিচ্ছেন। আপনা হতে দরজা খুলে

যাচ্ছে—সমষ্টিচৈতন্যের ক্রিয়ায় আপনা হতে মনের উত্তরণ ঘটে ও ১৯নং ঘরে যাওয়া যায়। ঐ ঘর বাইরে থেকে বন্ধ—এখানে মন এলে আর বহির্মুখী হবে না। সমর দরজাটা বন্ধ করেছে—স্থায়ীভাবে অন্তর্মুখী করা ও অখণ্ড সত্তার উপলব্ধি দান ধর্মজগতে শ্রেষ্ঠ সংগ্রাম (সমর)—এই সংগ্রামের মূর্ত রূপ সমষ্টিচৈতন্য।

● দেখছি (৫.০১.২০২২)—জয়দা একটা চেয়ারে বসে আছে। আমি তার পাশেই বসে আছি। জয়দা খুব সুন্দর দেখতে একটা বাচ্চাকে মুখে মুখ লাগিয়ে চুমু খাচ্ছে। আমার মা চা খাওয়ার পর এঁটো কাপ ডিসটা জয়দার হাতে ধরিয়ে দিল। আমি রেগে গিয়ে মা-কে খুব বকলাম। তারপর কাপ ডিসটা জয়দার কাছ থেকে নিয়ে নিলাম। মা আমাকে ওখান থেকে চলে যেতে বলল। আমি বললাম, আমি জয়দার কাছেই থাকবো।....

—শুক্লা রুজ

বোলপুর

ব্যাখ্যা—মা—জগৎ। ব্রহ্ম সম্বন্ধে সব কথা এঁটো হয়েছে। সমষ্টিচৈতন্যকে (জয়কে) বুঝতে হবে সম্পূর্ণ নতুন যোগের ভাষা দিয়ে যা উনিই যোগাবেন, তাই তার সঙ্গ করতে হবে। নিরবচ্ছিন্ন অনুশীলন করতে হবে।।

চির জনমের মতো

● ২৩.০১-২০২২-এ স্বপ্ন দেখছি—আমার শিশু সন্তানকে বুকের দুধ পান করাচ্ছি। দুধের বদলে মধু বেরোচ্ছে। স্বামী (সুজয়) হাঁটাহাঁটি করছে কাছেই। স্বামীকে বলছি, তুমি হাঁটছো কী করে? তোমার তো পা ভাঙা। ও বলল, সে কী! পা তো ভেঙেছিল ৫০ বছর আগে। এখন তো ঠিক আছি। ভাবছি তবে কী আমার 91 বছর বয়স হয়ে গেল আর এই বয়সে বাচ্চা হল! কই আমরা দুজন তো বুড়ো হইনি! এটা কী করে হলো? খুব অবাক হলাম। ...ঘুম ভাঙল।

—সঞ্চিতা চ্যাটার্জী

বোলপুর

ব্যাখ্যা—স্বামী—জগৎচৈতন্য শ্রীজীবনকৃষ্ণ। তিনি এখন (দেহরক্ষার 50 বছর পর) সমষ্টিচৈতন্য রূপে ক্রিয়াশীল হয়েছেন—হাঁটছেন। দুধের বদলে

মধু—ভক্তি নয়, একত্বের চেতনা। সন্তান—অনুচৈতন্য। 91 বছর—91 সংখ্যাটি ব্যক্তিগত উপলব্ধিকে বোঝায়। ব্যক্তিগতভাবে দ্রষ্টার উপলব্ধি হচ্ছে যে এই অনুচৈতন্য যা সমষ্টিচৈতন্যের (স্বামীর) এক কণা সত্তা তা ধীরে ধীরে একত্বের চেতনা রসে (মধুতে) পুষ্ট হচ্ছে।।

● ২২-০৪-২০২২, শুক্রবার বাসে করে সিউড়ী থেকে ফেরার সময়ে একটু চোখ লেগে গিয়েছিল। দর্শন হলো—যেন সঞ্চিতাদির বাড়িতে আমি আর সঞ্চিতাদি গান শুনছি। —''আমি কেমন করিয়া জানাবো আমার জুড়ালো হৃদয় জুড়ালো''---গানটি হতে হতে যখন শুনছি---''দেখেছি চিরজনমের রাজারে''—তখন হঠাৎ সঞ্চিতাদি বললো, ওই দ্যাখ, ওই দ্যাখ চিরজনমের রাজা, দেখতে পাচ্ছিস? আমি বললাম, হ্যাঁ, হ্যাঁ তাই তো... ঠিক ঠিক। দেখতে পাচ্ছি।.....দর্শন ভেঙে গেল। অদ্ভুত আনন্দে দেহমন ভরে গেল।

—সৌমী সেনগুপ্ত চ্যাটার্জী
বোলপুর

ব্যাখ্যা—চিরজনমের রাজা আজ আর কল্পনা নয়—বাস্তব। তিনি সাধারণের বোধের সীমায় ধরা দিচ্ছেন। তাই রবীন্দ্রনাথের এজাতীয় গান শুনে দেহ সাড়া দিচ্ছে, দর্শন হচ্ছে। আবার গানটিও ধ্বনিত হচ্ছে হৃদয় মধ্যে দর্শনের ভিতরেই।

শঙ্খিনী

● দেখছি (২৪.০১.২২)—কদমতলায় জীবনকৃষ্ণের ঘরে গেছি। বাইরে দাঁড়িয়ে আছি। উনি বললেন, ভিতরে এসো। উনি মেঝেতে বসে আছেন। খালি গায়ে, ধুতি পরে। মেঝেতে কী যেন দেখছেন। আমাকে বললেন, এটা কী বলতো? গোলাপী রঙের কী যেন ওল্টানো। বললাম, এটা তো মনে হচ্ছে সাপ। উনি বললেন, এর মানে কী বলতে পারবি? বললাম, আপনার বইতেই তো পড়েছি। মনে আছে। বলবো? বললেন, বল্। বললাম, আপনি বলেছেন, শঙ্খিনী সাপ উল্টে থাকে। যত ওল্টায় তত বেড়ে যায়।.... তারপর বাড়ি এসে দেখি স্নেহময় রান্নাঘরে বসে পা দোলাচ্ছে খুব আনন্দে। বললাম, ঘরে চল। ও বললো, এখানেই বেশ আছি। তখন বললাম, একটা স্বপ্ন হয়েছে, বলবো? বললো, হ্যাঁ বলুন। তখন জীবনকৃষ্ণের ঘরে যাওয়া ও শঙ্খিনী সাপের কথা

বললাম, ওটা যেন স্বপ্ন ছিল। স্নেহময় বলল, ঠিকই তো বলেছেন—বলে হাসতে লাগলো।

—কেতকী পাঠক

সখেরবাজার

ব্যাখ্যা—কুন্ডলিকৃত ওল্টানো শঙ্খিনী সাপ—পাঠচক্রে বা ব্রহ্মচক্রে ব্রহ্মবিদ্যার চর্চায় প্রাপ্ত জ্ঞান। যত ওল্টায় তত বাড়ে—প্রথম অবস্থায় শ্রীরামকৃষ্ণ প্রদত্ত ব্যষ্টির সাধনে ঈশ্বরীয় জ্ঞান যা বহির্মুখী মনকে অন্তর্মুখী করে। শ্রীজীবনকৃষ্ণ সেইসব কথার দেহতত্ত্বে অর্থ করলেন—ওল্টালেন—চেতনার বিস্তৃতি ও গভীরতা বাড়ল। সেই শঙ্খিনীকে নিজেই ওল্টালেন যখন বিশ্বব্যাপীত্বের নিরিখে নতুন ভাবে যোগাঙ্গ দিলেন। এখন সমষ্টির সাধনে ঐ ব্যাখ্যাও উল্টে যাচ্ছে। স্নেহময়—সমষ্টি চৈতন্যের প্রতীক। রান্নাঘরে রয়েছে---সমষ্টির সাধন চলছে। হাসতে লাগলো—এযুগে বিশ্বব্যাপিত্বের ব্যাখ্যাও উল্টে যাচ্ছে বলে হাসছেন।

● পাঠ শুনতে শুনতে (৩০.০৪.২২) তন্দ্রায় দেখছি—আমার ছেলের ডান চোখ থেকে নাক পর্যন্ত একটা ৭ (সাত) লেখা।

—সোমা পাল (বসাক)

আমতলা, দঃ ২৪ পরগণা

ব্যাখ্যা ঃ ...৭ পূর্ণতার প্রতীক। পূর্ণ থেকে পূর্ণ আসে। সন্তান-দ্রষ্টার অনুচৈতন্য যা সমষ্টিচৈতন্য থেকে এসেছে। চোখ—যোগ দৃষ্টি।

নাক—নিশ্বাস প্রশ্বাসের মতো এর ক্রিয়া জীবনের অপরিহার্য অংশ হয়ে উঠবে।

সোনার রবি

● স্বপ্ন দেখছি (৩১.১২.২০২১)—আমি ঘরের ভিতরে আছি। আমার স্বামী আমাকে বলল, দেখ, বাইরে এসে দেখ। আমি বাইরে এসে আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখছি মাথা থেকে বুক অবধি সোনার জীবনকৃষ্ণ। তার থেকে বিশাল জ্যোতি সূর্যের আলোর মতো ছড়িয়ে পড়ছে। আমার শরীরেও সেই আলো পড়ছে। আমার গোটা শরীর কেমন হয়ে গেল।

—করবী রুজ

বোলপুর

ব্যাখ্যা—ঘর থেকে বেরোন—নিজস্ব সংকীর্ণ সংস্কারজ চিন্তার জগৎ থেকে বেরিয়ে আসা। মাথা থেকে বুক অবধি সোনার জীবনকৃষ্ণ—God head–Godhood–ব্রহ্মত্ব। জীবনকৃষ্ণের ব্রহ্মত্বের আলোয় উদ্‌ভাসিত হচ্ছে দ্রষ্টার ন্যায় সাধারণ মানুষের জীবন। স্বামী—দ্রষ্টারই Higher self.

● দেখছি (১১.১২.২০২১)—নিত্যদা আধশোয়া হয়ে রয়েছেন। আমি ওনার কোলে শুয়ে আছি। ওনার পায়ে পা ঠেকছে, ওনার বুকে মাথাটা। দেখি ঘরে অনেক জিনিসপত্তর, সুমিতা সেগুলো একটা একটা করে ঘর থেকে সরিয়ে নিচ্ছে।...

—পুতুল দেবনাথ
সখেরবাজার

ব্যাখ্যা—নিত্য—Absolute–নির্গুণ ব্রহ্ম—সমষ্টিচৈতন্য। ব্রহ্মের সঙ্গে একত্ব লাভ হলে দ্বিতীয় স্তরে ব্রহ্মত্ব লাভ হয়—তখন মনের জোর বাড়ে, শুদ্ধমন লাভ হয় (সুমিতা) ফলে খন্ডজ্ঞানের বোঝা (বিষয়চিন্তা) মাথা থেকে সরে যায়।

● দেখছি—জীবনকৃষ্ণ এসেছে বাড়িতে। ধুতি পরে, মাথা ন্যাড়া। এসেই আমাকে বলল, শোন্, তোকে পৈতে নিতে হবে না। তুই আমার ধুতির পাড়টা ছিঁড়ে পৈতের মতো করে গলায় পরে নিবি। তাহলেই পৈতে নেওয়া হবে।...

—দেবদীপ মুখার্জী
ইলামবাজার

ব্যাখ্যা—পৈতে—যা স্মরণ করায় জীবনের উদ্দেশ্য ব্রহ্মকে জানা। জীবন কৃষ্ণের ধুতির পাড় নেওয়া—নির্গুণ ব্রহ্মের Outline তথা ধারণা লাভ করলেই ব্রহ্মকে জানা, ব্রাহ্মণ হওয়া যায়।

বোতাম টেপা

● দেখছি (26.03.2022)—অ্যাকোয়া গার্ডের মতো একটা মেশিন আমাদের ঘরে বসানো আছে। এর মধ্যে একটা বোতাম (Button) আছে যেটা অন (on) করলে পুরো শরীরটা মেশিনে ঢুকে যাচ্ছে। সবাই ওটা করছে। বাণী মাসি

যখন ওটা করে বেরিয়ে আসছে আমি মাসীকে জিজ্ঞাসা করছি কী হলো ভিতরে? মাসী কিছু বলল না। মনের ভাব এইরকম যে তুমি গেলেই বুঝবে। তারপর আমি button on করতেই একটা আগুনের ফুলকির মতো উঠলো। তারপর পুরো শরীরটা মেশিনের ভিতর ঢুকে গেল। ভিতরে গিয়ে নিজেকে বিবস্ত্র মনে হল। তারপর কী হলো মনে নেই। বেরিয়ে এলাম।

পরের দৃশ্যে দেখছি শুয়ে আছি। মশারীর উপর দেখতে পাচ্ছি একটা বাচ্চা ছেলে সিঁড়ি দিয়ে ওঠা নামা করছে। ওর মা সিঁড়ির ওপর বসে আছে। বাচ্চাটা একসময় নীচে নেমে সামনে এগিয়ে গিয়ে কুয়াশার মধ্যে মিলিয়ে গেল। তারপর মনে হল পরপর অনেক দরজা খুলে যাচ্ছে। প্রথম ঘরে স্বামী বিবেকানন্দ বসে আছেন দেখলাম। পরের ঘরটিতে দেখা গেল একটি বাচ্চাকে কোলে নিয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বসে আছেন। পরের ঘরটিতে দেখা গেল মহুয়া রায়চৌধুরী দাঁড়িয়ে। ....ঘুম ভাঙল।

—সোনালী রায়
বেহালা

ব্যাখ্যা— ঘর—পাঠচক্র। অ্যাকোয়াগার্ডের মত মেশিন—সহস্রার—যেখানে মন গেলে দেহজ্ঞান কমে যায় (বিবস্ত্র) ও শুদ্ধ মন লাভ হয়। Button on করা—আত্মিক একত্ব বোঝার ইচ্ছা প্রকাশ ও মননের শুরু। বাচ্চা ছেলের ওঠা নামা—ব্যষ্টির সাধনের কথা শুনে মন ওঠানামা করে। মা ও ছেলে—দ্বৈতবাদে ভক্তিরস আস্বাদন। কুয়াশার মধ্যে মিশে গেল—তূরীয় অবস্থার অনুভূতিতে ব্যষ্টির দ্বৈতবাদের অনুভূতির সমাপ্তি ঘটে এবং পরে নির্গুণে অদ্বৈতের অনুভূতি শুরু হয়। একটার পর একটা দরজা খোলা ও দর্শন লাভ—প্রথমে রাজযোগ (স্বামীজীকে দেখা) হয় পরে সমষ্টি চৈতন্যকে আপন বৃহৎসত্তা বলে উপলব্ধি (রবীন্দ্রনাথের কোলে একটি বাচ্চা) ও শেষে একত্বের চেতনায় মধুমতী জগৎদর্শনে (মহুয়া দাঁড়িয়ে আছে) আনন্দে উদ্বেল হয় মন।।

বামুন জেঠি

● দেখছি—পুরীতে বেড়াতে গেছি। খাওয়া দাওয়া হচ্ছে। পরিবেশন করছে বাঁকুড়ার বামুন জেঠি। রাজীবকে বললাম, রাজীব এঁকে আমি চিনি। ইনি আমাদের দেশের বামুন জেঠি। সবাইকার বামুন জেঠি। রাজীব বলল, তুমি

চোখে কম দেখছ। তখন আবার যে ভাত দিতে এল দেখছি সে বোলপুরের জয়কৃষ্ণ। বললাম, জয় তুমি ভাত দিচ্ছ! ও বলল, আপনি স্বপ্নে দেখেছেন বামুন জেঠিকে কারণ তখন আপনার চোখ বোজা ছিল যে! ...আমি খুব অবাক হয়ে গেলাম। ঘুম ভাঙল।

—রেণু মুখার্জী

সখের বাজার

ব্যাখ্যা— পুরী—সহস্রার। বামুন জেঠি—প্রতীকে জগৎ চৈতন্য। ভাত দেন---অন্নং ব্রহ্ম---অন্যের ব্রহ্মত্ব লাভের কারণ হন যিনি। জয়কৃষ্ণ—সমষ্টিচৈতন্য—প্রতীকে নয়, বস্তুগত ভাবে দেখা।

● 4-04-2022 তে স্বপ্ন দেখছি—একটা ক্লাসরুমের মতো ঘর। একজন মহিলা টেবিলের সামনে যেমন টিচার বসেন সেইভাবে বসে আছেন। ওনার সামনে মুখোমুখি বসে থাকা মানুষগুলোর মুখ সব দেখছি জীবনকৃষ্ণের মুখ। ....

—বনানী পোদ্দার

লন্ডন

ব্যাখ্যা—শিক্ষিকাসম এক মহিলা বসে আছেন—সমষ্টিচৈতন্য (প্রতীকে)। সকলের মুখ জীবনকৃষ্ণের মুখ—তিনি সকলকে ব্রহ্মত্ব বা একত্ব দান করে একজ্ঞান ধারণা করিয়ে দেন।

নবীনা

সম্পূর্ণা

● ১. স্বপ্নে দেখছি (17.02.2022)—এক বিধ্বংসী ঝড় সমস্ত ধুলিসাৎ করে দিচ্ছে। যেন কিছু বড় রকমের পরিবর্তন হচ্ছে। সেই ঝড়ের মাঝে একটি পুরোন বাড়ি ওলট্‌পালট্ হয়ে নতুন হয়ে যাচ্ছে। তারই মাঝে জয়দা বরফাবৃত অবস্থায় দূরে দাঁড়িয়ে। সব কিছুর মধ্যে এটাই একমাত্র ফোকাস দৃশ্য। আমি সেইখানে যেন উড়ে না যাই সেই ভয়ে দৌড়ে জয়দার কাছে গেলাম। আমি দাদাকে জড়িয়ে ধরা মাত্র আমিও বরফাবৃত হয়ে গেলাম। ঘুম ভেঙে গেল।

ব্যাখ্যা—ঝড়—বড় পরিবর্তন। পুরোন বাড়ি নতুন হলো—পুরোন ধ্যান ধারণা বাতিল হয়ে নতুন উপলব্ধি হচ্ছে। জয়দা—সমষ্টি চৈতন্য। তাকে নির্গুনের ঘনমূর্তি রূপে (বরফে আবৃত) উপলব্ধি করে তার সাথে একত্ব লাভ করে বহু মানুষও সেই এক অখণ্ড সত্তায় লীন হয়ে নিজের সত্তাহীন অস্তিত্বকে অনুভব করতে পারে।

● ২. দেখছি—জেঠুর বাড়িতে আছি। জয়দা আসছে ঐ বাড়িতে। ঘরের দরজা আপনা হতে খুলে গেল। মনে হচ্ছে কী যেন একটা অসম্পূর্ণতা রয়েছে আমার মধ্যে। জয়দা কাছে এসে আমাকে জড়িয়ে ধরে বলল, এবার সম্পূর্ণ হয়েছে? আমি বললাম, হ্যাঁ। ....তীব্র আনন্দে ঘুম ভাঙলো।

—সায়েরী রাউত
বেহালা

ব্যাখ্যা ঃ পূর্ণপুরুষকে অন্তরে পেলে মানুষের অন্তর পূর্ণ হয়, মানুষ আর অসম্পূর্ণ থাকে না, পূর্ণতা লাভ হয়। এটিই জীবনের উদ্দেশ্য।

● দেখছি (২৪/০২/২২)—জয়, বরুন ও আমি হাঁটছি। আমি বললাম, পেটে একটা জাত সাপ কামড়েছে। এর মানে কুন্ডলিনী জেগেছে। জয় একটু সরে গিয়ে কারও সাথে কথা বলে আবার ফিরে এসে বলল, তুমি এসব ব্যষ্টির সাধন জানো বা না জানো আমার দেখার দরকার নেই। আমি জানি, ‘‘এই তোমার মন বাইরে আছে। এই মন এল ভিতরে’’—বলে ডান হাতের তর্জনী প্রথমে বাইরে নির্দেশ করে পরে আমার বুকে ঠেকালো। অমনি আমার মনে

হল আমার মন বাইরে থেকে ভিতরে এলো আর তীব্র আনন্দ হলো। জয় বলল, এই অন্তর্মুখীনতাই ধর্ম।...........

—স্নেহময় গাঙ্গুলী

রাজযোগী

● স্বপ্ন দেখছি (14.11.21) —২৬ শে কার্তিক যেন বিবেকানন্দের জন্মদিন। বিবেকানন্দকে নিয়ে বহু মানুষ শোভাযাত্রা বের করেছে। উনি রাজার মুকুট পরে রথে বসে আছেন আর প্রত্যেক মানুষের সাথে কথা বলছেন। ....স্বপ্ন ভাঙলে মনে হ'ল আজ সাধারণ মানুষেরও রাজযোগ হবে এ বিষয়ে যে কথা হল তার সমর্থনে এই স্বপ্ন। বিবেকানন্দ যিনি ছিলেন উনি হুবহু বোলপুরের জয়দার মতো দেখতে।

—অতনু মাইতি
কাষ্ঠডাঙা

ব্যাখ্যা—এই বিবেকানন্দ হলেন সমষ্টিচৈতন্য, নির্গুনের ঘনমূর্তি। ২৬ কার্তিক, শ্রীজীবনকৃষ্ণের দেহরক্ষার দিন। এখানে ওনার আত্মিকে ইচ্ছামৃত্যু ও সমষ্টি চৈতন্যের জন্মদিন বলা হয়েছে। সাধারণ মানুষেরও রাজযোগ হলে তবে আত্মিক একত্ব লাভ বাস্তবায়িত হবে।

● দেখছি (১৪.১১.২১)—খাটে শ্রীজীবনকৃষ্ণ কাত হয়ে শুয়ে আছেন। সোমনাথকে কিছু বলছেন। ঐ বিছানায় জীবনকৃষ্ণের পাশে জয়কৃষ্ণ চিৎ হয়ে শুয়ে আছে। খেয়াল করলাম জয়কৃষ্ণ ও জীবনকৃষ্ণের মাঝে আর একজন কে শুয়ে আছে। অস্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। সোমনাথ (ভাই) জীবনকৃষ্ণকে বলল, আমি ৪ টের সময় আপনার সাথে কথা বলবো। ...ঘুম ভাঙলো।

—বনানী বিশ্বাস
বনহুগলী

ব্যাখ্যা ঃ মাঝে অস্পষ্ট একজন—স্রষ্টার অহং। অহং রূপ লাঠি মাঝে থাকায় একভাগ জলকে দু'ভাগ দেখায়—শ্রীরামকৃষ্ণ। জগৎচৈতন্য ও সমষ্টিচৈতন্যকে পৃথক ভাবি। চারটের সময় কথা বলবো—সমষ্টির সাধনে ৪র্থ ধাপে পৌঁছে সমষ্টিচৈতন্যের সাথে একত্ব লাভ হলে, তার মননশীলতা লাভ হলে, ঠিক ঠিক আত্মিক অনুশীলনে (জীবনকৃষ্ণের সঙ্গে কথা বলায়) সমর্থ হবে দ্রষ্টার ন্যায় সাধারণ মানুষও।

পরিণতি

● 17-04-2022 এ স্বপ্ন দেখছি—মনে হচ্ছে জয়ের দেহে সাধন হচ্ছে। তার একটু দূরে জীবনকৃষ্ণের ছায়ামূর্তি। জয়ের দেহে কী পরিবর্তন হচ্ছে তা বোঝা যাচ্ছে না। তবে একটা পরিবর্তন হচ্ছে। শেষে জয়ের মাথায় জীবনকৃষ্ণের মাথা বসে গেল। সাধন শেষ হল।

—বরুণ ব্যানার্জী
বোলপুর

ব্যাখ্যা—এ যুগে যার দেহে বস্তুতত্ত্বে সাধন হবে তিনি জীবনকৃষ্ণের ব্রেন ফ্যাকাল্টি (Brain faculty) লাভ করবেন। ফলে তাঁকে সম্যক রূপে বুঝবেন ও জগৎকে বোঝাবেন।

● দেখছি (17-4-22)—একজন মানুষ দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি দেখতে অত্যন্ত সুন্দর। ভাবছি মানুষ এতো সুন্দর হয়! কে যেন বলল, ইনি কিন্তু সাধারণ মানুষ।...

—স্নেহময় গাঙ্গুলী

ব্যাখ্যা ঃ দাঁড়িয়ে আছেন—দ্রষ্টার ন্যায় সাধারণ মানুষের চেতনা জাগ্রত হচ্ছে, maturity লাভ করছে। তখন তিনি সুন্দর হচ্ছেন। তার সূক্ষমন স্থায়ী হচ্ছে।

● দেখছি (19.04.2022)—বাবা ফিরে এসেছেন। খুব সুন্দর হৃষ্টপুষ্ট চেহারা হয়েছে। বাবার বয়স অনেক কমে গিয়ে যেন চল্লিশ হয়ে গেছে। ভাবছি বাবা তো দেহ রেখেছেন। তাহলে আবার কী করে এলেন। বলছি, "বাবা তুমি!" অমনি বাবা মিলিয়ে গেলেন। তখন দেখি পাশে ছেলে শুয়ে আছে। ওর চেহারা ঐ বাবার মতোই সুন্দর ও হৃষ্টপুষ্ট হয়ে উঠলো। খুব অবাক হয়ে ওর দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে ঘুম ভাঙলো।

ব্যাখ্যা—বাবা—উৎস পুরুষ—আত্মিকে তিনি হলেন সমষ্টিচৈতন্য। দ্রষ্টার ছেলে—দ্রষ্টার সত্তা। ঐ বাবার মতোই দেখতে হলো—সমষ্টিচৈতন্যের সত্তায় (অনুসত্তায়) পরিবর্তিত হলো। এভাবে মানুষ উপলব্ধি করতে পারে আত্মিকে সকলে একসত্তা।

—পুলকেশ দাস
আন্দুল, হাওড়া

মীনাবাজার

● স্বপ্ন দেখছি (8.04.2022)—পুরোন দিনের একটা রাজবাড়ি দেখতে গেছি। একজায়গায় গিয়ে মনে হল, এটা মীনাবাজার। জয় রয়েছে সেখানে। ও হঠাৎ বলল, জানো ছোটমামা ওরা যে খুব ভারী অর্থাৎ অসীম ভরযুক্ত (ওজনের) এক মানুষের কথা ভেবেছিল, এখন মনে হচ্ছে ওরা আমার কথাই ভেবেছিল। আমি সেটা দেহ দিয়ে বুঝতে পারছি। অমনি আমি দেখতে পেলাম একটা বড় পাইপের মুখ দিয়ে গলগল করে অবিরত ধারায় গলিত লোহা জয়ের গায়ে পড়ছে আর অমনি সেই লোহা জয়ের দেহ শোষণ (absorb) করে নিচ্ছে নিমেষে অর্থাৎ ওর দেহে ঢুকে যাচ্ছে। আমি ভাবছি, এটা কী হচ্ছে? জয় যে খুব ভারী হয়ে যাচ্ছে ক্রমাগত, লোহার স্রোত যে থামছে না!...বিস্ময়, উদ্বেগ আর অপার্থিব আনন্দ নিয়ে ঘুম ভাঙলো।

—স্নেহময় গাঙ্গুলী
চারুপল্লী, বোলপুর

ব্যাখ্যা ঃ পুরোন দিনের রাজবাড়ি—বৈদিক কৃষ্টি বা একত্বের চেতনার ধারণা। মীনাবাজার—যেখান থেকে সকল ঈশ্বরীয় চেতনার জন্ম হয়েছে। ওরা ভেবেছিল—বৈদিক ঋষিরা ভেবেছিল এক পুরুষের কথা যিনি নতুন জগৎ সৃষ্টি করবেন এবং সকলকে আত্মিকে নিয়ন্ত্রণ করবেন। লোহা—সভ্যতার মেরুদন্ড। গলিত লোহার ধারা অবিরত শোষিত হচ্ছে—নির্গুণের অসীম তেজ শোষণ করে তার দ্বারা মনুষ্য জাতিকে আত্মিকে নিয়ন্ত্রণ করবেন। As iron sharpens iron so one man sharpens another (Old Testament). তেমনিভাবে বহু মানুষের ব্রেণ পাওয়ার বাড়াতে সক্ষম হন একজন যার ব্রেন ফ্যাকাল্টি হয়। তিনি হয়ে ওঠেন সভ্যতার মেরুদন্ড। ঋষিদের কল্পনার আদিপুরুষ। অসীম ভরযুক্ত—চৈতন্যের মান বা ওজন যে অসীম তা ঐ মানুষকে ভেতরে পেয়ে বাকী মানুষরা বুঝবে। তারা মানহুঁস হয়ে উঠবে।।

তিনমূর্তি

● দেখছি—জীবনকৃষ্ণ 'ঋতম্ বদিষ্যামি' পড়ছেন আর জয় মর্মার্থ ভেঙে ভেঙে বলছে। জীবনকৃষ্ণ খুব খুশি হচ্ছেন।

পরের দৃশ্যে দেখছি—তিনজন আমি। একজন আমি শুনছি। একজন পড়ছি। আর একজন মর্মার্থ ভেঙে ভেঙে বলছি—আমি তো অবাক। এ কী করে সম্ভব? তখন দেখছি তিনজন আমি-ই জয় হয়ে গেলাম।

তৃতীয় দৃশ্য—দেখছি, জয় ''ঋতম্ বদিষ্যামি'' পড়ছে পরে যখন ব্যাখ্যা করছে তখন ও শ্যাডো মূর্তি হয়ে যাচ্ছে। তারপর আমার কাছে এসে পিঠে হাত দিয়ে বলল, কোনো compromise কোরো না। যা পেয়েছ ধরে রাখো। তোমার সঙ্গে আমি আছি। তখন ভাবছি, কী পেয়েছি? অমনি স্নেহময়দার কণ্ঠে শুনলাম, ''রাজীব, তুমি সত্য পেয়েছ।'' এই সত্যকে ধরে রাখার কথা বলেছে জয়।...ঘুম ভাঙলো।

—রাজীব রায় চৌধুরী
সখেরবাজার, কলকাতা

ব্যাখ্যা ঃ নির্গুনের ঘনমূর্তি, যিনি আমার আপন বৃহৎসত্তা, তিনি আত্মিকের সব রহস্য উদ্‌ঘাটন করে সত্য ধরিয়ে দিচ্ছেন। তিনি যে সত্যমূর্তি তা জানাচ্ছেন। বুদ্ধির বিকারে সেই সত্য যেন বিস্মৃত না হই, প্রচলিত অন্য ঈশ্বরীয় ধারনার সঙ্গে রফা করে না ফেলি। তিন—সমষ্টির জ্ঞান, জ্ঞেয় ও জ্ঞাতা।

● দেখছি (sept. 2021)—আমি আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে আছি। নিজের মুখ দেখছি। কী বাজে লাগছে নিজেকে। গোঁফটা ঝাঁটার কাঠির মতো শক্ত ও কালো। ভাবছি কেউ এ ব্যাপারে আমাকে কিছু বলে নি কেন। তাহলে গোঁফটা কেটে দিতাম। খুব বিরক্তি লাগছে।....

—জয়কৃষ্ণ চ্যাটার্জী
জামবুনি, বোলপুর

ব্যাখ্যা ঃ দ্রষ্টা নিজের আদি পুরুষ-স্বরূপ দেখছেন যিনি অপর বহু মানুষকে ঋষিত্ব দান করতে পারেন।

ভাঁজ খুলছে

● 8-05-2022-এ দেখছি—শ্রীজীবনকৃষ্ণ বসে আছেন। তাঁর গায়ের চামড়া জরজর হয়ে গেছে বয়সের কারণে। গায়ে গুটি গুটি কীসব বেরিয়েছে। মনে হচ্ছে উনি আমার সন্তান বাবাই। কিছুক্ষণ পর বাবাই-এর যা আসল বয়স তার থেকেও ছোট প্রায় ৩৭/৩৮ বছর বয়সী এক জীবনকৃষ্ণ এল। ও এসে বয়স্ক জীবনকৃষ্ণের মাথায় ওর হাত রাখল। হাতটা বেশ বড়। অমনি বয়স্ক জীবনকৃষ্ণের গায়ের চামড়া টান টান ও সুন্দর হয়ে গেল। গুটিগুলোও মিলিয়ে গেল ম্যাজিকের মতো। খুব অবাক হলাম। ঘুম ভাঙলো।

—**সবিতা ঘোষ**
চারুপল্লী

ব্যাখ্যা—বয়স্ক জীবনকৃষ্ণ—জগৎচৈতন্য জীবনকৃষ্ণ। চামড়া জরজর—তাঁর বলা কথা খুব ঘনীভূত। তার ভাঁজে ভাঁজে আরও অনেক কথা আছে। ছোট জীবনকৃষ্ণ---সমষ্টিচৈতন্য। সমষ্টি চৈতন্যের হস্তক্ষেপে জগৎচৈতন্য শ্রীজীবনকৃষ্ণের বাণীরূপ অর্থাৎ তার বক্তব্য প্রাঞ্জল হয়ে উঠছে এখন। উনি আমার সন্তান—আমার আপন সত্তা।

● গত শনিবার (6.11.2021) পাঠ শুনছিলাম। হঠাৎ একটু তন্দ্রার মতো এসেছিল। তখন দেখছি হলুদ রঙের পাকা রসালো আম একটু খোসা ছাড়িয়ে খাচ্ছি এবং আঁটি দেখতে পাচ্ছি। তারপরই সামনের দিকে দেখছি শ্রীজীবনকৃষ্ণের মুখটা আমার সামনে ভেসে উঠল যে মুখটা ছবিতে সূর্যমন্ডলের মধ্যে দেখেছি। ...তন্দ্রা ভেঙে গেল, পাঠ তখনও চলছে অন্ লাইনে।....

—**অঞ্জলি সেনগুপ্ত**
বাগুইআটি

ব্যাখ্যা ঃ আম—ব্রহ্মত্ব।আঁটি—আমের বীজ অর্থাৎ উৎস। আমরা যে ব্রহ্মত্ব আস্বাদন করছি তার উৎস পুরুষকে, শ্রীজীবনকৃষ্ণকে শনিবারের পাঠে বিশেষ ভাবে জানা বা দেখা হচ্ছে।।

বাঘের ক্রিয়া

● স্বপ্নে দেখছি (22/03/2022)—এক জায়গায় বিশাল বড় বড় দুটি সাদা বাঘ। একটি বাঘ শুয়ে আছে আর অপর বাঘটি ছাগল ধরে গিলে ফেলছে। ...বাঘ দুটিকে দেখে কেন এত আনন্দ হচ্ছিল জানি না। ঘুম ভাঙার পরও দৃশ্যটা চোখের সামনে ভাসছে।....

—রূপা মাজি

আমতলা, দঃ ২৪ পরগণা

ব্যাখ্যা—ছাগলের পালে বাঘ বড় হওয়া ও পরে নতুন এক বাঘ এসে তাকে তার স্বরূপ জানিয়ে জঙ্গলে নিয়ে যাওয়ার গল্প বলেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। শ্রীজীবনকৃষ্ণের যুগে গল্পের পরবর্তী অংশ সত্য হলো। ঐ বাঘটি (জগৎচৈতন্য) জঙ্গল থেকে এসে বাকী ছাগলদের রক্ষা করতে লাগলো নতুন একটি বাঘের আক্রমন থেকে—সকলের ভিতর পরম এক বা পরমব্রহ্ম রূপে ফুটে উঠে নির্গুণের তেজ সহ্য করার শক্তি দিয়ে। এযুগে আরেকটি বাঘ (নির্গুণের ঘনমূর্তি সমষ্টিচৈতন্য) ছাগলদের আত্মসাৎ করে নিচ্ছেন, তাদের ব্রেন-পাওয়ার বাড়িয়ে ও অনুভূতি দান করে আত্মিকে একসত্তা বোধ দান করছেন।

দুটি বাঘ—জগৎ চৈতন্য ও সমষ্টিচৈতন্য।

● স্বপ্নে দেখছি (23.03.2022)—জয় বলছে, আমি তোমার ও তোমাদের সকলের পরিচয়। শুনে চমকে উঠলাম। খুব আনন্দও হলো। ঘুম ভাঙলো।

—প্রশান্ত রুজ (বোলপুর)

ব্যাখ্যা ঃ মনুষ্যজাতি এক অখণ্ড চৈতন্য সত্তায় বিধৃত। সেই এক সত্তা-ই সকলের আত্মিক পরিচয়—তা একজন জীবন্ত মানুষের রূপে প্রকাশ পাচ্ছে—তিনিই সমষ্টিচৈতন্য।

● দেখছি (18.12.21)—খুব সুন্দর একটা বাড়িতে স্নেহময় মামা পাঠ করছে। পাঠের সবাই বলছে, এটা আমার ঘর। আমার ঘরে পাঠ হচ্ছে।......

—অভিলাষা রায়চৌধুরী

সখেরবাজার

মানুষ সত্য বলবে

● স্বপ্নে দেখছি (18.03.2022)—একটা A-4 কাগজের অর্ধেক সাইজের একটুকরো কাগজ হাতে এলো। ওতে কী সব লেখা আছে। জীবনকৃষ্ণের কন্ঠ শুনছি। উনি বলছেন—সূর্যের পুনর্গঠন হবে ও পৃথিবী ধ্বংস হবে। এই নতুন সূর্যের তেজ বেশি, তার মঙ্গল কিরণে পৃথিবী শুদ্ধ হবে। অমনি আমাদের গ্রামে (সুলতানপুর) থেকে আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখলাম সূর্যটা ভেঙে যাচ্ছে—খোলস ছেড়ে গেল যেন। আর ভিতর থেকে অনেক বেশি তেজোময় সূর্য প্রকাশ পেল। তার চারদিক ঘিরে আশ্চর্য এক আলোর বলয় দেখা গেল। ওটা যেন এক রক্ষা বলয়। ওর মধ্যে দিয়ে সূর্যের আলো পৃথিবীতে এসে পড়বে, যে আলো মানুষ সহ্য করতে পারবে ও শুদ্ধ হবে। মনে হচ্ছে এ সূর্য কখনো ধ্বংস হবে না। এর তেজে পৃথিবী শুদ্ধ হবে। মানুষ আর মিথ্যা বলবে না, সত্য বলবে। মানুষ প্রকৃত অর্থে মানুষ হয়ে উঠবে। শেষের কথাগুলো আমি ছুটে ছুটে চিৎকার করে বলে বেড়াচ্ছি। মনে হচ্ছে এসব-ই ঐ একটুকরো কাগজে লেখা ছিল। ...তীব্র আনন্দে ঘুম ভাঙলো।

—জয়কৃষ্ণ চ্যাটার্জী
বোলপুর, বীরভূম

ব্যাখ্যা---সুলতানপুর---(সৃণ্তানপুর)---গন্তব্যস্থল। সূর্যের পুনর্গঠন-জগৎচৈতন্য সমষ্টিচৈতন্যে রূপান্তরিত হয়েছে। আলোর রক্ষা বলয়—মানুষ adjusted form-এ সমষ্টি চৈতন্যের তেজ লাভ করবে, তাদের প্রকৃত মঙ্গল হবে। পৃথিবী শুদ্ধ হবে। মানুষ সত্যকার মানুষ হয়ে উঠবে। সত্য বলবে—একের কথা বলবে, একত্বের চেতনায় অভিষিক্ত হয়ে। কাগজে লেখা ছিল—এসব-ই পূর্ব নির্ধারিত ছিল।

● দেখছি—মঙ্গলগ্রহ থেকে দু'জন মানুষ নেমে আসছে এই পৃথিবীতে। এটা যেন জগতের পক্ষে বিরাট ঘটনা। ....দু'জন মানুষ নেমে আসছে—এক ও একত্ব বাস্তবে বোধের মধ্যে ধরা পড়বে। মানুষের মঙ্গল হবে—তাই মঙ্গলগ্রহ থেকে আসছে।

—কেতকী পাঠক
সখেরবাজার

দেহে টান পড়েছে

● 29.04.2022, দুপুরে স্বপ্ন দেখছি—কোন অনুষ্ঠান হচ্ছে। সেখানে গেছি। স্নেহময়দাকেও দেখছি ঐ অনুষ্ঠানে। হঠাৎ দেখি আমি বিছানায় শুয়ে আছি আর কানের কাছে কথা ভেসে আসছে—দেহে টান পড়েছে, ভগবান অবতীর্ণ হচ্ছেন। তারপর ভগবান জীবনকৃষ্ণকে দেখতে পেলাম। তাঁর স্বচ্ছ দেহ (transparent), দেহের ভিতর দিয়ে সব কিছু দেখা যাচ্ছে।...

—অতনু মাইতি

কাষ্ঠডাঙা, কলকাতা

ব্যাখ্যা—কোন অনুষ্ঠান যেখানে স্নেহময়দা রয়েছে—যেখানে জীবনকৃষ্ণচর্চা বা একত্বের চর্চা চলছে। দেহে টান পড়েছে—অনুচৈতন্য লাভে ও একত্বের চর্চায় আত্মিক ক্ষিদে সৃষ্টি হয়েছে। শুধু মনে নয় দেহে অর্থাৎ ভাগবতী তনু বা সূক্ষ্ম মনে ব্যাকুলতা জেগেছে। স্বচ্ছদেহী জীবনকৃষ্ণ—নির্গুণব্রহ্ম জীবনকৃষ্ণ অর্থাৎ সমষ্টি-চৈতন্য—ইনিই ভগবান অর্থাৎ দেহীর আত্মা তথা প্রকৃত সত্তা বলে উপলব্ধি হচ্ছে।

● দেখছি—একটা নতুন শোলার কারখানা। সেখান থেকে জয় বেরিয়ে এল। আমার কাছে এসে ওর জিভটা আমার নাকের ডগায় ঠেকালো। পরে সেই জিভ দিয়ে আমার সমস্ত মুখমন্ডল ব্যান্ডেজ করার মতো করে জড়িয়ে জড়িয়ে ঢেকে দিল। এতে খারাপ তো লাগলই না বরং তীব্র আনন্দ হতে লাগলো।.....

—কমল মালাকার

জীবনকৃষ্ণপল্লী, সুরুল, বীরভূম

ব্যাখ্যা ঃ জিভ—কথা বলার অঙ্গ, বাণী। জিভ দিয়ে মুখমন্ডল ঢেকে দিল—সমষ্টিচৈতন্য তার বাণী দিয়ে দ্রষ্টার ন্যায় সাধারণ মানুষের চেতনা গ্রাস করছেন, তাদের দেখা, শোনা ও বলা তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী অনুযায়ী হবে। নতুন শোলার কারখানা— সমষ্টি চৈতন্যের বিক্ষেপিত জগৎ— Cosmic body।

● দেখছি—আমার দাদুভায়ের ঠাকুরদা ঘরে ঢুকলেন। দেহটা বিশাল লম্বা চওড়া। উনি যখন হাঁটছেন তাঁর পদভারে মাটি কাঁপছে। কিন্তু উনি যখন খাটে

শুলেন খাট ভাঙল না। আমাকে জড়িয়ে ধরে শুলেন। যেন ছোট হয়ে ধরা দিলেন।.....

অগ্নিশ চ্যাটার্জী, সখেরবাজার

ব্যাখ্যা—দাদুভায়ের ঠাকুরদা—আদিপুরুষ—সমষ্টিচৈতন্য। খাটে শুলেন—সহস্রারে চেতনায় ধরা দিলেন। ছোট হয়ে—অনুচৈতন্য রূপে, জড়িয়ে ধরলেন—এক করে নিলেন।

স্থায়ীত্ব লাভের উপায়

● পাঠে **সমষ্টির সাধন** বিষয়ে কথা হচ্ছিল। হঠাৎ একটা আশ্চর্য দর্শন হলো। দেখছি—আমি জয়দার বাড়িতে গেছি। জয়দাকে জড়িয়ে ধরে খুব কেঁদে কেঁদে বলছি, আমাকে তোমার করে নাও। ওর দেহ থেকে জ্যোতির্লিঙ্গ বেরিয়ে এলো। লিঙ্গটা অঙ্গুষ্ঠবৎ ঘন জ্যোতি যেন। আমাকে ওখানে হাত দিতে বলল। আমি হাত দিলাম। অমনি দেখি আমার হাতে গোল্ডেন কালারে (Golden colour-এ) 'একত্ব' কথাটা লেখা। তারপর লেখাটা মিলিয়ে গেল। তখন জয়দা আবার ঈশারায় ওর অঙ্গুষ্ঠবৎ জ্যোতির্লিঙ্গে হাত দিতে বলল। আমি দিলাম। আবার লেখাটা ফুটে উঠল ও ক্ষণকাল পরে মিলিয়ে গেল। এইভাবে কয়েকবার ওখানে স্পর্শ করায় আমার হাতে একত্ব লেখাটা স্থায়ী হয়ে ফুটে উঠলো।

—মৌমিতা মুখার্জী
চন্দননগর

ব্যাখ্যা—অঙ্গুষ্ঠবৎ ঘনজ্যোতি—আত্মা—তাই-ই পরমাত্মা তথা জগৎচৈতন্য। এই জগৎচৈতন্য যে দেহে সংকলিত ও নিয়ন্ত্রিত হয় ও তার দ্বারা ঐ দেহী অন্যের মধ্যে আত্মিক পরিবর্তন ঘটিয়ে একত্ব বোধ স্থায়ীভাবে ধারণা করিয়ে দেন তিনি সমষ্টিচৈতন্যের ঘনমূর্তি। আর সমষ্টিচৈতন্য কর্তৃক একত্ব দানের প্রক্রিয়াই সমষ্টির সাধন। এতে সাধারণ মানুষের ভূমিকা হল—তাঁর সৃষ্টিশীল চৈতন্যসত্তাকে (লিঙ্গ) বুঝবার, ধারণা করবার (হাত দিয়ে ছোঁয়ার) ঐকান্তিক ইচ্ছা প্রকাশ।

● দেখছি (16.10.21)—জয়ের পুরনো জামা কাপড়গুলো এক একজন এক একটা পরে রয়েছে। ছোড়দা একটা পরে আছে। মেজদা একটা পরেছে, বাদশা

একটা পরেছে—যার দিকে তাকাচ্ছি দেখছি সবাই জয়ের জামা পরে আছে। অবাক হয়ে দেখছি।....

—বিশাখা চ্যাটার্জী

জামবুনি, বোলপুর

ব্যাখ্যা—মানুষের কারণশরীর নিজের গড়নে গড়ে নিচ্ছেন, মানুষের মধ্যে মাহল তৈরি করছেন নিজে প্রকাশ পাবেন বলে, Adjusted form-এ।

বেদ উচ্ছেদ

১৯৬২ সালের এক আলোচনায় শ্রীজীবনকৃষ্ণ বলেছেন, ‘‘আমি এক ধাক্কা দিলেই বেদ উড়ে যায়। কিন্তু কেন করিনি জানিস-ঐ মানুষের সংস্কার রয়েছে—কতদিনের সংস্কার—তারা হৈ হৈ করে উঠবে, নিতে পারবে না তাই। কিন্তু দ্যাখ, আজ তোদের বেদ উচ্ছেদ হল।’’ এই বিষয়টা জয় খুব সুন্দর করে পাঠে বোঝালো। আগের রাত্রে স্বপ্ন দেখছি—(৩০.০৪.২২) বাইকে করে জয়দের বাড়ি গেছি। ঘরে ঢোকার আগে বাইক রাখার জন্য ছায়া ঘেরা জায়গা খুঁজছি। বাড়িটার পিছনে অনেকগুলো বাইক রয়েছে। মনে হল এগুলো কলকাতা থেকে যারা এসেছে তাদের। আমারটা কোথায় রাখবো বুঝতে পারছি না। বাইরে থেকে জয়ের পাঠ শুনতে পাচ্ছি। আর দেখছি ও জানালা দিয়ে অনেক পুরানো শাস্ত্রগ্রন্থ ফেলে দিচ্ছে। এই দৃশ্য দেখতে দেখতেই ঘরটার চারপাশ ঘুরছি। জয়ের কথার আওয়াজ কানে আসছে। সব জায়গা থেকেই পুরনো পুঁথি ফেলার দৃশ্য দেখতে পাচ্ছি। এক সময় একটা জায়গায় বাইকটা রেখে ঘরে ঢুকলাম। মনে হচ্ছে ঘরের মূল অংশে ঢুকে পড়েছি। রান্না ঘর, ডাইনিং পেরিয়ে জয়ের রুমে ঢুকলাম। সেখানে জয়ের ঠিক আগে সুটবুট পরা একজন বাবু বসে আছেন। আমাকে দেখে তিনি পা সরিয়ে নিলেন যাতে আমি জয়ের কাছে যেতে পারি। আমি ওর কাছে গিয়ে বললাম, জয় ভালো আছো? ও বলল, হ্যাঁ, এসো এসো। বললাম, আমি তোমাদের মূল ঘরের ভিতর দিয়ে ঢুকে পড়েছি। বলল, ‘‘হ্যাঁ, এটাও একটা রাস্তা, এদিক দিয়েও আসা যায়।’’ জয়ের বয়স কিছু কম মনে হল, ১৭/১৮ বছর মনে হলো। ....

—অভিজিৎ রায়

ইলামবাজার

ব্যাখ্যা ঃ জীবনকৃষ্ণের কথাগুলি এবার এফেক্ট দিতে শুরু করেছে। বিশেষত সমষ্টিচৈতন্যের (জয়ের) মুখ থেকে শোনার পর। বাবুকে পেরিয়ে জয়ের কাছে গেলাম—সগুণ ব্রহ্মের চূড়ান্ত অবস্থার পারে নির্গুণের ঘনমূর্তিকে, সমষ্টিচৈতন্যকে পেলেন দ্রষ্টা।

আপন সত্তা

● স্বপ্ন দেখছি (14.01.22)—শুয়ে আছি। হঠাৎ দেখি জয় আমার বাঁ পাশে শুয়ে। আমি গায়ে হাত বুলিয়ে দেখছি। আমার স্বামীকে ডাকছি, তাড়াতাড়ি লাইট জ্বালো। জয় শুয়ে আছে আমার কাছে। স্বামী বললো, এত রাতে জয় কী করে আসবে? আমি বললাম, ও আমার আপন সত্তা তাই আমার কারণশরীরে দেখতে পাচ্ছি। আমি জড়িয়ে ধরলাম। তখন দেখি জয়ের শরীর শক্ত কাঠের মতো। তখন আমি বলছি। ওর ভাব সমাধি হয়েছে তাই এইরকম হয়েছে। লাইট জ্বেলে আমার স্বামী ওকে দেখতে চাইল। আমি দেখাতে যাচ্ছি। দেখি একটা হাত দেহ থেকে উঠে এলো। আমি আনন্দে বিছানাতে গড়াগড়ি দিতে লাগলাম। ...পরে অমরেশদার বাড়িতে পাঠে স্বপ্নটা বলছি। সব শুনে উনি আনন্দে হাততালি দিয়ে উঠলেন। এবার সত্যিসত্যিই ঘুম ভাঙলো। স্বপ্নটা ভাবলেই আনন্দ হয়।

—কল্পনা রায়
ইলামবাজার

ব্যাখ্যা—একটা হাত উঠে এলো—এ হাত পার্থিব বস্তু দানের জন্য নয়—এ হাত কাছে টেনে নিয়ে এক করে নেবার। একত্বের বোধ দান করার হাত। এই হাতের কথাই রবীন্দ্রনাথের গানে আছে, জানি বন্ধু জানি, তোমার আছে তো হাতখানি।

● স্বপ্ন দেখছি (২৯.০১.২০২২)—অনেকজন মানুষ দাঁড়িয়ে আছে। ধ্যান করার সময় একটা গোল জিনিস লাট্টুর মতো ঘোরে। তার মধ্যে একটা ছোট্ট ফুটো থাকে। সেটা দেখে সকলে ধ্যান করে। সেই গোল জিনিসটা দেখছি ঘুরছে। এক সময় সব মানুষ একজনে পরিবর্তিত হয়ে গেল। তখন আমার মনে হল।

সেই একজনটা আমি। আবার আমার মনে হচ্ছে যে আমার ভিতরেই তো এই মানুষগুলোর সত্তা বর্তমান। তারপর ঘুম ভেঙে গেল।

—মেঘা রায়
ইলামবাজার

ব্যাখ্যা—নির্গুনের ঘনমূর্তি সমষ্টি চৈতন্যের সঙ্গে একত্ব হলে উপলব্ধি হয় আমি আছি—আমার ভিতরেই জগৎ অর্থাৎ আমি ব্রহ্ম।

নতুনকে লও বরি

● 26.04.2022 এ স্বপ্ন দেখছি—মাসীর দেহমধ্যে থাকা অনুচৈতন্যটি বেরিয়ে আমার মধ্যে ঢুকে গেল।এক্ষেত্রে আমার মধ্যে থাকা অনুচৈতন্য ও আগত অনুচৈতন্য মিলে আমি দুই গুণ শক্তির অধিকারী হলাম। এটা আমি অনুভবে বুঝতে পারছি। তখন জীবনকৃষ্ণ (ফটোতে ওনার যে রূপ দেখি সেই রূপে) এসে আমাকে বললেন, নতুন জীবনকৃষ্ণের জন্য নতুন খাট কিনতে হবে চল্। তখন আমি আর জীবনকৃষ্ণ মিলে বেরোলাম খাট কিনতে। ...ঘুম ভাঙলো।

—সায়েরী রাউত
বেহালা, 14নং

ব্যাখ্যা—সম্মিলিত অনুশীলনে রত অনুচৈতন্যলাভকারী মানুষদের জগৎ পারস্পরিক চেতনা বৃদ্ধি করে, ফলে আত্মিক তেজ বাড়ে (দ্বিগুণ শক্তি লাভ হয়)। তখন জীবনকৃষ্ণের আলোচিত বিষয়গুলিকে ভিত্তি করে সমষ্টিচৈতন্যকে (নতুন জীবনকৃষ্ণকে) বোঝার অনুশীলন চলে এবং সমষ্টিচৈতন্যের ধারণা আমাদের সহস্রারে (খাটে) স্থায়ী আসন লাভ করে। আমাদের স্থায়ী সূক্ষ্ম মন লাভ হয়।

● ১৭.০১.২০২২-এ দেখছি—জয়, বুদ্ধ, শংকরাচার্য ও রুশো আলোচনা করছে। আমার মনে হলো ওদের আলোচনার বিষয়বস্তু জগতে ফুটতে আর ২/৩ মাস সময় লাগবে।...

—প্রশান্ত রুজ
বোলপুর

ব্যাখ্যা—সমষ্টিচৈতন্যের (জয়ের) ক্রিয়ায় বহু মানুষের মধ্যে একটি সাধারণ ইচ্ছা (General will theory of Rousseau) জাগবে আর তা হল এক বোধে উত্তরণ (শঙ্করের অদ্বৈততত্ত্বে যার আভাস) যা ব্যবহারিক জগতে বর্তাবে ও সুফল দেবে। তখন মানুষ ধৈর্য্যশীল হবে ও নিরবচ্ছিন্ন ঈশ্বরীয় অনুশীলনে আনন্দময় জীবনযাপন করবে (শ্রীবুদ্ধের দুঃখমুক্তির ভাবনার বাস্তব রূপায়ণ ঘটবে)।

পাঠ প্রসঙ্গে

পাঠ প্রসঙ্গে

পাঠ ও আলোচনা প্রসঙ্গে যে সমস্ত নতুন কথা উঠে আসে তারই কিছু সংকলন করা হলো এই অধ্যায়ে।

১. প্রসঙ্গ ঃ **"নারদাদির ন্যায় লোকের জীবশিক্ষার জন্য দেহ থাকে" .....শ্রীরামকৃষ্ণ**।

কথামৃতে শ্রীরামকৃষ্ণের বলা এই কথার তাৎপর্য কী? সাধারণ ভাবে দেহ থাকলে চৈতন্য ক্রিয়াশীল থাকে আর দেহ না থাকলে চৈতন্যের কোন ক্রিয়া থাকে না। এখানে দেহ থাকা মানে ক্রিয়াশীলতা বজায় থাকা ধরতে হবে। আর জীবশিক্ষা বলতে সাধারণ মানুষের বোধের উত্তরণ ঘটানো। একজ্ঞানে উত্তরণ ঘটানোকে বোঝায়। কোনটা ঠিক, কোনটা ভুল এজাতীয় নীতিশিক্ষা নয়।

এখন নারদাদি বলতে সেই সমস্ত সাধকের কথা বলা হয়েছে যারা দ্বৈতবাদের অবস্থায় আছেন। পৌরাণিক নারদ বা পণ্ডিত নারদ যিনি ব্রহ্মসূত্রের দ্বৈতবাদে ব্যাখ্যা দিয়েছেন তারা দ্বৈতবাদের প্রতীক হয়ে গেছেন। তাহলে নারদাদির বেঁচে থাকার অর্থ সাধকের মধ্যে দ্বৈতবাদ বেঁচে থাকা।

ধর্মভাবনার প্রথম দিকে এই নারদ বা দ্বৈতবাদের কোন অস্তিত্ব ছিল না। প্রথমে একজ্ঞান-ই স্ফূরিত হয়েছিল। তবে একের উপলব্ধি ঠিক ঠিক না হওয়ায় ঋষিদের সেই একজ্ঞান ছিল বিতর্কিত। আর তাই পরবর্তীকালে দ্বৈতবাদের কল্পনা এসেছে, ''তুমি মহান, আমি তোমার দাস।" এই ভাবের জন্ম হয়েছে। তাই নারদকে বলা হয় ব্রহ্মার মানস পুত্র। এই মানসসৃষ্ট, কল্পনা প্রসূত দ্বৈতজ্ঞান দ্বারা এক বোধে উত্তরণ ঘটানো যায় না। যেমন শ্রীরামকৃষ্ণ দ্বৈতজ্ঞানে অর্থাৎ নারদের অবস্থায় ছিলেন। তিনি স্থূল দেহ নিয়ে থাকাকালীন ঈশ্বরে ভক্তি তথা দ্বৈতজ্ঞানের শিক্ষা দিয়েছেন যা মানুষকে একজ্ঞানে বা ব্রহ্মজ্ঞানে উত্তীর্ণ করতে পারেনি। রামকৃষ্ণ কথামৃত পাঠ ও আলোচনা মানুষের মনকে বড়জোর ৫ম ভূমিতে নিয়ে যেতে পারে কিন্তু ব্রহ্মপুরে অর্থাৎ ৭ম ভূমিতে নিয়ে যেতে পারে না। কারণ তাঁর একজ্ঞান হলেও সেই একজ্ঞানে স্থিতিলাভ করেননি, ফলে বোধে বোধ হয়নি। তাই বলছেন, ''ব্রহ্মজ্ঞানকে আমার কোটি নমস্কার"। ফলে তিনি ব্রহ্মপুরের লোক হতে পারেননি, দ্বৈতবাদে নারদ অবস্থাতেই থেকে গেলেন।

তাই তার দেহ গেলে ভক্তরা কী করে জীবন কাটাবে, এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি মাস্টারমশাইকে বলছেন, তোমাদের চিন্তা কী? এক পুরুষ (generation) জোরে কাটবে। অর্থাৎ স্থায়ীভাবে তার চৈতন্য অন্যদের মধ্যে ক্রিয়া করবে না সেকথা স্বীকার করছেন।

তাহলে দেখা গেল এই সমস্ত মানুষদের জীবশিক্ষার জন্য দেহ থাকে না। অপরপক্ষে শ্রীজীবনকৃষ্ণ ব্রহ্মজ্ঞানে স্থিত হয়ে, ব্রহ্মপুরের লোক হিসাবে চিন্ময় রূপে বহু মানুষের মধ্যে ফুটতে লাগলেন। তারা দ্বৈতজ্ঞানে ভক্তি লাভ করল সচ্চিদানন্দ গুরু হিসাবে তাকে জেনে। কিন্তু অনুভূতিমূলক ধর্মের মনন শুরু হল। পরে দ্বৈত থেকে অদ্বৈতে উত্তরণ হল জীবনকৃষ্ণকে পরম এক বলে উপলব্ধি করে।

শ্রীজীবনকৃষ্ণ প্রশ্ন তুলেছেন, তাহলে জীবশিক্ষার জন্য নারদাদির দেহ থাকে ঠাকুর একথা কেন বলছেন? নারদের উপমা কেন দিলেন? নারদকে দেখা যায়। ১৯৪৫ সালে তিনি দেখেছিলেন যে তার দেহ থেকে নারদ বেরিয়ে কেষ্টবাবুর দেহে ঢুকল আবার কেষ্টবাবুর দেহ থেকে নারদ বেরিয়ে তার দেহে ঢুকল। কেষ্টবাবুরও ঐ দর্শন হয়েছিল ঐ সময় জীবনকৃষ্ণের ঘরে বসে।

এখানে নারদ সচ্চিদানন্দ গুরু (যিনি মনন করার ক্ষমতা দেন ও দেহের সার আত্মাকে দেখিয়ে দেন, ঢেঁকির সাহায্যে যেমন ধান থেকে চাল বের করা হয়।) অর্থাৎ ব্রহ্মপুরের লোক। বেদ মতে ব্রহ্মপুর থেকে আসা লোক সাধকের মনকে ব্রহ্মপুরে নিয়ে যেতে পারে।

যদিও কেষ্টবাবুর ক্ষেত্রে নারদ আবার তার দেহ থেকে বেরিয়ে এসে জীবনকৃষ্ণের দেহে ঢুকে গেল। অর্থাৎ অন্যান্যদের মতো তার সচ্চিদানন্দ গুরু লাভ হলো না। জীবনকৃষ্ণের আত্মিক তেজ পেল, ঈশ্বরের নাম করার, মনন করার ক্ষমতা পেল কিন্তু মাথায় সন্ন্যাসীর গেরুয়া বস্ত্রের সংস্কার দৃঢ়ভাবে প্রোথিত থাকায় দেহজমি কর্ষণ তথা সংস্কার উচ্ছেদের লড়াইটা হল না। এ যেন বেদ মতে ধনুর্বিদ্যা শিক্ষা করেও প্রয়োগের নীতি মানা হল না। পরিণতিতে মনের ষষ্ঠভূমি থেকে সপ্তম ভূমিতে উত্তরণ হ'ল না।

১৯৬২ সালে শ্রীজীবনকৃষ্ণ বলছেন যে ওই দর্শন থেকেই তিনি বুঝেছিলেন যে কেষ্টদার ব্রহ্মজ্ঞান হবে না কারণ তিনি গেরুয়া পরতেন। তার মধ্যে গেরুয়ার সংস্কার ছিল যা মস্তিষ্কে সম্প্রদায় গত অহংভাবের জন্ম দেয়। আসলে তিনি মনে গেরুয়া পরেছিলেন। জীবনকৃষ্ণ বলছেন যে নারদ দেখাটা সংস্কারজ। যে

কোন ধরণের দ্বৈতবাদী সংস্কার ও চিন্তা তা সম্প্রদায়গত বা ব্যক্তিপূজা কেন্দ্রিক হোক না কেন মস্তিষ্ক অধিগ্রহণ করে থাকলে একের চিন্তা আসবে না। সে সময় (১৯৪৩-১৯৫৭) জীবনকৃষ্ণের কাছে আসা বহু মানুষের দ্বৈতবাদে হলেও কথামৃতের যোগাঙ্গ ও দর্শন অনুভূতির অনুশীলনে প্রচলিত ধর্মীয় সংস্কার উচ্ছেদ হয়ে কিছুটা বোধের উত্তরণ ঘটে। তারা জীবনকৃষ্ণকে শ্রীরামকৃষ্ণের ন্যায় অবতার ও ঈশ্বরের বিশেষ কৃপা প্রাপ্ত পুরুষ হিসাবে বুঝেছিলেন।

এরপর ১৯৫৮ সালে জীবনকৃষ্ণের অবস্থান্তর ঘটল। রামকৃষ্ণময় অবস্থা অতিক্রম করে তিনি পূর্ণ অদ্বৈতে অধিষ্ঠিত হলেন ও বাকী মানুষদের একজ্ঞানের কথা বলতে লাগলেন। তিনি বললেন, তোরা ভজিস রামকেষ্ট কিন্তু দেখিস জীবনকেষ্ট কেন? কারণ তোদের বোধের উত্তরণ ঘটছে। দ্বৈতবাদের সংস্কারজ মূর্তি, ধ্যান ধারণা ত্যাগ হয়ে একজ্ঞানে উত্তরণ ঘটছে।

তিনি তাদের অন্তরে আর সচ্চিদানন্দগুরু নয়, পরম এক রূপে বা সচ্চিদানন্দ রূপে ফুটতে লাগলেন। পূর্ববর্তী দর্শনের নতুনভাবে অর্থ করতে লাগলেন। তিনি কোন অর্থেই গুরু নন, এক সত্তা, একথা বলতে লাগলেন।

নারদ দর্শনের মতো জীবনকৃষ্ণের ঋষি দর্শনও হয়েছিল। ঋষি সংস্কারজ মূর্তি, ঋষি বলতে যে image মনে আসে তা সংস্কার যুক্ত কারণ ঋষিদের আধ্যাত্মিক চিন্তা ভাবনার মধ্যেও একটা সীমাবদ্ধতা ছিল। তাদের একজ্ঞান নিরেট ছিল না, তাতে ফাঁক ফোঁকর ছিল। কিন্তু ঋষি দর্শন প্রগতিশীল চিন্তার প্রতীক। তাই জীবনকৃষ্ণের আত্মিক অবস্থা ঋষিদের ভাবনা অতিক্রম করে ঠিক ঠিক একজ্ঞানে অধিষ্ঠিত হ'ল।

এই পর্বে যাদের মনের মধ্যে নারদের ন্যায় দ্বৈতবাদী রামকৃষ্ণের সংস্কারজ মূর্তি গেঁথে বসেছিল তারা এই একজ্ঞানের অনুশীলন ছেড়ে চলে গেল। আর যারা এই অনুশীলনে থাকলেন তাদের মধ্যে জীবনকৃষ্ণের সত্তা ক্রিয়া করে বোধের উত্তরণ ঘটালো। একজ্ঞান লাভ হতে লাগলো।

যদিও পরবর্তীকালে নির্গুণের ঘনমূর্তি রূপে জীবনকৃষ্ণের প্রকাশে এক বোধে উত্তরণের ও তার স্থায়ীত্ব লাভের ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে। নির্গুণকে ক্রিয়াশীল করে ও এক জ্ঞানের অনুশীলনকে বিশিষ্ট রূপ দান করে সমষ্টি চৈতন্য জীবনকৃষ্ণ চিরকাল জীবশিক্ষা দিতে থাকবেন, তার ক্রিয়াশীলতা থেকে যাবে, সেই অর্থে তার দেহ থেকে যাবে।

২. প্রসঙ্গ ঃ যোগ কী?

দৃশ্যমান জগৎ সতত পরিবর্তনশীল। এই মুহূর্তে যা দেখছি পরমুহূর্তে তা বদলে যায়। একটি শিশু যত বড় হয়, ধীরে ধীরে তার সবকিছুই বদলে যায়। সুদূর অতীতকাল থেকে মানুষ এ নিয়ে ভেবেছে। যা মানুষকে বেশি বেশি করে ভাবিয়েছে তা হল মৃত্যু। মৃত্যু যেন মহাশূণ্যতার মাঝে পরিবর্তনশীল জীবনের এক মহা সমাপ্তি।

আর্য ঋষিরা প্রথম বললেন, এই মৃত্যুর পরপারে এক শাশ্বত পুরুষ, অমৃত পুরুষ বা ধ্রুব পুরুষ আছেন যার অনুধ্যানে এই পরিবর্তনশীল জগতের মাঝে অপরিবর্তনীয় মৃত্যুহীন জীবনকে পাওয়া যাবে যাকে পেয়ে আমরা মৃত্যুকেও জয় করতে পারি। অর্থাৎ মানুষের মৃত্যু যেমন আছে চিরন্তন জীবনও তেমনি আছে। তারা বলেছিলেন, আঁধারের পরপারে সেই জ্যোতির্ময় ধ্রুব পুরুষকে তারা দেখেছেন।

কিন্তু পরবর্তীকালে এই পুরুষের অস্তিত্বের কোন প্রমাণ পাওয়া গেল না। তখন বেদান্তবাদীরা বললেন, বুদ্ধির অধিগম্য এক সত্তা, আত্মার কথা, যে আত্মা অজর, অমর, শাশ্বত। যদিও তারও কোন বাস্তব প্রমাণ মিলল না। তাই বৌদ্ধরা বলল যে এই জগতে সব সময়ই একটা পরিবর্তন হচ্ছে। স্বামী বিবেকানন্দও বললেন যে বেদান্তবাদীদের ঐ তত্ত্ব অনুমান নির্ভর, হাইপোথেসিস (hypothesis)। সমস্ত ভাববাদী দর্শনে এই অনুমান নির্ভর ধ্রুব সত্তাই মূল ভিত্তি হয়ে ওঠে। ফলে বিজ্ঞানের সঙ্গে তথা বস্তুবাদী দর্শনের সঙ্গে ভাববাদীদের এই বিষয়ে চরম দ্বন্দ্ব তৈরি হয়। কারণ বস্তুবাদীরা বলেন চরম স্থিতিশীল অর্থাৎ অপরিবর্তনীয় চিরন্তন কোন বস্তু বা জড়শক্তির ঊর্ধ্বে কোন চৈতন্যের অস্তিত্ব জগতে নাই। বিশ শতকে (১৯০৫ সালে) আইনস্টাইন বস্তুবাদীদের এই দর্শনের (Philosophy) স্বপক্ষে চরমতত্ত্ব খাড়া করলেন, যা theory of relativity বা আপেক্ষিকতাবাদ নামে খ্যাত। তিনি বললেন, এই মহাবিশ্বে চরম স্থিতি বা চরম গতির অস্তিত্ব নেই। সবকিছুই আপেক্ষিক অর্থাৎ কোন বস্তু স্থির না গতিশীল তা অপর কোন একটি স্থির বা গতিশীল বস্তুর সাপেক্ষে বিবেচিত হয়। যেমন কোন গাছ বা ঘরবাড়ি যখন স্থির দেখি তা পৃথিবীকে স্থির ধরে, স্থির পৃথিবীর সাপেক্ষে। আবার গতিশীল ট্রেন থেকে এই বস্তুগুলিই গতিশীল দেখাবে। সুতরাং কোন বস্তুর গতির বিষয়ে চূড়ান্ত কোন সিদ্ধান্তে আসা যায় না।

শ্রীজীবনকৃষ্ণ বললেন, আইনস্টাইন Thory of relativity তে বলছেন, সব কিছুই পরিবর্তনশীল। কিন্তু এই পরিবর্তনের চূড়ান্ত কোন effect হিসাবে কোন ধ্রুব বস্তুকে পাওয়া যায়নি যার সাপেক্ষে অপরাপর বস্তুর গতি ও পরিবর্তন সম্বন্ধে চূড়ান্ত জ্ঞান লাভ করা যাবে। অর্থাৎ এই তত্ত্বের দ্বারা, বিজ্ঞান চূড়ান্ত কোন জ্ঞানে তথা একজ্ঞানে পৌঁছাতে পারেনি। যদিও বিজ্ঞান সকল বস্তুকে এক বস্তুর রূপভেদ ও সকল শক্তিকে এক শক্তির রূপভেদ বলে কল্পনা করেছে যা প্রমাণ করা বিজ্ঞানের চরম লক্ষ্য।

আসলে এসব macrocosm এর ঘটনা। Microcosm বা দেহতত্ত্বে অর্থাৎ অন্তর্জগতে কী হয়? যোগ—যোগ মানে পরিবর্তন। মানুষের প্রাণশক্তি বা Life power রাজযোগের মাধ্যমে পরিবর্তিত হতে হতে পরম জ্যোতিস্বরূপ আত্মায় পরিবর্তিত হয়। পরে এই আত্মা ঐ মানুষটির রূপ ধরে জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে অসংখ্য মানুষের অন্তরে ফুটে ওঠে। যখন তিনি যে কোন মানুষের মধ্যে প্রকাশ হয়ে তার সত্তার পরিবর্তন ঘটাতে পারেন বলে জানা গেল, তখন বোঝা গেল তিনি জগদ্ব্যাপী হয়েছেন। তাঁরই চিন্ময় রূপে এক অখন্ড জগৎ চৈতন্য প্রকাশ পাচ্ছে। এই উপলব্ধিতে একজ্ঞানে স্থিতি লাভ করেন ঐ আত্মা সাক্ষাৎকারী ব্যক্তি। তিনি আরও বোঝেন এই আত্মা হ'ল—Collected life power of whole human race.

পরবর্তীকালে তার দেহে এই আত্মা বা অখণ্ড চৈতন্যের গঠন পূর্ণতা পাওয়ায় তা চরম অপরিবর্তনীয় রূপ— শাশ্বতরূপ পায় ও চরম স্থিতি লাভ করে। ফলে তার ভিতরের মহাতেজ বিকীর্ণ হয় ও তিনি অন্যের পরিবর্তনের কারণ হন। কালক্রমে নির্গুণের ঘনমূর্তি বা সমষ্টি চৈতন্যরূপে তার প্রকাশ ঘটে। যোগের মাধ্যমে প্রাণশক্তির পরিবর্তনের এক চূড়ান্ত effect পাওয়া গেল। অপরিবর্তনীয় এক-কে পাওয়া গেল। সকলকে এক করার অভিমুখে, একজ্ঞানে স্থিতিদানের অভিমুখে সেই চৈতন্যের গতিই চূড়ান্ত গতি। তাই শ্রীজীবনকৃষ্ণ বলেছেন বেদান্ত সত্য অর্থাৎ বেদান্ত কথিত এই একচৈতন্য ও একজ্ঞানই সত্য তা তার জীবনে প্রমাণিত হল। সাথে সাথে এই পরম একের সাপেক্ষে সাধারণ মানুষের আত্মিক পরিবর্তনের সম্পর্ক theory of relativityর মতোই বিজ্ঞান সম্মত ও যুক্তি সম্মত (Scientific and logical)।

এই অপরিবর্তনীয় সমষ্টি চৈতন্য সাধারণ মানুষের মধ্যে দু'ভাবে পরিবর্তন

ঘটান। প্রথমতঃ একজন মানুষের মধ্যে রূপ ধরে ফুটে ওঠার জন্য তার অভ্যন্তরীণ দেহটির প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সাধন করেন। যেমন কোন মাটির ভাঁড়ে চা খাওয়ার আগে ভাঁড়টি তৈরি করতে হয়। দ্বিতীয়তঃ রূপ ধরে প্রকাশ পাওয়ার পর উপলব্ধির বা বোধের পরিবর্তন ঘটান অর্থাৎ এক বোধে উত্তরণের দিকে মনের যাত্রা শুরু হয়। তার সম্বন্ধে ধারণা গুরু, ইষ্ট, ভগবান, ব্রহ্ম, পরমব্রহ্ম ইত্যাদি স্তর পেরিয়ে পরম একে পৌঁছায়। পরে নির্গুণের ঘনমূর্তি বা সমষ্টিচৈতন্য রূপে প্রকাশে দ্রষ্টার মধ্যে অনুচৈতন্য জাগ্রত হয় এবং সূক্ষ্ম মন লাভ হয়। তখন প্রকৃত মনন শুরু হয়। বোঝা যায় এই মনন শক্তি তারই, সাধারণের মধ্যে দিয়ে তিনিই মনন করেন। প্রত্যেকে যেন তারই এক একটি দাঁত।

এই পর্যায়ে সম্মিলিত চর্চা গতিলাভ করে। তবে অনেক সময় সকলের মধ্যে চিন্তার সামঞ্জস্য না এলে তিনি সামঞ্জস্য দান করে একমুখী করেন, যেন অনেকগুলি পাখি ঠোঁট দিয়ে একটি কাপড় ধরে আছে আর কাপড়টা পাখিগুলিকে নিয়ে আপন গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে। এইভাবে তার চরমগতির সঙ্গে যুক্ত হয়ে আমাদের চৈতন্যসত্তা গতিলাভ করে ও তার সঙ্গে একত্ব অনুভব করে। আমরা তখন দ্বিতীয় স্তরে অপরিবর্তনীয় হয়ে একজ্ঞানে স্থিতিলাভ করতে পারি। যদিও তা সর্বক্ষণের জন্য নয়, সাময়িক। এর effect হিসাবে আমাদের চিন্ময়রূপ অন্যের ভিতর ফুটবে না। তবে বাইরের জগতের যে কোন বস্তু, বিষয় ও সম্পর্ক নিয়ে আমাদের চিন্তা ভাবনার জগৎকে একজ্ঞানের আলোকে নতুন ভাবে দেখতে শিখি। কারণ তার সাপেক্ষে জগৎকে তখন দেখছি। উনি যেভাবে দেখেছেন তা বুঝছি, ওনার দৃষ্টিভঙ্গী লাভ হচ্ছে আমাদের।

ফলে যা আমাদের একজ্ঞান থেকে বিচ্যুত করতে পারে সেগুলিকে খণ্ডন করতে পারি, কল্পনার জগৎ থেকে সরে এসে সত্যকে তথা নিত্যকে আঁকড়ে ধরতে পারি, আমার চেতনা তারই চেতনার অংশ এই উপলব্ধিতে মনের স্থিরতা লাভ হয়। বাইরের সদা চঞ্চল জগতে অচঞ্চল বা ধীর হতে পারি। একজ্ঞানই তখন মনকে নিয়ন্ত্রিত করে ও আত্মস্থ থাকতে সাহায্য করে। আর নিঃশ্বাস প্রশ্বাস যেমন ভাবে প্রাণের অস্তিত্বের জানান দেয় ঠিক তেমনি আপনা হতে এই একের চেতনার সূক্ষ্ম প্রকাশ সর্বক্ষণ হতে থাকে আমাদের জীবনে।

৩. প্রসঙ্গঃ পুরুষ যজ্ঞ।

বেদে পুরুষ যজ্ঞের কথা আছে। পুরুষ যজ্ঞ হল আদি যজ্ঞ। একে অশ্বমেধ

যজ্ঞও বলে। আবার পুরুষ মেধ বা নৃমেধ যজ্ঞও বলে। পুরুষ যজ্ঞের মূল কথা হল কোন মানুষের দেহে অখণ্ড চৈতন্যের সংকলন হলে এই যজ্ঞের মাধ্যমে পুরুষ সৃষ্টি হয়। যে মানুষের দেহে এই ঘটনাটি ঘটে তার চিন্ময় রূপ বহু মানুষের মধ্যে ফুটে ওঠে ও লীলা করে। তারা ঐ পুরুষকে পেয়ে তাকে বোঝার চেষ্টা করে, যজ্ঞ করে অর্থাৎ অনুশীলন করে এবং একত্বের চেতনায় অভিষিক্ত হয়ে সাধারণ জীবন নির্বাহ করে।

পুরুষ যজ্ঞের প্রথম পর্যায়টি একটি মানুষের দেহে ব্যক্তিগত পর্যায়ে জীবনযজ্ঞ, তার ব্যষ্টির সাধন। মধুবিদ্যা লাভ হয়ে তার দেহে ব্রহ্মবিদ্যা সম্পূর্ণতা লাভ করলে তিনি উৎক্রান্ত পুরুষ হন, চেতনার বিশেষ স্তরে উত্তীর্ণ হন। তখন তার চেতনার দ্বারা সৃষ্ট ভিতরের আত্মিক জগৎকে তার রূপে বাইরে বিক্ষেপ করেন। বহু মানুষের অন্তরে তার চিন্ময় রূপ ফুটে ওঠে বিচিত্রভাবে।

শুরু হয় পুরুষযজ্ঞের ২য় পর্যায়—সমষ্টির সাধন। এক জ্ঞানের মূর্তরূপ ঐ মানুষের চিন্ময় রূপ দর্শনে ও মননে আত্মিকে বহুত্ব নাশ ও একত্ব উপলব্ধির যজ্ঞ চলে সাধারণের আর বাইরে তারা সহজ সাধারণ জীবন যাপন করে।

অশ্বমেধ যজ্ঞ থেকে প্রথমে দুটি ঘোড়া উদ্ভুত হয়। একটি ঘোটক অপরটি ঘোটকী। অশ্ব শব্দের বৈদিক অর্থ পৃথিবী ও স্বর্গ, সূর্য ও চন্দ্র এবং রাষ্ট্র অর্থাৎ জগৎ। বোঝাই যাচ্ছে ঘোড়া বলতে এখানে সেই পুরুষ (ঘোটক) ও তার সৃষ্ট আত্মিক জগতের কথা (ঘোটকী) বোঝানো হয়েছে যা জ্যান্ত, প্রাণবন্ত ও চৈতন্যময়।

বহু মানুষ সেই পুরুষের আত্মিক জগতের অন্তর্ভুক্ত হয়ে রসের সাধনে তাঁর চৈতন্যের রসাস্বাদন করে, তাকে উপলব্ধি করে, ব্রহ্মানন্দ লাভ করে, তারা তখন ভক্ত বা নারী। সেই পুরুষ তার চেতনার রসে এই জগৎকে জারিত করে ক্রমেই বিকশিত করতে থাকে—ধর্মজগতে progress of civilization ঘটে।

সেই জগতের বাধাহীন বিস্তারের কথা বোঝাতে বলা হয় অশ্বমেধ যজ্ঞের ঘোড়া যতদূর যাবে ততদূর যজ্ঞকর্তা রাজার এলাকা হয়ে যাবে। কোথাও কেউ বাধা দিলে তাকে যজ্ঞকর্তা যুদ্ধে পরাস্ত করবেন। যজ্ঞকর্তা হলেন পরমাত্মার প্রতীক। ইনি বিষ্ণু—যিনি সহস্রচক্ষু, সহস্রশীর্ষ, সহস্রহস্ত পুরুষ। আর্যরা তাকে পেয়ে (২য় স্তরের অনুভূতিতে, ধ্যানে, স্বপ্নে) যজ্ঞ শুরু করেছিল। তারা এমন এক চৈতন্যের সংকলনের চিন্তা করেছিল যার দ্বারা একটি জগৎ সৃষ্টি হবে যে জগতে চৈতন্যের ক্রিয়া, বিকাশ ও অগ্রগতি সমহারে হবে। অর্থাৎ একত্বের

কৃষ্টি সম্পন্ন একটি জগৎ সৃষ্টি হবে। এরূপ একটি জগৎ সৃষ্টি হোক—তাদের এই নিরন্তর ভাবনা থেকে তাদের Brain power develop করেছিল। যদিও কোন মানুষের দেহে চেতনার পূর্ণ সংকলন সে যুগে ঘটেনি। তবে কারও দেহে চৈতন্যের প্রাথমিক পর্যায়ের ও আংশিক সংকলনে যে বিকাশ ঘটেছিল তাকেই ওরা পুরুষ বলেছে। তাকে স্বপ্নে ধ্যানে ইত্যাদি নানান অনুভূতিতে কেউ কেউ দর্শন করেছিল। চেতনার পূর্ণ সংকলন ও পরে পুরুষ যজ্ঞ না হলে পুরুষ তৈরী হয় না। আর পুরুষ তৈরি না হলে আত্মিক জগৎও সৃষ্টি হয় না। তাই চৈতন্যের ক্রমবিকাশ ও তার ধারাবাহিকতা দেখা গেল না। প্রথমে ঋষিরা বাহ্যিক একটি সুন্দর সভ্য জগৎ সৃষ্টির কথা ভেবেছিলেন যেখানে সমহারে সকলের উন্নতি হবে। তার জন্য প্রয়োজন সকলকে একজনের অধীনে আনা। আর তা করতে গেলে দ্রুত গতি অশ্বকে ব্যবহার করতে হবে। তাই তারা প্রথমে যুদ্ধের হাতিয়ার হিসাবে বুনো অশ্বকে (wild horse) পোষ মানাতে শিখল।

পরে একদল মানুষ (ঋষি) বুঝল আত্মিক চেতনার সংকলনে পুরুষ তৈরি হলে তবেই আকাঙ্খিত জগৎ সৃষ্টি সম্ভব। তাই তারা পুরুষ যজ্ঞের মাধ্যমে সভ্যতার অগ্রগতির কথা ভেবেছিলেন।

ঋক্‌বৈদিক যুগের পরবর্তী যুগে দর্শন অনুভূতি বন্ধ হয়ে গেলে এই পুরুষ হারিয়ে যায়। ফলে বাইরের দিক থেকে অগ্রগতি হয়নি। বরং ঋষিদের, প্রতীকায়িত দর্শনগুলিকে বাইরে স্থূলে গ্রহণ করে নানান কর্মকান্ডের বিস্তার ঘটেছিল, ও আত্মিক অবনমন ঘটেছিল।

বর্তমান যুগে একজন রক্তমাংসের দেহধারী মানুষের মধ্যে (শ্রীজীবনকৃষ্ণের মধ্যে) চেতনার পূর্ণ সংকলন হওয়ায় তিনি পূর্ণপুরুষ হয়ে উঠেছেন, তার চিন্ময় রূপে অসংখ্য সাধারণ মানুষের মধ্যে ফুটে উঠে লীলা করছেন। তাদের মধ্যে প্রভাব বিস্তার করছেন তার চৈতন্যের দ্বারা। পরে নির্গুণের ঘনমূর্তিরূপে শ্রীজীবনকৃষ্ণকে পেয়ে তাদের জীবনে পুরুষ যজ্ঞের ২য় পর্যায় শুরু হয়েছে। এই পুরুষ যজ্ঞের ফলে পুরুষের সঙ্গে একত্ব উপলব্ধিতে ভক্তসত্তা তথা প্রকৃতি ত্যাগ হলে সাধারণ মানুষেরও Brain Power develop হয়। ঐ পুরুষের মননশীলতা লাভ হয়। যজ্ঞ মানে লীলা আবার যজ্ঞ মানে সৃষ্টি। আমরা ক্রমাগত কিছু পর্দা ভেদ করে চলেছি। আমরা সৃষ্টি করে চলেছি অর্থাৎ discover করে চলেছি। এতে ব্যষ্টির পুরুষ যজ্ঞ হতে সৃষ্ট আত্মিক জগৎকে, ও তার বিকাশকে জানা এবং নিজেকে নিরন্তর বোঝা চলতে থাকে। এটাই আমাদের যজ্ঞ। তখন আত্মিক

জগতে শুরু হয় সভ্যতার বিকাশ—Progress of civilization. আত্মিকে একজনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও একত্বের চেতনায় পুষ্ট এই সভ্যতা অগ্রমুখী অর্থাৎ এর অগ্রগতি সর্বদা ইতিবাচক (পজিটিভ) এবং সমহারে বিকাশশীল।

বাইরের জগতেও হবস্, লক, রুশো প্রভৃতি দার্শনিকরা General will (সাধারণ ইচ্ছা) তত্ত্বে বলেছেন, সকলের ভিতর একই রকম একটি ইচ্ছার প্রকাশ হলে তবেই সমাজের শুভ পরিবর্তন ঘটে ও নতুন উন্নত সমাজ সৃষ্টি হয়। যেমন বেশির ভাগ লোক ইচ্ছা প্রকাশ করলে মুহূর্তে রাজতন্ত্রের অবসান হয়ে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়।

তেমনি পুরুষকে ভিতরে পেয়ে বহুর মধ্যে একজ্ঞানের প্রকাশে একের অর্থাৎ ঐ পুরুষের চেতনা দ্বারা চালিত নতুন সভ্যতা বা কৃষ্টি গড়ে উঠবে সহজেই। আত্মিক জগতে সম্মিলিত মননে চৈতন্য শক্তি সমহারে বিকশিত হয়ে গড়ে উঠবে নতুন কৃষ্টি যেখানে সকলে এই পুরুষকে নিয়ে জীবন নির্বাহ করবে। প্রত্যেকে এক একজন ঋষি হয়ে উঠবে, তাদের দেহগুলিই হবে আশ্রম। যেখানে সেই অখণ্ড চৈতন্যকে নিরীক্ষণ ও বিশ্লেষণ করে জ্ঞানের জগতে অগ্রগতি চলতেই থাকবে।

মানুষের সাধারণ ইচ্ছা বা General will হয়ে উঠবে "সংগচ্ছধ্বং সংবদধ্বং সং বো মনাংসি জানতাম্" অর্থাৎ এককে নিয়ে একসাথে চলা, একসুরে কথা বলা, এক মন হওয়া।

তাই অশ্বমেধ যজ্ঞকে নৃমেধ যজ্ঞও বলে। বহু মানুষকে আত্মিকে এক করা তাদের মধ্যে সংগতি বিধান করার প্রক্রিয়াই এই যজ্ঞ। এক কথায় বহুকে নাশ করে বহুত্বে একত্ব স্থাপন।

উৎক্রান্ত পুরুষকে নিয়ে নির্বাহিত জীবনই পুরুষ যজ্ঞ—এই-ই আধ্যাত্মিক জীবন। তখন মানুষের ব্যবহারিক জীবন হয় খুব সাধারণ ও আসক্তিশূণ্য। এতে Brian এর rationality বাড়ে। সাধারণভাবে, খুব বড় বুদ্ধিমান মানুষের ক্ষেত্রেও rationality-র অভাব দেখা যায়। তাই ISRO-র প্রধান বিজ্ঞানীও মঙ্গল যান উৎক্ষেপণের দিন ধার্য করতে ছুটছেন পুরোহিত ও জ্যোতিষীদের কাছে। Brain power develop হয়ে brain এর rationality বাড়ে বলতে যা বোঝায় তা হ'ল– Sequentially ও logically আত্মিক জগতের বিষয়গুলি ব্যাখ্যা করার ক্ষমতা বাড়া আর ব্যবহারিক জগতেও নির্লিপ্ততা ও পরিমিতি বোধ জন্মায় অর্থাৎ কতটুকু আমার প্রয়োজন, কোন বিষয়ে কতটা react করা উচিত সেই জ্ঞান

লাভ হয়। বুদ্ধি বিকারগ্রস্ত হয়ে অহংকারকে প্রকট করে না। ফলে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারা যায় ও অজ্ঞান অবিদ্যাকে সরিয়ে আত্মিক একত্বের চেতনায় পুষ্ট হয়ে আনন্দময় জীবন যাপন সম্ভব হয়।

৪. প্রসঙ্গ: মধুবিদ্যা।

ঊর্ধ্বরেতা পুরুষ দেহের ভিতর অলক্ষ্যে থাকা আত্মাকে সহস্রারে বিক্ষেপ করে দেখেন, পরমজ্যোতির সমুদ্রে অঙ্গুষ্ঠবৎ আত্মা দর্শন হয়। এই আত্মার মধ্যে জগৎ বা বিশ্ব রূপ দর্শন হবার পর তাকে ভিতরে ঢুকিয়ে নেন বেদান্তের সাধনে। জগৎ বীজবৎ অনুভূতি হয় পরে নির্গুণে বোধাতীত অবস্থায় লয় হয়। এরপর শুরু হয় ব্রহ্মবিদ্যার চূড়ান্ত পর্যায়, মধুবিদ্যা।

সাধকের ভিতর প্রকাশ হয় তূরীয় অবস্থায় নির্গুণ ব্রহ্ম, স্বল্প শুভ্র কুয়াশায় ফিকে জ্যোৎস্নার ন্যায়। এরপর চৈতন্য সাক্ষাৎকার হয়, লাল দীপকের আলো দপ্ করে জ্বলে ওঠে দেখতে পাওয়া যায়। চৈতন্য মানে জ্ঞান, জ্ঞানসূর্য। মধুবিদ্যায় বলছে, The Sun indeed is honey as in Modhuvidya. মধুর রঙ প্রভাত সূর্যের মতো। মধু চৈতন্যের প্রতীক।

এই চৈতন্য সূর্যের অবলম্বন ঐ তূরীয়—নির্গুণ ব্রহ্ম—দ্যুলোক। ছান্দোগ্য উপমা দিয়ে বলছে, দ্যুলোকের নীচে অন্তরীক্ষ। দ্যুলোক ও অন্তরীক্ষের মাঝে (ছাদ ও তার নীচে শূন্য ঘরের মাঝে (যেমন ব্যালকুনি) রয়েছে সূর্য। অন্তরীক্ষ যেন মৌচাক। সূর্যকিরণ সমূহ মধু, কিরণপাতে তথা মধুক্ষরণে জগৎ মধুমতী হয়। অন্তরীক্ষ মানে শূণ্য, অহংশূণ্য অবস্থায় সাধকের আত্মিক দেহটি অন্তরীক্ষ। সাধকের অন্তরে সূর্য, সূর্যের কিরণসমূহ---মধু। আত্মাই চৈতন্য সূর্য হয়েছে—একত্বের চৈতন্য। মধুবিদ্যার নির্যাস হল এই একত্ব বোধ। সূর্য হলেই তা থেকে সৃষ্টি হয় সৌরজগৎ যে জগৎ ঐ সূর্যের চারপাশে ঘুরবে। সূর্যের মহিমা ঘোষণা করবে। যেমন রেলের ইঞ্জিন তৈরি হলেই বগি তৈরি হবে। তার সাথে যুক্ত হয়ে অনেক বগি এক পথে চলবে। আবার প্রত্যেক বগিই electrified করা থাকে যাতে ইঞ্জিন থেকে সহজেই Control করা যায়। বগি না থাকলে এত হর্স পাওয়ারের ইঞ্জিন কথাটার কোন অর্থ হতো না। আসলে বগিগুলো ইঞ্জিনেরই অংশ।

সাধকের অন্তরে সৃষ্ট এই নতুন জগতে কিরণপাত তথা মধুপাত হয়। চৈতন্য সাক্ষাৎকারের পর শ্রীজীবনকৃষ্ণ এক স্বপ্নে দেখেছিলেন, বিছানার সাদা চাদরের

উপর ৪/৫ ফোঁটা মধু পড়ল। উনি হাত দিয়ে তা মুছতে গেলেন। মুছতে গিয়ে পুরো চাদরে মধু ছড়িয়ে গেল, চাদরটা মধুতে আপ্লুত হয়ে গেল। তাঁর অন্তর্জগতে এই মধুপাত ও অনুশীলনের ফলে ধীরে ধীরে তা একত্বের চেতনায় আপ্লুত হল—এই প্রক্রিয়া চলে সাধকের দেহে রসের সাধনের মাধ্যমে। বেদে মধুবিদ্যায় বলেছে যার মধুবিদ্যা লাভ হয়েছে সে অনুশীলনের দ্বারা এই জিনিস উপভোগ করে তৃপ্ত হয়।

তাই নগেনবাবু স্বপ্নে দেখলেন, বাজারে রবারের নল দিয়ে জোরের সঙ্গে মধু বিতরণ হচ্ছে। মনে হচ্ছে এই মধু সংগ্রহ করেছেন জীবনকৃষ্ণ এবং একজন অজানা মানুষ অর্থাৎ নির্গুণ।

নিত্যলীলা যোগে নির্গুণের রহস্যভেদ হলে একত্বের জ্ঞান পূর্ণতা পায়। এই অবস্থায় প্রাথমিক স্তরে ব্রহ্মবিদ পুরুষ জগতকে নিজের মধ্যে উপলব্ধি করেন। এরপর ভিতরের একত্বের চেতনাপ্রাপ্ত জগৎকে বাইরে—বৃহৎ micro তে বিক্ষেপ করেন—তাঁর চিন্ময় রূপ হয় বিশ্বব্যাপী। মধুবিদ্যার মধু ছড়ানো হল, আপ্লুত হতে লাগলো তাঁর একত্বের চৈতন্যজ্ঞানে।

এই প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে শ্রীজীবনকৃষ্ণের ''অনাথ বন্ধু'' দর্শন। তিনি দেখছেন অন্ধকার এক গর্ত থেকে চুলের মুঠি ধরে একজনকে টেনে তুললেন। মনে হচ্ছে তার নাম অনাথবন্ধু। তিনি বললেন, ''বাবুজী মশাই, আপনি জানবেন আপনি ভগবান, তবে গুপ্তভাবে লীলা।''

এখানেই শেষ নয়। দ্যুলোক যা সূর্যের অবলম্বন হয়ে আছে, পূর্ণ একত্বের চৈতন্যসূর্যের তা হ'ল নির্গুণব্রহ্ম (সগুণে একজ্ঞানের চৈতন্য হয় আংশিক মাত্রায়)। তাঁর বিক্ষেপিত চেতনা-প্রাপ্ত জগৎকে তিনি আবার নিজের ভিতর টেনে নেন, যেন একটি পূর্ণচক্র সম্পূর্ণ হ'ল, তিনি হয়ে ওঠেন মধুবিদ্যার মূর্তরূপ। এই মধুময় জগৎ যা তাঁর অন্তরে আপ্লুত হল তা তিনি আবার বাইরে মনুষ্যজাতির অন্তরে বিক্ষেপ করেন। তাই মনুষ্যজাতি মধুরসে আপ্লুত হয়ে ''মধুস্মৃতি''র ন্যায় অনুচৈতন্য লাভে ব্রহ্মবিদ পুরুষের সঙ্গে একত্ব অনুভব করে।

তাঁর একজ্ঞানের চৈতন্য (জ্ঞানচৈতন্য) দ্যুলোক ও অন্তরীক্ষের মাঝে অবস্থান করে মধুবিদ্যার মধুরসে জগৎকে আপ্লুত করতে থাকে। তার একজ্ঞানের আলো ছড়িয়ে পড়ে মনুষ্যজাতির মধ্যে যারা তার চৈতন্য লাভে মানহুঁশ হয়ে ওঠে তাদের মধ্যে। তারা তাঁকে স্বপ্নে সূর্যের মধ্যে দর্শন করে ও তার একত্বের

চেতনায় আপ্লুত হয়। শ্রীজীবনকৃষ্ণকে এই পর্বে ১৫/১৬ জন সূর্যমণ্ডলে দর্শন করে সেকথা তার কাছে এসে জানায়। তখন তার আত্মিক দেহ বিশ্বজনীন অর্থাৎ cosmic body হয়ে উঠেছে। তার ''আমি'' নেই—শূণ্য—অন্তরীক্ষ (তবে এই অন্তরীক্ষ বা শূণ্য অবস্থা ব্যষ্টির অহংশূন্য অবস্থার মতো নয়।) এই অন্তরীক্ষ হল তার বিশ্বব্যাপী আমি—তার দেহের চিন্ময় রূপে যার প্রকাশ যা শূণ্য কিন্তু বায়ুতে পূর্ণ অন্তরীক্ষের ন্যায় নির্গুণের শক্তিতে পূর্ণ। তার রূপ শূণ্য অর্থাৎ বস্তুত অরূপ।

পৃথিবীর উপর বায়ুমন্ডল যেমন বেষ্টন করে থাকে ও মানুষকে রক্ষা করে তেমনি এই অন্তরীক্ষ মনুষ্যজাতিকে আত্মিকে রক্ষা করে। তার cosmic body অন্তরীক্ষ বলেই তাকে কখনও অজানা মানুষরূপে কখনও পরমজ্যোতি রূপে কখনও প্রতীকেও অন্যরূপে দেখা যায়। তাকে নিয়ে এইসব দর্শনের মধ্যে দিয়ে তার একত্বের চেতনা বিকীর্ণ হয় দ্রষ্টাদের মধ্যে।

তিনি যে অন্তরীক্ষ হয়ে ধরা দিচ্ছেন ও তার প্রাণসূর্যের কিরণ চৈতন্য দান করছে তার প্রমাণ দেয় অনেকে তাকে মৌচাক রূপে দেখে। বেহালার সত্যবাবু দেখলেন—তার মাথাটা মৌচাক। তাতে গুটি কয়েক মৌমাছি এসে বসেছে। পরে শীতল নামে একটি ছেলে দেখল, জীবনকৃষ্ণের সারা দেহটি মৌচাক হয়ে গেছে। সাদা ধবধব করছে। দেখাচ্ছে তিনি সম্পূর্ণ অহংশূণ্য হয়েছেন। পরিণতিতে তার দেহ অন্তরীক্ষ হয়েছে, বিশ্বব্যাপী হয়েছে। অসংখ্য মানুষ তার চিন্ময়রূপ অন্তরে দর্শন করে ঘোষণা করছে আত্মিকে ''এক''ই আছে। একত্বের চেতনায় আপ্লুত জগৎ দর্শন হয়।

ঋকবেদও বলছে—মধুবিদ্যার effect হ'ল চারিদিকে মধুক্ষরণ হয়। মধুবিদ্যালাভকারী মানুষটির মাথা মধুময় হয়ে যায়, সে তাই বিক্ষেপ করে দেখে চারদিকে মধুক্ষরণ হচ্ছে। তার মাথায় মধু তাই সে চারদিক মধুময় দেখছে।

পূর্ণ থেকে যা আসে তাও পূর্ণ। তাই এককণা চৈতন্য দ্বারা একত্বের জ্ঞান আমরা ধারণা করতে পারি ও জীবন ব্রহ্মানন্দে আপ্লুত হয়। সত্য অর্থে জগৎ মধুমতী হয়।

(৫) প্রসঙ্গ ঃ বেদে উল্লিখিত প্রতীক চিন্তা।

স্মরণাতীত কাল থেকে সকল ধর্মেই প্রতীকের ব্যবহার দেখতে পাওয়া যায়। এক হিসাবে প্রতীক ব্যতীত আমরা চিন্তা করতে পারি না। আসলে প্রতীক হলো এমন কিছু যা তার নিজের রূপের আড়ালে অন্য আলাদা কিছু সত্তার ইঙ্গিত

দেয়। যুগ যুগ ধরে প্রতীকেরও বিবর্তন হয়েছে। এর সূচনা হয় মিশরীয় চিত্রলিপি (হায়ারোগ্লিফিক্স) থেকে। পরে এর মধ্যে প্রবেশ করে ভাবময়তা। মানুষ তার ভাবনাকে বিভিন্নভাবে প্রতীকায়িত করে। ধর্মীয় ভাবনায় প্রতীকের নানান ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। কেউ ঈশ্বরের রূপ কল্পনা করে তার মূর্তি গড়ে তাকেই ঈশ্বর ভেবে উপাসনা করে। এটি প্রতীক উপাসনা। এতে সঠিক ঈশ্বরীয় ধারণা বা চিন্তার পূর্ণতা লাভ করতে দেয় না, বরং বহির্মূখী করে সাধককে। আবার বিভিন্ন স্বপ্নে নানান প্রতীকের যেমন, সাপ, পাখি, সমুদ্র, সূর্য ইত্যাদির ব্যবহারের মাধ্যমে আধ্যাত্মিক জ্ঞানের বার্তা আসে।

এই প্রতীকগুলি ঈশ্বর বস্তুকে নয়, তার কোন বিশেষ গুণকে highlight করে। কুন্ডলিনীর প্রতীক সাপ যা তার সর্পিল গতি ও অহং-এর মৃত্যু ঘটাবার জন্য যথেষ্ট তেজের (বিষের) কথা স্মরণ করায়। যার বস্তুতত্ত্বের সাধন হয়ে কুণ্ডলিনী জাগ্রত হয় তিনি কিন্তু সাপ দেখবেন না। বস্তুগতভাবে কুণ্ডলিনী যে জাগ্রত হয়েছে তার দেহে। কুণ্ডলিনীর সম্যক পরিচয় তিনি লাভ করেন। প্রতীকগুলির যথাযথ যোগাঙ্গ বিশ্লেষণ না করলে মূর্তিপুজোর মতোই তা মনকে বহির্মুখী করে ও চেতনার অগ্রগতিকে বাধা দেয়।

কিন্তু বেদ কথিত প্রতীক উপাসনা বলতে প্রতীকি রূপ ধ্যানের কথা বোঝায় না। চিন্তার দিক থেকে প্রতীকের কথা বোঝানো হয়েছে। বেদ কোন নির্দিষ্ট মূর্তির কথা বলছে না কারণ বেদের দেবতা ইন্দ্র, বরুণ ইত্যাদির কোন রূপ নেই। বেদ যখন বলছে, ‘‘যে প্রতীক চিন্তা করে না তার কাছে ব্রহ্মলোক থেকে একজন পুরুষ আসে আর তাকে ব্রহ্মলোকে নিয়ে যায়’’—সেখানে প্রতীক বলতে ব্রহ্মের বিশেষ একটি গুণের চিন্তা ও তার প্রভাব বাইরে পড়ুক এই প্রার্থনা করাকে বোঝানো হয়েছে।

যেমন, ইন্দ্র বজ্র দিয়ে শত্রুনাশ করেন। তিনি প্রসন্ন হলে বাইরেও আমার শত্রুদের জব্দ করে দেবেন, এই ভাবনা আমার চেতনাকে গ্রাস করলে তা আমার চেতনার অগ্রগতি ব্যাহত করবে। যদি ভাবি তিনি আমার ও পরিবারের সকলকে রোগমুক্ত করে দিতে পারেন, তার ঐ গুণের চিন্তা আমাকে গ্রাস করলে তা আমাকে এক জায়গায় আটকে দেবে, সামগ্রিক ভাবে ঈশ্বরকে ধারণা করা শক্ত হয়ে পড়বে।

বেদের প্রধান দেবতা ইন্দ্রের এরূপ ১০৮টি মন্ত্র রচনা করা হয়েছে। কোন একটি বিশেষ গুণের চিন্তায় মগ্ন থাকতে বারণ করছেন ঋষিরা। এছাড়াও ব্রহ্ম

সম্বন্ধে কোন Presupposed idea বা সংস্কারজ চিন্তাও বেদ কথিত প্রতীক চিন্তার সমগোত্রীয়।

শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে এ জাতীয় প্রতীক চিন্তারই প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। যেমন তিনি বলছেন, তোমরা যাকে ব্রহ্ম বলো আমি তাকেই কালী বলি। অর্থাৎ তার কাছে কালীর চিন্তা কোন মূর্তি চিন্তা নয়। তিনি যখন কেশব সেনের অসুখ ভালো করে দেবার জন্য সিদ্ধেশ্বরী কালীর কাছে মানত করছেন তখন কালীর তথা ব্রহ্মের একটি বিশেষ গুণের কথা চিন্তা করছেন। সিদ্ধাই শক্তির সদৃশ তার রোগ নিরাময় করার শক্তির কথা ভাবছেন। ব্রহ্মের কোন বিশেষ গুণ নিয়ে সংস্কারজ চিন্তায় আবদ্ধ থাকছেন।

শ্রীজীবনকৃষ্ণ এই ধরণের কোন প্রতীক চিন্তায় আবদ্ধ ছিলেন না। মূর্তি পূজার প্রশ্ন তো তার জীবনে ছিল না। তিনি মায়ামুক্ত পুরুষ হওয়ায় স্বপ্নে দেখা প্রতীকগুলির সঠিক যোগের অর্থ করে চূড়ান্ত জ্ঞানলাভ করেছেন। আবার ধর্মজগতের সকল কথাকে কখনও বা বাইরের কথাকেও (ভাষাও যে প্রতীক) আত্মিকে ব্যাখ্যা করে অন্তর্জগতের বিষয়রূপে দেখে সম্পূর্ণ অন্তর্মূখী থাকতে পেরেছেন। একজ্ঞানে স্থিত থেকেছেন। তার এই পূর্ণতার লক্ষণগুলি বুঝে প্রতীকতত্ত্ব ভেদ করে এযুগে আমরা সমষ্টি চৈতন্যকে আপন সত্তা বলে উপলব্ধি করতে ও বাইরের জিনিসকে যোগের দৃষ্টিতে বিচার করে দিনের সিংহভাগ সময় অন্তর্জগতে থাকতে অর্থাৎ অন্তর্মুখী হয়ে থাকতে পারছি কিনা, কোন প্রতীক চিন্তা বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে কিনা তা দেখতে হবে।

৬. **প্রসঙ্গ ঃ অভাব**।

পরিবারে প্রচলিত ধর্মীয় সংস্কৃতির কারণে এবং সচেতন ভাবে (deliberately) যদি ‘‘আমি কে’’ বা ‘‘ঈশ্বর কী’’ তাকে জানতে হবে ইত্যাদি আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পায় তাহলে তার আত্মিক জগতে অভাব আছে বলা যায়। অর্থাৎ আত্মিকে ঐ আকাঙ্ক্ষা বা চাহিদাজনিত অপূর্ণতাকেই অভাব বলে, যা আমরা ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে বিশেষভাবে দেখতে পাই। পরিবারের হিন্দু সংস্কার তার মধ্যে ঈশ্বরকে জানার আকাঙ্ক্ষা তৈরি করেছিল। ১১ বছর বয়সে জ্যোতিদর্শন করে সমাধি হলে তার সংস্কার ঈশ্বরকে জানার আকাঙ্খা আরও তীব্র করে তোলে। মা-কে দেখার জন্য কান্না তার এই অভাব বোধকেই প্রকাশ করে। কিন্তু পরবর্তীতে তিনি যখন জানতে চাইছেন, আমাকে তোমার কী বোধ হয়? অর্থাৎ আমি যে অবতার সে কথা কি বুঝতে পারছ?—এই জিজ্ঞাসা অভাব

বোধ থেকে নয়। এটা তার নিজের আত্মিক অবস্থা (অবতারত্ব) সম্পর্কে সংশয়কে বোঝায়।

কিন্তু পরবর্তীকালে জীবনকৃষ্ণের মধ্যে দেখা যায় যে তার মধ্যে কোন অভাববোধ ছিল না। তিনি বলছেন, ঈশ্বরকে যে ডাকতে হয় তাই তিনি জানতেন না। অর্থাৎ পরিবার বা পরিবেশ থেকে ঈশ্বর আরাধনার সংস্কার তিনি কিছুই গ্রহণ করেননি। তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ সংস্কারমুক্ত। ১২ বছর ৪ মাস বয়সে যখন শ্রীরামকৃষ্ণকে প্রথম স্বপ্নে দেখলেন তখন তিনি তাকে চিনতেন না। তার পরেও সচেতন ভাবে (deliberately) তার মধ্যে ঈশ্বরকে ডাকার বা জানার ইচ্ছা জাগেনি। তারমধ্যে যা যা সাধন আপনা থেকেই হয়ে গেছে, তা তিনি শুধু দেখে যেতেন। তাই তিনি ধীরে ধীরে হয়ে উঠলেন পরমব্রহ্ম। গোলাপ গাছে যেন গোলাপ ফুল ফুটল। অভাবের প্রশ্ন থাকলো না। কিন্তু সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে কলম বা গ্রাফটিং হলে তবেই গোলাপ ফুল ফোটে।

তাই সাধারণ মানুষের মনে এই আত্মিক অভাব জেগে ওঠা দরকার। যা হয় দু'ভাবে। আপনা হতে আর deliberately. পারিবারিক ধর্মীয় রীতি ও সংস্কার অনুসারে প্রথম থেকেই ঈশ্বরকে ডাকার বা জানার ইচ্ছা জাগে। আমি কে বা ঈশ্বর কী-এই প্রশ্ন অনেকের মনে ঈশ্বরকে জানার আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে তোলে। কারুর কারুর ক্ষেত্রে এই ইচ্ছা চাপা থাকলেও কোন বিশেষ দর্শন তার মধ্যে ঈশ্বরকে জানার আকাঙ্খা জাগিয়ে তোলে। এই অভাব আরও বাড়ে যদি কেউ মানব ব্রহ্মের রূপ দর্শন করে ও তার অমৃতবাণী অনুশীলন করে সম্মিলিতভাবে। এই দর্শন আপনা থেকেই হয়। তখন মানবব্রহ্মের চেতনা তার (দ্রষ্টার) চেতনার উপর প্রতিস্থাপিত হয়। এই প্রতিস্থাপন যথাযথ ও স্থায়ী হয় যদি দ্রষ্টা মানবব্রহ্মের অনুসত্তা লাভ করে ও তার মধ্যে নির্গুণের তেজ জেগে ওঠে। এটি সম্ভব হয় মানবব্রহ্মকে সমষ্টি চৈতন্যরূপে অর্থাৎ নির্গুণের ঘনমূর্তি রূপে দর্শন করলে। যেহেতু সাধারণ মানুষের দেহে বস্তুতত্ত্বের সাধন হয় না, তাদের দেহ উপযুক্ত নয়, সেখানে দ্বিতীয় স্তরের অনুভূতি হয়। তাই সচেতন ভাবে আত্মিক চাহিদাসৃষ্টি ও পরিণতিতে একের চৈতন্যের প্রতিস্থাপনের মাধ্যমে সকলের একত্ব লাভই একমাত্র পথ। তাই আমাদের জীবনে সম্মিলিতভাবে সমষ্টি চৈতন্যকে নিয়ে দর্শন ও তার বাণীর চর্চার কোন বিকল্প নেই।

(৭) প্রসঙ্গ ঃ 'যোগীদের সর্বদা স্মরণ মনন থাকে'—কথামৃত

যোগ মানে কী? পাতঞ্জল যোগশাস্ত্রমতে যোগশ্চিত্ত বৃত্তিনিরোধ। চিত্তবৃত্তি

নিরোধ হলে যোগ হয়।

যোগের দুটি দিক আছে। (১) সংযোগ—জীবাত্মা ও পরমাত্মার যোগ। (২) সমাধি—সমাধি দুই ধরনের। (ক) ধ্যান সমাধি—ব্যষ্টির সাধনে ধ্যানের চরম সীমা। এটি প্রাথমিক পর্যায়ের সমাধি। আর আছে (খ) উচ্চস্তরের পূর্ণাঙ্গ সমাধি। এই সমাধি হলে জীবাত্মা ও পরমাত্মা এক হয়ে যায়।

চিত্ত মানে অতিশুদ্ধমন বা সূক্ষ্ম মন। চিত্তবৃত্তি মানে চিত্তের বিকার বা পরিণাম অর্থাৎ বিশেষ অবস্থা লাভ। স্বাভাবিক অবস্থায় চিত্ত অবলম্বন করে মন, বুদ্ধি, অহংকার, নানা সংস্কারের ধারা ও ‘আমি’-বোধকে। এখানে মন মানে স্থূল মন যা বর্হিমুখী ও ভোগ-মুখী। বুদ্ধি মানে মলিন বুদ্ধি যা অহংকারের জন্ম দেয়। মানুষ ভাবে আমার বেশি বুদ্ধি আছে তাই আমি বেশি সম্মান, মূল্য ও সুযোগ সুবিধা পাওয়ার অধিকারী। ফলে সে বুদ্ধির বড়াই করে ও অহংকারের প্রকাশ ঘটায়। সে ভাবে কী করলে কী ঘটবে সে বুঝতে পারে অতএব তার ব্রেন যুক্তিবাদী (rational) কিন্তু বাস্তবে তা নয়। কারণ সে নানা সংস্কারে আবদ্ধ। তার অহংকার ভাবায় তার যুক্তিই ঠিক। ঈশ্বর থাকলে ভূতও থাকবে বা আলো থাকলে অন্ধকারও থাকবে—এরূপ যুক্তি দেয়। কিন্তু ঈশ্বরই আছেন, ভূত নেই তা বুঝতে পারে না। জগতে আলোই আছে অন্ধকার নেই। পেঁচা অন্ধকারেও দেখতে পায় ও শিকার ধরে অর্থাৎ যাকে অন্ধকার বলছি সেখানে অল্প পরিমানে হলেও আলো আছে তা খেয়াল করে না। উকিল যুক্তি দিয়ে কিছু কেস জেতাতে পারলে অস্বাভাবিক ফি বাড়ায় যেটা তার অহংকে প্রকাশ করে। এছাড়া চিত্ত অবলম্বন করে নানা কুসংস্কার যা তার ভাবনাকে প্রভাবিত করে, সংকুচিত করে ও ক্ষুদ্র আমি বোধকে শক্তিশালী করে। তাই দেখা যায় খুব বড় মাপের বিজ্ঞানী হয়েও ইসরোর (ISRO) প্রধান কে. শিবন চন্দ্রযান উৎক্ষেপনের শুভ সময় জানতে ছোটেন পুরোহিতের কাছে।

ঐসব অবলম্বন ত্যাগ করে চরম পরিনামের দিকে চিত্তের গতিলাভ হলে চিত্তবৃত্তি বলে। চিত্তের চরম বা শেষ অবলম্বন হল আত্মা। আমি জ্ঞান সরে গিয়ে চিত্ত আত্মার আধার হলে আত্মাই থাকে—চিত্ত থাকে না। চিত্তের এই চরম পরিণামই চিত্তবৃত্তি নিরোধ। জল যেমন যে পাত্রে থাকে সেই রকম আকার ধারণ করে চিত্তও তেমনি আত্মার ধারক হয়ে ওঠে। একাকার হয়ে যায়। পৃথক অস্তিত্ব থাকে না। তখনই যোগ হয়।

বস্তুতত্ত্বের সাধন যার তার জীবাত্মা পরমাত্মায় পরিবর্তিত হয়। তিনি অন্যদের

পরিবর্তনের তথা চিত্তবৃত্তির কারণ হন। কিন্তু তাদের চিত্তবৃত্তিনিরোধ হয় না। সম্পূর্ণ আমি জ্ঞান শূন্য অবস্থা হয় না বলে। তাদের চিত্তবৃত্তির চূড়ান্ত অবস্থায় পরমাত্মার সঙ্গে সংযোগ হয়। ফলে তারাও দ্বিতীয় স্তরে যোগী হন। তাদেরও ব্রেন অনেকাংশে যুক্তিবাদী (rational) হয়।

চিত্তবৃত্তির মূল কথা হলো জ্ঞান। যার সমাধি হয় তিনি একে—অখন্ডচৈতন্যে পরিবর্তিত হন। একজ্ঞানের মূর্তরূপ হয়ে ওঠেন। অন্যরা তার রূপে প্রকাশিত পরমাত্মার সঙ্গে সংযোগে তাকে আপনসত্তা বলে অনুভবে একজ্ঞান তথা একত্বের চেতনা লাভ করে। শাস্ত্রমতে আত্মাসাক্ষাৎকারের আগে পর্যন্ত আমি জ্ঞান থাকে। কিন্তু শ্রীজীবনকৃষ্ণের ক্ষেত্রে এই ‘‘আমি’’ সরে যাওয়া ও চিত্তবৃত্তিনিরোধ আত্মাসাক্ষাৎকারের সময় হয়নি। ১২ বছর ৪ মাস বয়সে ব্রহ্মপুর থেকে লোক আসার ঠিক আগে তার আমি চলে গিয়েছিল এমনও নয়। তার আমি জ্ঞান কখনোই ছিল না—ফলে চিত্তের বিকার অবস্থা লাভ হয়নি। তিনি জন্ম থেকেই সংস্কারমুক্ত ও আমি বোধ শূন্য। তবে তা স্পষ্ট হয়েছে কালে কালে।

বারো বছর চার মাসে তার কাছে ব্রহ্মপুরের লোক এল। এ যেন আমি সরে গিয়ে আত্মা তথা আপনসত্তাকে বোঝা হল। চব্বিশ বছর আট মাসে এই আত্মা যে ব্যষ্টির অখন্ডচৈতন্য তথা জীবাত্মা তা বোঝা হল ভালোভাবে। পরে পরমাত্মা রূপে অন্যেরা তাঁকে অন্তরে দেখে সেকথা জানালে উনি যে জগৎব্যাপ্ত অখন্ড চৈতন্য তথা পরমাত্মা তা বুঝলেন।

কারও আমি জ্ঞান থাকলে তার কাছে ব্রহ্মপুর থেকে লোক আসে না।

বিষয়টা একটা উপমা দিয়ে বোঝানো যায়। ট্রেন আসছে বলা মানেই বুঝতে হবে রেললাইন পাতা, টিকিট তৈরি ও তার চেকিং সিস্টেম, স্টেশন তৈরি ইত্যাদি যাবতীয় ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হয়ে গিয়েছে। এমনকি গন্তব্যস্থল ও সেখানে কখন গাড়ী পৌঁছাবে তা সবই ঠিক হয়ে গিয়েছে। কিন্তু যখন তা আন্তর্জাতিক মানের স্টেশনে পৌঁছায় তখন বিষয়টা ভালোভাবে বোধগম্য হয়। এর বেশি কিছু নয়।

এই পূর্ণযোগীর সর্বদা স্মরণ মনন থাকে। শুধু অতীতে প্রকাশিত ঈশ্বরের মহিমা স্মরণ নয়, তিনি মনন করেন বিভিন্ন দৃষ্টিকোন থেকে ও নতুন অর্থ উদ্ধার করেন। শ্রীশ্রী ঠাকুর (রামকৃষ্ণ) মা, মা করছেন, সর্বদা ঈশ্বরকে স্মরণ করছেন বটে কিন্তু মননে সীমাবদ্ধতা লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু শ্রীজীবনকৃষ্ণ

ঠাকুরের জীবন ও বাণী স্মরণ করে তার গভীরে ডুব দিয়ে ভিন্ন অর্থ বের করেছেন স্থূল অর্থ অতিক্রম করে। তিনি ঠাকুরের কোন কথার কতখানি গুরুত্ব তা ধরিয়ে দিয়েছেন, এমনকি ঠাকুরের কথার সীমানা পেরিয়ে আত্মিক জগতে নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছেন। সাথে সাথে নিজের আত্মিক অগ্রগতির স্বমূল্যায়ন করে ক্রমাগত এগিয়ে গেছেন।

তিনি রামকৃষ্ণময় হলেও তার বিচারধারা বা Line of thought ছিল সম্পূর্ণ আলাদা। যেমন শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, 'রাখাল তুই জগন্নাথের প্রসাদ খা।' শ্রীজীবনকৃষ্ণ তার যা ব্যাখ্যা দিলেন তার মানে দাঁড়ালো যে রামকৃষ্ণদেব প্রসাদ খেতে বলেন নি। তিনি জগন্নাথের প্রসন্নতা কামনা করতে বলেছেন। এই স্মরণমনন একযুগে একজনের দ্বারা ঠিক ঠিক হয়। যিনি পূর্ণ যোগী যার চিত্তবৃত্তি নিরোধ হয়েছে তার মননে ক্রমান্বয়ে আরও বেশি বেশি করে নিজের আত্মিক বিবর্তনে (Self evolution-এ) আত্মিক জগতের বিভিন্ন দিক উন্মোচিত হয়। একজ্ঞানের ধারণা ক্রমেই স্পষ্ট হতে থাকে ও তা ভাষা পায়। অপর মানুষেরা যারা দ্বিতীয় স্তরের যোগী তারা তাঁর দেখানো পথে তার ভাবনায় ভাবিত হয়ে আপ্লুত হয়।

শাস্ত্রমতে চিত্তবৃত্তিনিরোধ হলে আমি সরে গিয়ে আত্মায় লীন হয় সাধক। তার মোক্ষ লাভ হয় ও দেহ টুটে যায়। ফলে এরূপ যোগীর ঈশ্বরের স্মরণ মননের প্রশ্ন ওঠে না। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ যে বলছেন, যোগীর সর্বদা স্মরণ মনন থাকে তাহলে তা বস্তুত নিজের জন্যই বলেছেন। কিন্তু তিনি পরমাত্মায় পরিবর্তিত হননি বলে তার স্মরণ মননে একত্বের ধর্মের স্বরূপ প্রকাশিত হয়নি।।

স্মৃতিচারণ

স্মৃতিচারণ

শ্রীজীবনকৃষ্ণের পুতঃসঙ্গ লাভে ধন্য কিছু মানুষের টুকরো কিছু স্মৃতিকথা এখানে উল্লেখ করা হলো।

ক্ষেত্রদাস বন্দ্যোপাধ্যায় (দাশুবাবু)

আমরা জীবনকৃষ্ণের ঘরে দীর্ঘদিন যাওয়া আসা করলেও তাঁর জন্মদিন কারও জানা ছিলো না। আমাদেরকে উনি কোনো দিন বলেননি। কিন্তু অদ্ভুত ভাবে এক স্বপ্নে তাঁর জন্মদিন জানা যায়। দেখছি—যেন সকালবেলা অফিস যাচ্ছি। রামকৃষ্ণপুর ঘাট থেকে গঙ্গা পেরিয়ে চাঁদপাল ঘাটে এসে উঠেছি। ব্যাঙ্কশাল স্ট্রীট যাব। চাঁদ পাল ঘাট থেকে বেরিয়ে ইম্পেরিয়াল ব্যাঙ্ক (এখন স্টেট ব্যাংক) এর কাছ বরাবর এসেছি। ব্যাংকের গা দিয়ে যে রাস্তাটা হাইকোর্টের দিকে চলে গেছে তার মুখটায় দেখি বসন্ত দাঁড়িয়ে একলা। বসন্তকে ওই অবস্থায় ওইখানে দেখে আমি তো অবাক। বললাম, একি! বসন্ত, তুমি এখানে দাঁড়িয়ে? বসন্ত বললো, তুমি জান না? আজ যে জীবুদার জন্মদিন—৭ই জ্যৈষ্ঠ। আমি বললাম ঠাকুরের জন্মদিন? তা তুমি এখানে দাঁড়িয়ে? সে বললো, ''আমি তো যাচ্ছি''। যেন ফেরি নৌকায় গঙ্গা পার হয়ে হাওড়ায় যাবে। আমাকে বললে, ''তুমি কোথায় যাচ্ছো।''

পরদিন জীবনকৃষ্ণের ঘরে গিয়ে স্বপ্নটা বলাতে উনি বললেন, ''শেষকালে ঠাকুর আপনার ভেতর দিয়েই ফোটালেন। আমি একথা এতদিন কাউকে বলিনি। আমাকে অনেকে প্রশ্ন করেছিলো। আমি এতদিন চেপে রেখেছিলাম। হ্যাঁ, ৭ই জ্যৈষ্ঠ আমার জন্মদিন। সকলের সামনে ঘোষণা করলেন। সেই দিনই সবাই জানলো ৭ই জ্যৈষ্ঠ জীবনকৃষ্ণের জন্মদিন।

অনাথনাথ মন্ডল

আদর্শবাদ নিয়ে মাঝে মাঝে আমাদের মধ্যে কারও কারও সঙ্গে বিশেষ করে সুধীনদার সঙ্গে ওঁর তর্ক হতো। উনি আগে আগে বলতেন—''বাবা ঠাকুরের জীবন আমাদের আদর্শ।'' আবার বলতেন—''তোদের জীবনে কোনো প্রশ্ন উঠলে আমার দিকে তাকাবি, তাহলে সব প্রশ্নের মীমাংসা হয়ে যাবে।'' উনি নিজে অনুভূতি করেছিলেন—আদর্শবাদের ফল ফলবে। কিন্তু সুধীনদা যখন ওঁর জীবন আমাদের আদর্শ এই কথা ওঁর কাছে বললেন, উনি তদ্দন্ডে

বললেন—"দ্যাখ আমার ব্যবহারিক জীবন তোমাদের আদর্শ নয়। আমি এখন আমাদের যা হয়েছে, তার অন্য অর্থ বুঝি।" আবার একদিন ওঁকে যে বহুলোকে স্বপ্নে, ধ্যান ও ট্রান্সে এবং জাগ্রত অবস্থায় দেখেন, সে সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে বলছিলেন—"জগতে এর নজির নেই।" সুধীনদা উত্তর করলেন—"শ্রীমদ্ভাগবতে এর নজির আছে।" উনি সুধীনদাকে ভাগবত আনতে বললেন। সুধীনদা উত্তর করলেন—শ্রীমদ্ভাগবতের নবম ও দশম স্কন্ধে এর উল্লেখ আছে। এই বলে তিনি শ্রীমদ্ভাগবতের নবম এবং দশম স্কন্ধ নিয়ে এলেন। উনি প্রতিদিন রাত্রে মেলানী শেষে মশারীর ভেতর অল্প আলোতে বসে বসে পড়ে ভাগবত দুখানি শেষ করে আমাদের কাছে একদিন বললেন, "ওরে বাবা at the cost of my eyes I read, but I found nothing in them. শ্রীকৃষ্ণ যে তাঁর ষোলশ মহিষীর কাছে একই সময়ে অবস্থান করতেন, এ কাহিনী গল্প ছাড়া আর কিছু নয়। আমাদের এ বস্তু অন্য কিছু।" তারপর উনি সুধীনদাকে বই দুখানি ফেরত দিলেন।

জিতেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

জীবনকৃষ্ণ মাঝে মাঝে আমাদের পুরোনো দিনের অভিজ্ঞতার কথা শোনাতেন। এইরূপ একদিনের কথা মনে পড়ছে। বললেন—"ধর্মকথা বড় একটা কারো সাথে কইতুম না। তখন থাকতুম বেঙ্গল বোর্ডিংয়ে। সন্ধ্যার সময় সামনের দরজা পিছনের দিকে খুলে রেখে, ঘর অন্ধকার করে বিছানার ওপর বসে ধ্যান করতুম। তা এক মাসের মধ্যে এমন হলো যে সন্ধ্যার সময় যারা বোর্ডিংয়ে থাকতো, হ্যারিসন রোডের দিকের ওই লম্বা ফালিটা, যত লোক থাকতো সবাই ওই সময় ধ্যান করতো। রান্নার ঠাকুর চাকররা আমার বেশ নাম রেখেছিল। বলত গোঁসাই ঠাকুর। তখন রাতে লুচি খেতুম। ওরা বেশ গরম গরম লুচি ভেজে দিত। তখন বেঙ্গল বোর্ডিং বেশ ভালো ছিলো। একদিন ঠাকুর তো আমার খাবার দিয়ে গেছে। আমি তখনও খেতে বসিনি। যে চাকরটা আমার দেখাশুনা করত, তার গলা শুনতে পাচ্ছি। সে ঠাকুরকে বলছে, আরে ঠাকুর, তুমি কী? গোঁসাই ঠাকুরের রাত্রের খাবার নষ্ট করে দিলে? তাঁর খাবারে ডিম দিয়েছো? আমি পাতের দিকে চেয়ে দেখি কই এমন তো কিছু দেয়নি। তখন কী আর করি, ঠাকুরকে বললুম, আজ যা দিয়েছো দিয়েছো, এর পরে রাত্রে আর ডিম দিও না। রাত্রে ডিম খেতে নেই।

রেখা মুখার্জী

আমার বড়দাদা ঠাকুর জীবনকৃষ্ণের সঙ্গলাভ করেন। দাদার কাছে নানান রকমের গল্প শুনেছি। গল্প শুনতে শুনতে অবাক হয়ে গেছি। শোনার তৃষ্ণা আরো বেড়ে গেছে। বার বার দাদার কাছে শুনতে চেয়েছি। যতই শুনেছি, ততই ভালো লেগেছে। তখন থেকেই মনে প্রশ্ন জাগে, কি করলে তাকে দেখা যায়?

প্রথম যেদিন দাদার কাছে শুনি, ঠিক রামকৃষ্ণ দেবের মত একজন আছেন, কদমতলায় থাকেন, দাদা বহুবার তার কাছে গেছেন, শুনেই আমার মনটা আনন্দে নেচে ওঠে। তবে বোধহয় এবারে আমার দেখা হবে। সঙ্গে সঙ্গে বলি দাদা, আমায় তাঁর কাছে নিয়ে যাবেন? আমি তাঁকে দেখবো। দাদা বললেন না, সামনা সামনি মেয়েদের দেখা তাঁর বারণ। মেয়েরা ঘরে বসে তাকে দেখবে। মনটা দমে গেল। প্রশ্ন করলুম তবে কি করলে তাঁর দেখা পাবো। দাদা বললেন ''কথামৃত'' পড়ো ও ''ধর্ম ও অনুভূতি'' পড়ো, তাহলেই তাঁকে দেখতে পাবে। প্রশ্ন করলুম, কি করে বুঝবো, যে তিনি? তাঁকে তো আগে দেখিনি, তার কথা শুনিনি। দাদা বললেন, তিনি বুঝিয়ে দেবেন। 'ধর্ম ও অনুভূতি' পড়লুম। কিছুই বুঝতে পারলুম না।

অথচ আপ্রাণ চেষ্টা কি করে তাঁকে দেখবো? কেন আমাদের জন্য বাধা সৃষ্টি করলেন? আমাদের কি তাঁকে দেখার অধিকার নেই? দাদাকে বললুম, 'ধর্ম ও অনুভূতি' কিছু বুঝতে পারছি না। ''কথামৃত'' প্রথম ভাগ সবে কিছুটা পড়েছি। একদিন রাতে স্বপ্ন দেখলুম— দক্ষিণেশ্বরে নহবত খানায় গেছি। নীচে কাকে যেন জিজ্ঞাসা করলুম, ঠাকুর কোথায়? সে বললে, উপরে। উপরে উঠে গেলুম, গিয়ে সামনেই দেখলুম রামকৃষ্ণদেবের একটা বাঁধানো ছবি। টেবিলের উপর রয়েছে। ভক্তিভরে প্রণাম করছি, এমন সময় কে যেন বললো জ্যান্ত থাকতে ছবিকে প্রণাম করছিস কেন? পিছন ফিরেই দেখি, একটি বোম্বাই খাটে শুয়ে আছেন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ, আনন্দে আমার মন প্রাণ ভরে গেল। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলুম। তিনি উঠে বসে আমায় আর্শীবাদ করলেন এবং কথামৃতের কয়েকটা কথা আমায় বললেন। কি কথা আমার মনে নেই। এরপরে কথামৃত পাঁচটা ভাগই আমার পড়া হয়ে যায়। আগের থেকে একটু বুঝি ও ভালো লাগে। ইতিমধ্যে বাড়িতে পাঠ শুরু হলো। সুধাংশুদা

নিয়মিত পাঠ করে যান। এর মধ্যে আমাদের বাড়ীর সকলেই একে একে ঠাকুর জীবনকৃষ্ণকে স্বপ্নে দেখেন। একবার নয় বার বার। আমিও বহুবার তাঁকে স্বপ্নে দেখলাম। তাঁর প্রতি প্রেম তীব্রতর হলো। তবু তৃপ্ত হওয়া গেল না। একবার চাক্ষুষ না দেখলে মন ভরছিলো না। এমন সময় শুনলাম জীবনকৃষ্ণ ঠাকুর অসুস্থ। ওনার ক্যানসার, হাসপাতালে ভর্তি আছেন। শুনে কেঁদে বলেছিলুম, একি! আবার সেই অসুখ। তবে কি পেয়েও হারাবো? না না এ হতে পারে না।

রোজই ঠাকুরের খবর নিতুম। দাদাকে বললুম, উনি এত কাছে আছেন, দেখে আসবো একদিন? দাদা বারণ করলেন। সুধাংশুদাকে ঐ একই কথা জিজ্ঞাসা করলুম। উনি বললেন, দেখে এসো, মিলিয়ে এসো, সবাই তো যাচ্ছে। বললুম, দাদা রাগ করবেন। সুধাংশুদা বললেন, লুকিয়ে ঘুরে এসো। বার বার মনে হতে লাগলো, এ সুযোগ হারালে আর আসবে না। যাই দেখে আসি, মিলিয়ে আসি। আমার তৃষ্ণা মেটাই। আমাকে যেতেই হবে। দাদাকে বলবো না। দারুণ উত্তেজনা অনুভব করলুম, কে যেন আমায় টানছে। অবশেষে এলো সেই দিন। আমার মনে যেন প্রথম সূর্য উদয় হলো সেই দিনটিতে। বহুদিনের আকাঙ্খিত ধন দেখতে পেলুম। দিন তারিখ মনে নেই। সকালে উঠেই ঠিক করলুম আজ যাবো। কি আনন্দ! কখন যাবো, কখন দেখবো? তার সঙ্গে ভয়, দাদার সাথে দেখা হয়ে যাবে না তো?

সব ঠিক। দুপুরে খাওয়ার পর প্রবল বৃষ্টি নামলো। সেই বৃষ্টি আর থামে না। তেড়ে তেড়ে আসে। নিরাশ হয়ে শুয়ে পড়লুম। আর বুঝি দেখা হলো না, হবেও না। আমার বরাতে নেই। সাড়ে তিনটায় হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল। উঠে দেখি আকাশ পরিষ্কার, রোদ ঝলমল করছে। তখনই উঠে পড়লুম। দিদিকে ডেকে তুললুম। দুই বোন তৈরী হয়ে মাকে ডাকলুম। মা বারণ করলেন। শুনলুম না। তখন মরিয়া হয়ে উঠেছি। যাই। বেরিয়ে পড়লুম। সাত নম্বর বাসে করে গিয়ে নিউ আলিপুরে নামলুম। সেখান থেকে 3B করে চেতলায় যাবো সুধাংশুদার বাড়ী। বৌদিকে সঙ্গে নিয়ে যাবো। সময় ভীষণ কম। নেমে দেখলুম 3B নেই। রাস্তায় এত জল জমেছে যে গাড়ী আসছে না। কখন আসবে ঠিক নেই। হাঁটতে আরম্ভ করলুম। জল ভেঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে যখন সুধাংশুদার বাড়ী চেতলায় পৌঁছালুম, তখন সাড়ে ৫টা বেজে গেছে। ৬টায় গেট বন্ধ হয়ে যাবে। তাড়া করছি। অথচ প্রথম গেছি, বৌদি শুধু ছাড়তে রাজি নয়। মিষ্টি মুখ করে

খানিকটা জল খেয়ে, দম নিয়ে আবার ছুটলুম। তখন মন পড়ে আছে জীবনকৃষ্ণের কাছে।

রাসবিহারীতে যখন পৌঁছালুম, ৬টা বাজতে ১০ মিনিট বাকি। হেঁটে গেলে বন্ধ হয়ে যাবে। কোন গাড়ীতে উঠবো, উঠতে পারছি না, দারুণ ভিড়। এমন সময় একটা ট্যাক্সি সামনে পেলুম। উঠে পড়ে বললুম, ক্যানসার হাসপাতাল চলো, জোরে চালাও। সে আবার ভুল করে দ্বিতীয় গেটে ঢুকে পড়লো। সেখান থেকে বেরিয়ে, যখন প্রথম গেটে এসে নামলুম, তখন ছটার ঘন্টা পড়ছে। লিফ্‌টে পা দিয়েছি, দ্বিতীয় ঘন্টা পড়লো। তখন যে মনের মধ্যে কি তোল পাড় করছে, তা বলে বোঝাতে পারবো না। উপরে উঠেও ঘর ভুল করেছি। আবার একজনকে জিজ্ঞাসা করে, যখন ওঁর ঘরের সামনে এলুম, তখন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলুম। ভাগ্য ভালো। দারুণ বৃষ্টিপাতের ফলে, কোনো ভক্ত এসে পৌঁছোতেই পারেনি। দরজার কাছে দাঁড়াতে, ঠাকুর ওয়ার্ডবয়কে জিজ্ঞাসা করলেন, কে এসেছে রে? সে বললে ক'জন ভদ্রমহিলা আপনাকে দেখতে এসেছে।

ঠাকুর বললেন—''পর্দাটা ভালো করে সরিয়ে দে, ওরা আমায় ভালো করে দেখুক''। ওয়ার্ডবয় পর্দাটা সরিয়ে দিলো। দেখলুম, হাস্যমুখ, বসে আছেন। আমরা হাত জোড় করে যতক্ষণ প্রণাম করলুম, উনিও ততক্ষণ আমাদের হাত জোড় করে প্রণাম করলেন। কি অপূর্ব মূর্তি। হ্যাঁ, এনাকেই দেখেছি। সেই দক্ষিণেশ্বরে, আরো কবে কোথায় যেন দেখেছি। কি হাসি মুখ। কি অপূর্ব মূর্তি। বহুচেনা, ইনি তো অচেনা নয়। মনে হচ্ছে আরো দেখি আরো দেখি। আমরা এত কষ্ট করে এসেছি, উনি যেন সবই জানেন, এমনি ভাব। আমার আগ্রহটা পরীক্ষা করলেন। এখান থেকে মন যেতে চাইছে না। কিন্তু সময় হয়ে গেছে। তিনটে ঘন্টা কখন বেজে গেছে, কত লোক চলে গেছে। কিছুই খেয়াল নেই। একজন ডাক্তার ও কয়েকজন ভক্তকে আসতে দেখে হুঁশ হলো। আর নয়, এবার যেতে হবে। পায়ে পায়ে চলে এলুম। সেই দিনই রাতে আবার তাঁকে স্বপ্নে দেখি। স্পষ্ট। সব দ্বিধা মুছে গেলো। আর দ্বিধা নয়। খুঁত খুঁত ভাবও নয়। আর একবার দেখার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। তখন এত কষ্ট পাইনি। তবে এ কষ্ট নয়, আনন্দ। দারুণ আনন্দ। যা বোঝানো যায় না। উপলব্ধির বস্তু মাত্র। জয় ঠাকুর জীবনকৃষ্ণ।

রাধাচরণ মিত্র

Early to bed and early to rise, বেশী রাতে না ঘুমানো আর সকাল সকাল উঠে পড়ার উপকারিতা আমরা সবাই জানি। কিন্তু এই কথাটিরও যে যোগের অর্থ আছে, সেটি আমাদের একেবারেই জানা ছিলো না। তাঁর মুখে এর যোগাঙ্গ শুনেছিলাম।

উনি বললেন, ‘‘একদিন মনে হলো এই ইংরেজি কথাটি’’—

Early to bed and early to rise
Makes a man healthy wealthy and wise.

এর মানে কি? তারপর আপনা থেকে বেশ সুন্দর ব্যাখ্যা পেয়ে গেলাম হঠাৎ।

‘‘Healthy অর্থাৎ একটি সুন্দর দেহ যাতে ভগবান দর্শন ও লাভ করার মত অবস্থা (condition) আছে। সেই দেহে আত্মিক ঐশ্বর্য (wealth) লাভ হয় তখন মানুষটা ব্রহ্মত্ব তথা একত্ব লাভ করে। সে wise হয়।’’

মানিক (৭৮ সংখ্যা)

ভূমিকা

কঠোপনিষদে নচিকেতা উপাখ্যান আছে। নচিকেতা শব্দের অর্থ জিজ্ঞাসু। কাহিনীটিতে বলা হয়েছে নচিকেতা তার বাবার নির্দেশে যমলোকে গিয়েছিল এবং ধর্মরাজের কাছে মৃত্যুরহস্য ও আত্মতত্ত্ব জানার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিল। কারণ তার ধারণা ছিল ধর্মরাজ-ই সত্যজ্ঞানের উৎস। দীর্ঘ সময় নিষ্ঠা ও ব্যাকুলতার সঙ্গে জ্ঞানান্বেষণের ফলে যমের কাছে তিনি জানতে পারেন যে মৃত্যুর পর সব শেষ হয়ে যায় না, দেহ গেলেও আত্মা থেকে যায়। এই আত্মা আবার দেহ ধারণ করে। বহু জন্ম পরে মোক্ষলাভ করে।

গল্পটি শুনে মনে হয় নচিকেতার স্থূলে মৃত্যু হয়েছিল। তিনি মৃত্যুলোকে গিয়ে যমের প্রসন্নতা লাভে মৃত্যুর রহস্য ও আত্মতত্ত্ব অবগত হন। কিন্তু দেহ না থাকলেও জ্ঞানচর্চা করা যায়—এই ভাবনা অপূর্ব অবাস্তব কল্পনা। তাহলে নচিকেতার অন্যরকম মৃত্যু হয়েছিল। আর তা হ'ল আধ্যাত্মিক মৃত্যু। তাই তিনি পুনর্জন্মের আষাঢ়ে গল্প শুনিয়েছেন।

যে সকল চিন্তাভাবনা বা কার্যাবলী থেকে প্রাণশক্তির অভ্যন্তরীণ ক্রিয়াশীলতার কোন রসদ পাওয়া যায় না, সাড়া জাগানো জ্ঞানের কথা পাওয়া যায় না এবং প্রাণশক্তির কোন পরিবর্তন হয় না সেই জগৎই মৃত্যুলোক বা যমলোক-অন্ধকার জগৎ।

ষষ্ঠভূমিতে মন উঠলে ইষ্টমূর্তি দর্শন হয়। ইষ্টকে নিয়ে নানান দর্শন লাভ হলে মনে হয় ঈশ্বরতত্ত্ব তথা সত্য জানা গেল কিন্তু বস্তুত সত্য জানা হয় না। কারণ সেটি মায়ার এলাকা—যমলোক। তাই ভ্রান্তি কাটে না। জ্ঞানের আলোক লাভ হয় না। ইষ্টের প্রকৃত প্রসন্নতা লাভ হলে মন ঊর্ধ্বমুখী হতে চায়। তখন মায়া, যা যমেরই রূপভেদ, দ্বার ছেড়ে দেয় ও মন সপ্তমভূমিতে অর্থাৎ যমলোক ছেড়ে বিষ্ণুলোকে যায়। বিষ্ণু অর্থাৎ আত্মার সাক্ষাৎকার হয়—স্বস্বরূপকে জানা হয়।

জন্ম মৃত্যুর রহস্য ভেদ হয়। তার আত্মিক অস্তিত্ব জগৎব্যাপ্ত শাশ্বত এক অখন্ড আত্মিক সত্তায় লীন হয়। তিনি বোঝেন তিনি একাই আছেন। পরবর্তী জীবন নিয়ে তার ভাবনা আসে না। তিনি মৃত্যু নিয়ে ভাবেন না। তাই জীবনকৃষ্ণ

বলছেন, ‘‘আমি দেহ নিয়ে চিরকাল বেঁচে থাকবো।’’

হ্যাঁ, এই জীবনটাই সব। প্রকৃত জ্ঞান পিপাসু জীবনের দিকে তাকান। এই জীবনে প্রাণচৈতন্যের ঊর্ধ্বমুখী ক্রমবিকাশ মানুষকে কিভাবে নিজের বিচ্ছিন্নতা থেকে মুক্ত করে বিশ্বজীবনের সঙ্গে এক করে একত্বের চেতনারসে আপ্লুত করে সেদিকেই তার দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকে।

শ্রীরামকৃষ্ণ একদিন দর্শন করলেন, যেদিকে দৃষ্টি পড়ছে সব চিন্ময় জ্যোতির্ময়—অর্থাৎ চিন্ময় জগৎ দর্শন করলেন। কিন্তু এটা যে তারই দেহের মধ্যে আত্মা জ্যোতিরূপে প্রকাশ পাচ্ছে, প্রাণশক্তির পরিবর্তন হচ্ছে তা বুঝতে পারলেন না। সমস্ত ঈশ্বরীয় দর্শন-ই যে দেহস্থ প্রাণশক্তির বিবর্তনের (self evolution-এর) ফল তা বুঝতে পারলেন না। কিন্তু শ্রীজীবনকৃষ্ণ যখন স্থূলে কবীরকে দর্শন করলেন, তার সঙ্গে কথা বললেন, পরক্ষণে তিনি ধরে ফেললেন যে এই কবীর তাঁরই দেহ থেকে বেরিয়েছিল—তারই প্রাণশক্তি রূপ ধারণ করে দেখা দিল। সমস্ত দর্শন-ই তার প্রাণ-শক্তির বিকাশ।

শ্রীজীবনকৃষ্ণ বিষ্ণুলোকে গিয়ে আত্মতত্ত্ব অবগত হলেন, বিষ্ণুত্ব লাভ করলেন, জগৎচৈতন্য হয়ে উঠলেন। মৃত্যুহীন সত্তা হয়ে উঠলেন। এযুগে সেই জগৎচৈতন্য ক্রিয়াশীল হয়ে অর্থাৎ সমষ্টিচৈতন্য হয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে, এ যুগের নচিকেতাদের মধ্যে প্রকাশ পেয়ে তাদের প্রাণচৈতন্যের জাগরণ ও ঊর্ধ্বমুখী বিকাশ ঘটাচ্ছেন। তাদের আর সত্যজ্ঞান পাবার জন্য অন্ধকারে হাতড়াতে হচ্ছে না। তারা সত্য জানতে পারছে। বুঝতে পারছে যে এক অখন্ড চৈতন্যসত্তাই আছে, যা শাশ্বত, তারা সত্য জানতে পারছে। বুঝতে পারছে যে এক অখন্ড চৈতন্যসত্তাই আছে, যা শাশ্বত, তারা সেখান থেকেই হয়েছে অর্থাৎ তিনি তাদের আপনসত্তা। তারা অমৃতের পুত্র তথা অমৃত। তাই তাদের জীবনে মৃত্যুর পর কী হয় সে প্রশ্ন আসে না। তারা এই জীবনের অমৃতত্ব আস্বাদন করছে নানান দর্শনে দেহস্থ প্রাণশক্তির বিচিত্র বিকাশে। তারা যমের তথা সংস্কারজ ইষ্টের অস্তিত্বকে সহজেই অতিক্রম করে বিষ্ণুকে পেয়ে একজ্ঞানে অধিষ্ঠিত হচ্ছে।

বর্তমান পত্রিকা মূলতঃ আজকের নচিকেতাদের কিছু অভিজ্ঞতা দিয়ে সাজানো হ’ল।

২৬ কার্তিক ১৪২৯

স্বপন মাধুরী

এক সাথে দোলা

● দেখছি (১০.১০.২২)—একটা বড় সাপ পাঠের সকলকে জড়িয়ে বেঁধে রেখেছে। এত জোরে বেঁধেছে যে দমবন্ধ হবার অবস্থা। আমরা বললাম, বাঁধন একটু আলগা কর। কষ্ট হচ্ছে, আমাদের মুক্তি দাও। তখন সাপটা বলল, তাহলে সাপুড়েকে ডাকো। আমরা মনে মনে সাপুড়েকে স্মরণ করলাম। অমনি সাপের মুখ থেকে একটি মানুষ বেরোল—সাদা ছায়ামূর্তি যেন। সে বাঁশী বাজাতে লাগল। আমরা ঐ বাঁশীর সুরে একসাথে দুলতে লাগলাম। ভীষণ আনন্দ হতে লাগল।

—রেণু মুখার্জী
সখেরবাজার

ব্যাখ্যা—সাদা ছায়ামূর্তি—নিগুর্ণ যার কাছে বোধগম্য সেই সমষ্টিচৈতন্য। বড় সাপ—তাঁর Cosmic body বা মহাকুন্ডলিনী—তাঁর চৈতন্য শক্তি যা আমাদের আত্মিকে নিয়ন্ত্রণ করছে। দমবন্ধ অবস্থা—আত্মিক জগতে প্রবেশ করলেও আমাদের সত্তা তথা নিজস্ব সংস্কারজনিত ভাবনা ও অহং থাকার জন্য, এক কথায় স্থূল মনের প্রভাবে এরূপ অবস্থা। একসাথে দোলা ও আনন্দ পাওয়া—যেই সমষ্টি চৈতন্যের সুরে সুর মিলল অমনি সত্তাহীন অস্তিত্ব নিয়ে মুক্তির স্বাদ পাওয়া গেল। তবে তখনও তার আত্মিক শক্তির নিয়ন্ত্রণ কার্যকরী থাকছে যাতে যোগ বিচ্যুত না হই, একত্বের চেতনা যেন না হারিয়ে ফেলি।

● গত ৮/১০/২২, স্বপ্নে দেখছি—আমার পরিচিত একটা লোক। তাকে সবাই কেচক সাধু বলে ডাকে। সে একটু কাঁচুমাচু হয়ে আমাদের ঘরে ঢুকে পড়তে চাইছে। ঐ লোকটাকে আমার কালপুরুষ মনে হচ্ছে। আমি একটা কাঁচি নিয়ে ওর দাড়িটা কেটে ফেলবো বলে দাড়িতে কাঁচিটা লাগিয়েছি। সঙ্গে সঙ্গে কাঁচি সমেত দাড়িটা আমার হাতে থেকে গেল আর লোকটা অদৃশ্য হয়ে গেল। ....

—অভিজিৎ রায় (ইলামবাজার)

ব্যাখ্যা—কালপুরুষ এখন আর সাধারণ মানুষের আত্মিকজীবনে পরম জ্ঞান লাভে বাধা সৃষ্টি করতে পারছে না। খন্ডচেতনা (দাড়ি-নূর) কেটে শাশ্বত জ্ঞান তথা একজ্ঞান লাভে সমর্থ হচ্ছে।

প্রলয়

● দেখছি (২২/৯/২২)—বাইরে প্রচন্ড ঝড় বৃষ্টি হচ্ছে। আমি ঘরে খাটে মশারীর ভিতর শুয়ে আছি। হঠাৎ মনে হল প্রলয় শুরু হ'ল আর তার সঙ্গে উপর থেকে অনেক সাপ বৃষ্টির মতো পড়তে লাগলো ঘরের ভিতরেও। ভয়ে মশারীর ভিতরেই থাকলাম, বের হলাম না। তারপর ছোটমামা এলে বললাম, দ্যাখো, প্রলয় হলো আর কত সাপ পড়েছে। ছোটমামা বলছে, না, না। আমি তো বাইরে থেকে এলাম। কই কিছু তো দেখলাম না। তখন মশারী থেকে নেমে দেখি প্রচুর ব্যাগ পড়ে রয়েছে ঘরে। একটা লাঠি নিয়ে ব্যাগগুলো সরাতেই সাপ কিলবিল করছে দেখা গেল। বললাম, দেখো তো কত সাপ পড়েছে—প্রলয় হয়েছে। ...স্বপ্ন ভাঙার পরও সত্যি সত্যি সাপ আছে ভেবে মশারী থেকে নামতে ভয় লাগছিল।

—জয়কৃষ্ণ চ্যাটার্জী
জামবুনি, বোলপুর

ব্যাখ্যা—অসংখ্য সাপ—অসংখ্য অনুচৈতন্য। উপর থেকে পড়ছে অর্থাৎ নির্গুণ থেকে প্রকাশ হচ্ছে। প্রলয় হ'ল—বহু মানুষের অনুচৈতন্য লাভে আত্মিক জগতে আমূল পরিবর্তন ঘটছে যা ব্যাগ অর্থাৎ আত্মিক দেহের পরিবর্তন ধরিয়ে দিলে বোধগম্য হয়।

● গত ৩০.১১.২০২২ ভোরে স্বপ্ন দেখছি—আমি বাথরুমে আছি, জয়ও আছে। তারপর দেখছি জয় আমার শরীরে ঢুকে গেল এবং আমি জয়ের সঙ্গে কথা বলছি। তারপর দেখছি আমার স্বামীকে। ও ভাবছে শুক্লা কার সঙ্গে কথা বলছে! ও তো জয়কে দেখতে পাচ্ছে না....ঘুম ভাঙল।

—শুক্লা লাহা
বোলপুর

ব্যাখ্যা—বাথরুম—পাঠচক্র, যেখানে ঈশ্বরীয় চর্চায় দেহ ও মন গ্লানিমুক্ত হয়। বাথরুমে আছি—পাঠে আছি। জয়ের সঙ্গে কথা বলছি—দেহস্থ প্রাণশক্তি রূপ ধারণ করে কথা বলে, তারই অনুশীলন। ভিতরে ঢুকে গেল—সে যে আপনসত্তা তা বুঝিয়ে দিল। স্বামী বুঝতে পারছে না—ঘনিষ্ঠজনরাও এ বিষয়টা বুঝবে না যদি না তার ভিতরের আত্মিক সত্তা জেগে ওঠে।

মৌমাছি ভালবাসি

● ভোর বেলা স্বপ্ন দেখছি (সেপ্টেম্বর, ২০২২)—ঘরের জানলা দিয়ে প্রচুর মৌমাছি ঢুকেছে। তারা দেওয়ালে মৌচাক তৈরি করছে। পাশের ঘরে জানলা দিয়ে সীম গাছ ঢুকেছে। তাতে আবার সীম ধরেছে। যে ঘরে মৌমাছি রয়েছে সেই ঘরে আছি। কোন কারণে একটি মৌমাছির গায়ে আঘাত লেগেছে। অমনি মৌমাছিটি বাচ্চা ছেলের মতো কাঁদতে লাগল। আমি খুব অবাক হলাম। আর একটি মৌমাছি আমার হাতে বসলো। আমি তার গায়ে হাত বোলাতে লাগলাম। আদর করলাম। সে কিন্তু কিছু করছে না। এরপর আমাদের মেজমামা (সুজিত) লাঠি হাতে এলো। যে ঘরে সীম ছিল সেই ঘরে ঢুকে বেরিয়ে এলো। আমি মামাকে বললাম, মামা, মধু চৈতন্যের প্রতীক আর চেতনা মানে একজ্ঞান। এরপর ঘরে ঢুকে দেখি চৌকো ব্যাগের মতো মৌচাক তৈরি হয়ে গেছে।....

—স্বরূপা দত্ত

সখেরবাজার

ব্যাখ্যা—দুটি ঘর—আত্মিক ও ব্যবহারিক জগৎ। যে ঘরে সীম গাছ-বাহ্য চেতনার জগৎ—স্থূল জগৎ। অন্যটি আত্মিক জগৎ। মৌমাছি—অনুচৈতন্যলাভকারী মানুষ। তাকে আঘাত করলে, নিন্দা করলে ভিতরের শিশু ভগবান কষ্ট পায়, কাঁদে—তাই তাদের ভালোবাসতে হবে। অন্যথায় মৌচাক বসবে না—একত্বের চেতনার মূর্তরূপ তথা একত্বের কৃষ্টি পরিস্ফুট হবে না। মামা—ঈশ্বর। ব্যবহারিক জগতে ঈশ্বরের কৃপার পরিচয় কখনও কখনও অনুভূত হয় বটে তবে আত্মিকে তাঁর কৃপায় বহুত্বে একত্বের চেতনা স্পষ্ট রূপ পায়।

● দেখছি (১.১০.২২)—আমরা কয়েকজন বান্ধবী একজায়গায় আছি। একটা ইয়ং (Young) ছেলে এসে আমাদেরকে অনেক নিয়ম মানতে বলছে। এই নিয়ম মানাটাই নাকি ধর্ম। আমি বললাম, এটা কোন ধর্মই না। সূক্ষ্ম মনের ঊর্ধ্বগতিই ধর্ম।....

—সোমা পাল বসাক

আমতলা

দাঁত আসছে

● গত ৭ই জ্যৈষ্ঠ সকাল দশটার পাঠে জয়কৃষ্ণ যখন অভিজিতের প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছিল যেখানে ও বোঝাতে চাইছিল ধর্মের পরিভাষা সাধারণ মানুষের কাছে ও অন্য ভাষাভাষী মানুষদের কাছে কোন বাধা নয়। তখন আমি দেখলাম—নীল আকাশ থেকে অনেক পাটি দাঁত জোড়ায় জোড়ায় নেমে এসে সবুজ ঘাসের মধ্যে পড়ছে। তার মধ্যে এক জোড়া দাঁতের পাটি বিশাল বড়। ওটা মাটির কাছাকাছি চলে এসেছে আর বাকিগুলো ছোট ছোট দাঁতের পাটি, উপর থেকে পড়ছে। অদ্ভুত দৃশ্য। ...

—সঞ্চিতা চ্যাটার্জী
বোলপুর

ব্যাখ্যা –এ যুগে সাধারণ মানুষ ধর্মের পরিভাষা (term) গুলো বুঝতে সক্ষম হবে—দাঁত ফোটাতে পারবে। একজন প্রথমে দাঁত ফোটাবে (বড় দাঁতের পাটি), তাকে অনুসরণ করে পরে বহু মানুষও পারবে (ছোট ছোট দাঁতের পাটি)।

● দেখছি (১৮.০৭.২২)—কে একজন আমাকে একটা রেল স্টেশনে পৌঁছে দিল। আমি ছুটে গেলাম প্লাটফর্মের দিকে। গিয়ে দেখি দুটি ট্রেন দাঁড়িয়ে আছে। পাশাপাশি দুটি প্লাটফর্মে বিপরীত দিকে মুখ করে। দেখি পায়ে জুতো নেই। ব্যাগ থেকে কেট্‌স্‌ বের করে দ্রুত পরতে যাচ্ছি—দেখি উল্টোদিকের প্ল্যাটফর্মে দেবাশিষ। ও আমাকে নিতে এসেছে। বললাম, কোন ট্রেনে উঠব? ও বলল, আপনি কোথায় যাবেন? বললাম, কেন, জয়কৃষ্ণের কাছে। ও বলল, সে তো আপনার দেহে। আপনার পিঠ ফুঁড়ে জেগে উঠবে। অমনি পিঠে যন্ত্রণা অনুভব করলাম। মনে হচ্ছে মেরুদণ্ড ফাটিয়ে জয় ওখান থেকে বেরোবে। পিছন ফিরে সদ্যজায়মান জয়ের মাথা দেখতে পাচ্ছি যা চামড়া ভেদ করে বেরোচ্ছে। ভাবছি, মেরুদন্ড ভেঙে যাচ্ছে, কী হবে আমার! খুব যন্ত্রণা হচ্ছে, মেরুদন্ড ভেঙে সেখান থেকে জয় বেরোচ্ছে....। স্বপ্ন ভাঙল।

—স্নেহময় গাঙ্গুলী
জামবুনি, বোলপুর

ব্যাখ্যা—মেরুদন্ড—Backbone যা সোজা হয়ে দাঁড়াতে সাহায্য করে। অধ্যাত্মজগতে back bone স্বরূপ (দেশের যেমন আমলা তন্ত্র) সকলের দেহের ভিতর জেগে উঠছে সমষ্টিচৈতন্য যা জীবন চলার নীতি ঠিক করে দেবে। দুটি বিপরীতমুখী ট্রেন—প্রচলিত ধর্মে সমস্ত শাখাই পরস্পর বিরোধী কথা বলে। দেবাশিষ—জগৎচৈতন্য। কেট্‌স্‌—সমষ্টির অনুশীলনের উপাদান।

অঙ্গবিহীন

● দেখছি (২২/০৬/২২)—আমার এ্যানাটমি করছেন স্নেহময়দা। আমার দেহ মহাশূন্যে ভাসছে। আমার পুরো চামড়া গলা থেকে পা পর্যন্ত খুলে ফেলেছেন। দেখা যাচ্ছে পুরোটাই ক্ষুদ্রান্ত্র ও বৃহদান্ত্র দিয়ে ভরা অর্থাৎ হার্ট, লিভার, ফুসফুস, কিডনী ইত্যাদি দেখা যাচ্ছে না। একটা ফরসেপ্ দিয়ে সেগুলো সরিয়ে সরিয়ে কী যেন খুঁজছেন। আমার পাশ দিয়ে সাদা সাদা তুলোর মতো মেঘ উড়ে যাচ্ছে। আমি ভেসে থাকলেও মনে হচ্ছে শক্ত কোথাও শুয়ে আছি। সামনে থেকে হলুদ স্নিগ্ধ আলো আমাদের উপর এসে পড়ছে। আমার খুব অবাক লাগছে কোন অঙ্গ (অন্ত্র ছাড়া) দেখতে না পেয়ে। কিছুক্ষণ পর কোথায় হারিয়ে গেলাম। তখন দেখি পেটের নাভির কাছটায় গোল করে একটা Space তৈরি হল। ঠিক যেন black hole (কৃষ্ণগহ্বর) মনে হল।....

—পারমিতা চৌধুরী
পাটনা-বিহার

ব্যাখ্যা—স্নেহময়দা—সমষ্টিচৈতন্যের প্রতীক। ক্ষুদ্রান্ত্র ও বৃহদান্ত্রের কাজ হল খাবার হজম করা ও শরীরে জলের ভারসাম্য বজায় রাখা ইত্যাদি। এখানে অন্ত্র মানে—আমাদের ব্রেণ, যার দ্বারা আমরা ঈশ্বরীয় তত্ত্ব আস্বাদন করি এবং প্রাণশক্তির বিকাশের ভারসাম্য (balance) বজায় থাকে। সমষ্টিচৈতন্য তা দেখছেন মানে—ব্রেন পাওয়ার বাড়িয়ে যোগের উপযোগী করে তুলছেন। আর তখনই শক্ত ভিত্তির উপর থাকা যায়। কোন organ নেই মানে নিজস্ব সত্তা নেই তখন স্থূল আমি নেই। অস্তিত্ব মাত্র হয়ে সত্তার (অনুচৈতন্যের) উৎস নির্গুণের ঘনমূর্তির দিকে দৃষ্টি আবদ্ধ থাকে (নাভির কাছে ব্ল্যাক হোলের মতো গোল স্পেস)।

● দেখছি (অক্টোবর, ২০২২)—পাশের বাড়ির অসীম এসে বলছে, আমি অসীমের সাথে কথা বলবো। তোমার ফোনে লাগিয়ে দাও তো। আমি তখন আমার ফোনে ১নং টা টিপে দিলাম। দেখছি ফোনটা লাল হয়ে উঠলো, ওপাশ থেকে অসীমের সাড়া পাওয়া গেল। ফোনটা কাছের অসীমকে দিলাম। ও কথা বলতে লাগলো। ....

—সবিতা ঘোষ (চারুপল্লী)

ব্যাখ্যা ঃ অসীম (অনুচৈতন্য) হয়ে অসীমের (সমষ্টিচৈতন্যের) সঙ্গে কথা বলা যায়।

আলো

● গত ১.১১.২০২২ শনিবার পাঠ শুনতে শুনতে দেখছি—বাড়ি ফিরছি, পথে ষষ্ঠীতলা, খুব গাঢ় অন্ধকার। হেঁটে চলেছি। হঠাৎ দেখি অন্ধকারের মধ্যে অসম্ভব জ্যোতি, চোখ ঝলসানো আলো। ঐ আলোতে দেখছি তাল গাছের মতো একটা গাছের মাঝখানে বসার মতো করে আড়ে আড়ে একটা বাঁশ লাগানো। তাতে একটা মানুষ বসে। গাছের দিকে মুখ করে বসে। পরনে ধুতি, খালি গা, গলায় পৈতে ঝুলছে। আমার দিকে মুখ ঘুরিয়ে তাকালো। তীক্ষ্ণ তার দৃষ্টি। তার দৃষ্টি ও তার থেকে আসা তীব্র আলো দেখে ভয় পেয়ে গেলাম। স্বপ্ন ভাঙার পর বুঝলাম উনি জীবনকৃষ্ণ স্বয়ং।....

—সুমিত্রা দাস

আন্দুল, হাওড়া

ব্যাখ্যা—এককে ধরে অনন্যমন হয়ে কিভাবে উপরে (চেতনার উচ্চস্তরে) উঠতে হয় তা আমরা শিখব জীবনকৃষ্ণকে অন্তরে অবলম্বন হিসাবে পেয়ে—যিনি ব্রহ্ম হয়েছেন— যিনি তার চেতনার আলো তথা দৃষ্টিভঙ্গী দান করে আমাদের ব্রহ্মবিদ্ করে তোলেন।

● দুপুরে স্বপ্ন দেখছি (23.08.2022)—স্নেহময়দা এসেছেন আমার বাড়িতে। ওনার সঙ্গে গল্প করছি—বেশ আনন্দ হচ্ছে। ওনাকে বললাম, আমি একটা স্বপ্ন দেখেছি। স্বপ্নটা বলছি আর চোখের সামনে তা দেখতেও পাচ্ছি। স্নেহময়দা কোন একটা অনুষ্ঠানের কাজে ব্যস্ত। আমি এক জায়গায় পা ঝুলিয়ে বসে আছি। পাশে দেখি জয়কৃষ্ণও বসে আছে। হঠাৎ ওর অবয়বটা পুরো লাল হয়ে গেল। তখন আর ওর জামা প্যান্ট কিছু দেখা যাচ্ছে না। শ্যাডো মূর্তি যেমন কালো হয় ঠিক তেমনি লাল রঙের ছায়ামূর্তি যেন। তখন স্নেহময়দা বললেন, এটাই তোমার ভবিষ্যৎ। তাঁর প্রতি (জয় কৃষ্ণের প্রতি) অনুরাগ নিয়েই তোমার জীবনটা কাটবে। .....

—মিন্টু পাল (বাপী)

দাসনগর, হাওড়া

ব্যাখ্যা—সমষ্টিচৈতন্যের প্রতি দ্রষ্টার প্রেম স্থায়ীত্ব লাভ করবে।।

মায়াদড়ি

● ২৬শে অক্টোবর ভোরে স্বপ্ন দেখছি—আমি যেন জয়দের বাড়ি গেছি। বাড়ি ফেরার সময় দিদিকে প্রণাম করলাম। স্নেহময়দাকে প্রণাম করলাম। জয় বিছানায় আধশোয়া হয়ে আছে, বিষ্ণু যেমন শুয়ে থাকে। আমি ওর পায়ের কাছে দাঁড়িয়ে আছি—বললাম, আমি তোমাকে প্রণাম করবো? মনে মনে ভাবছি ও তো আমার থেকে অনেক ছোট। তক্ষুনি ও স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গীতে বলতে শুরু করলো....তাহলে রামের গল্প বলি শোন।.... অনেক কিছু বলতে লাগলো। আমি সবটা শুনে যেন স্বপ্নের মধ্যেই জিস্ট করলাম....রাম হলো বিষ্ণুর অবতার, রাম সবাইকে এক করতে মর্ত্যে এসেছিল। সেই বিষ্ণু, পরমব্রহ্ম, তার জন্ম নেই, মৃত্যু নেই, তিনি অজ। তিনি আদি তিনি অনন্ত। তখন আমার ভিতরে অনুভূতি হলো জয়ই তো সেই রাম। জয়-ই তো বিষ্ণু। তাই তার মতো পোজে শুয়ে আছে। ...তখন আমি ওর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলাম।

এবার মনে পড়ে গেল পাঠ আছে। তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরতে হবে। 'আসছি' বলে চলে এলাম। ট্রেনে চাপলাম, চার মিনিট পরেই বাড়ি চলে এলাম। বাড়ি এসে ভাবছি 4 মিনিটে বোলপুর থেকে বাউড়িয়া চলে এলাম! তাহলে কি টাইম মেশিনে ট্রাভেল করলাম? ঘুম ভাঙল।

—মৌসুমী সিংহ জানা
বাউড়িয়া, হাওড়া

ব্যাখ্যা—জয় তথা সমষ্টিচৈতন্যকে আপনসত্তা বোধ হ'ল, মুহূর্তে মন ভিতরে চলে এল। একত্ব উপলব্ধির জন্য পাঠ অর্থাৎ মনন দরকার—তাই বলছে পাঠ আছে।

● "মায়ের জয় গাও"—গানটা শুনতে শুনতে এর যোগে কী ব্যাখ্যা হবে ভাবছি। তন্দ্রায় দেখছি—একটা দড়ির মতো নরম জিনিস দিয়ে ঘেরার মাঝখানে মোড়ার উপর জয় বসে আর বাইরে আমি। জয় বলছে, মা মানে কী বলদেখি? দেখি তুই কতটা গভীরে যেতে পারিস—এই বলে দড়িটা ভিতরের দিকে টেনে নিল আর আমি আরও কিছুটা জয়ের কাছে চলে গেলাম।...

ব্যাখ্যা—মায়াদড়ি সরিয়ে নিলে তিনি যে মা (মহাকালী বা সমষ্টিচৈতন্য) আর আমি তারই অনুসত্তা তা উপলব্ধি হয়, কাছে যাই।

—শুভাশিস দাস
বোলপুর

সত্য চলা

● জয়ের পাঠ শুনে আমার মনে হয়েছিল, এত কথা ও বলে কী করে? ও কি অনেক বই পড়েছে? সেই রাত্রে স্বপ্নে দেখছি (১৪-০৫-২০২২)—জয়ের মুখের ভিতর থেকে প্রচুর বই বেরিয়ে ওকে ঢেকে ফেলেছে। অনেক বই, গুণে শেষ করা যাবে না, তার মাঝখানে জয়। ওর শরীর বই-এ ঢেকে গেলেও চোখ নাক মুখ দেখা যাচ্ছে। আমি অবাক হয়ে চেয়ে দেখছি।.....ঘুম ভাঙল।

—রেণু মুখার্জী
সখের বাজার

ব্যাখ্যা—''আর বাবা বইটই সব ওর মুখে''—বৃন্দে ঝি। বই জ্ঞানের প্রতীক। মুখে— ভিতরে।

● ৭ই জ্যৈষ্ঠ (১৪২৯) দুপুরে জয়ের পাঠ শুনছি। হঠাৎ দর্শন হ'ল—একজন অচেনা মানুষ এসে বলল, তুমি একটি কালো পা দেখতে পাবে। অমনি একটি কালো পা দেখতে পেলাম। আমি হতভম্ব হয়ে দেখছি। ভাবছি, কথাটা কে বলল? আবার সেই লোকটি অন্তরাল থেকে বলল, পা মানে সমষ্টি অর্থাৎ জয়। এটা বুঝতে পারছো তো? ওকে বুঝতে হবে। আমি আবারও ভাবছি কথাটা কে বলছে! তখন জয়ের হাসি শুনতে পেলাম। আমারও খুব আনন্দ হল! অমনি আমি বললাম। এদিনটা আমি কখনো ভুলব না। সঙ্গে সঙ্গে জয় হাসতে লাগলো।....

—তাপসী মন্ডল
বেহালা, ট্রাম ডিপো

ব্যাখ্যা —পা—গতি—সাধন। এখানে সমষ্টির সাধন। কালো পা—নির্গুণের ঘনমূর্তি তথা সমষ্টি চৈতন্যকে পেয়ে সাধারণ মানুষের চৈতন্য গতিলাভ করে ও অখন্ডচৈতন্যকে বোঝা চলতে থাকে।

● স্বপ্ন দেখছি (২৭.০৬.২২)—জয় আর আমি আছি। জয় বেশ জোরের সঙ্গে দু'বার বলল, 'সাধারণ মানুষেরও হবে।''....খুব আনন্দ হ'ল।।

—অমরেশ চ্যাটার্জী
ইলামবাজার

জিজ্ঞাসা

● গত ৭/৮/২০২২-এ ট্রান্সে দেখছি—একটি ব্ল্যাক ক্যানভাস কিম্বা কার্টেন (পর্দা)। সেটির মাঝ বরাবর একটি ছোট্ট গরুর গাড়ী ধীর গতিতে এগিয়ে চলেছে। একটু ফোকাস (Focus) করলাম। গাড়োয়ানের জায়গায় দেখি একটা উল্টো জিজ্ঞাসা চিহ্ন। আরও Focus করলাম দেখি নিচের থেকে একটা দাঁড়ি চিহ্ন উঠে জিজ্ঞাসা চিহ্নটাকে মুছে দিল। আরও Focus করতেই দেখি সেখানে একজন বৃদ্ধ যার চিবুকে স্বল্প সাদা দাড়ি। হাতদুটো পিছনে ধরে গম্ভীর ভাবে পায়চারী করছে। যেন গভীর চিন্তায় মগ্ন। ওনাকে রহস্যময় মানুষ মনে হচ্ছে। চারদিকে একবার করে তাকাচ্ছেন। পরে মনে হ'ল দেহ যাবার সময়কার জীবনকৃষ্ণের মুখের সাথে হুবহু মিল ঐ বৃদ্ধের মুখের। ....

—অর্ণব পাল

জিনাইপুর, বীরভূম

ব্যাখ্যা— গরুর গাড়ী চলছে—প্রাণশক্তির সঞ্চালন হচ্ছে। উল্টো জিজ্ঞাসা চিহ্ন— আত্মজিজ্ঞাসা, ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা। জিজ্ঞাসা চিহ্ন মুছে গেল—চিরন্তন জিজ্ঞাসার একটি সমাধান হ'ল শ্রীজীবনকৃষ্ণকে অন্তরে পেয়ে (দাঁড়ি), কেননা তাঁর জীবনে চিরন্তন প্রশ্নের সমাধা হয়েছে। শ্রীজীবনকৃষ্ণ চিন্তামগ্ন—তাঁকে অন্তরে দর্শন করে সাধারণের মনে আবার নতুন ধরনের জিজ্ঞাসা (তা-ও চিরন্তন) জাগছে (এনার সঙ্গে আমার সম্পর্ক কী? জগতের মানুষের সঙ্গে আমার সম্পর্ক কী?)। তাঁর সঙ্গে পূর্ণ একত্ব লাভে আগামীতে তার সমাধান হবে (অবশ্য ব্যক্তি জীবনে)।

● ৪.১০.২২ এ পাঠ শুনতে শুনতে দেখছি—একটা হল ঘরে অনেক লোক রয়েছে। আমি একটু এগিয়ে গিয়ে সেলফি তোলার মতো করে একটা আয়না ধরে বাকী দের দেখছি। আয়নাটা সরাতে সরাতে যখন নিজের দেহটা দেখতে পাওয়ার কথা তখন নিজেকে দেখতে পাচ্ছি না অথচ বুঝতে পারছি আমার অস্তিত্ব রয়েছে। খুব অস্বস্তি ও ভয় হচ্ছিল।

—রোহিনী সিন্‌হা

দক্ষিণেশ্বর

ব্যাখ্যা—সমষ্টিচৈতন্যই আমার সত্তা—আমি অস্তিত্বমাত্র, এই সত্য অনুভূত হচ্ছে।

দু'টি রুটি

● গত জুলাইয়ের মাঝামাঝি এক রাত্রে স্বপ্ন দেখছি—বড় একটা থালায় আমি ডাল ভাত খেতে বসেছি। তখন শুধু একটা হাত দেখা গেল। আমার থালায় ডাল ভাতের উপর দুটো আটার রুটি দিল। খুবই সুন্দর গোল গোল আটার রুটি, প্রমাণ সাইজের। আমি বললাম, আমি তো ডাল ভাত খাচ্ছি, রুটি কেন? যিনি দিচ্ছিলেন তিনি বললেন, তবে কি তুলে নেব? আমি বললাম, হ্যাঁ। তখন সেই হাত রুটি ওঠাতে লাগল থালা থেকে। আমি পরপর গুণে যাচ্ছি ক'টা রুটি তোলা হ'ল—এক, দুই, তিন...চোদ্দ, অবধি। তারপরেও থালায় দুটি রুটি থেকে গেল। আমি খুব অবাক হলাম। ....স্বপ্ন ভাঙল।

—স্বপন ভট্টাচার্য
বাগুইআটি

ব্যাখ্যা— একটা হাত—নির্গুণের ক্রিয়া। দুটি রুটি—দ্বৈতবাদ। ডাল ভাত খাওয়া—ব্রহ্মবিদ্যা লাভ। ১৪ সংখ্যা মুক্তির কথা বোঝায়। ব্রহ্মবিদ্যার অনুশীলন দ্বৈতবাদ দিয়ে শুরু। মুক্তির পরেও, একত্ব লাভের পরেও খুব সূক্ষ্মভাবে দ্বৈতবাদ থেকে যায়। তাই প্রেমরস আস্বাদন হয়, তবে জৈবী সত্তা থাকে না।

● গত ৮/৯/২০২২ এ হঠাৎ রাতের বেলায় ঘুম ভেঙে যেতে আধখোলা চোখে দেখছি—আমার সামনে কালো এক ছায়ামূর্তি দাঁড়িয়ে আছে ও সেই কালো অবয়ব যেন আমায় পরিষ্কার বলল, 1 + infinity (α) = 1/+ infinity (α), সঙ্গে সঙ্গে ভালো করে তাকালাম কিন্তু কাউকে দেখতে পেলাম না।

—সৌম্যতনু জানা
বাউড়িয়া, হাওড়া

ব্যাখ্যা— 1 + infinity (α) মানে সমষ্টিচৈতন্য, যার মধ্যে নির্গুণ ধরা পড়েছে। 1/+ infinity (α) মানে সমষ্টিচৈতন্যের এককণা, অনুচৈতন্য। এই দুই-ই এক—equal-কারণ অনুচৈতন্য সমষ্টিচৈতন্যেরই গুণ (quality) প্রকাশ করে, সে পরিমানে যত সামান্যই হোক।

মধুবিন্দু

● গত ৭ই জ্যৈষ্ঠ বিকালের পাঠে যখন পড়া হলো—''দুইজন ভদ্রমহিলা জীবনকৃষ্ণকে দেখতে গেছেন হাসপাতালে। ওয়ার্ড বয় তাঁকে জানালেন, দু'জন ভদ্রমহিলা আপনাকে দেখতে এসেছে। উনি বললেন, পর্দাটা ভালো করে সরিয়ে দে, ওরা আমায় ভালো করে দেখুক। ওনারা দেখলেন ও নমস্কার জানালেন। জীবনকৃষ্ণও বিছানায় বসে হাতজোড় করে প্রতি নমস্কার জানালেন। আর বলতে লাগলেন, মায়েরা আমায় আশীর্বাদ করুন। যেন ঠাকুর ঠাকুর করে যেতে পারি।" এ বিষয়ে মন্তব্য করা হ'ল যে জীবনকৃষ্ণ আসলে মায়ার পর্দা তুলে দিলেন যাতে মায়েরা তথা জগৎ তাকে চিনতে পারে। অমনি দর্শন হ'ল—শ্রীজীবনকৃষ্ণ খালি গায়ে বসে আছেন খাটে। দু'হাত তুলে আমায় ডাকছেন। আর সেই সময় আমার পেটের নিচ থেকে একটা শিহরণ শুরু হয়ে ক্রমশ উপর দিকে উঠে আমার মাথায় আঘাত করলো। তীব্র আনন্দ হতে লাগলো আর তাঁর অপার কৃপার কথা স্মরণ করে কান্না এলো ভিতর থেকে।

—কেতকী পাঠক
সখেরবাজার

ব্যাখ্যা —তিনি যে মায়ার পর্দা তুলে দিয়েছেন সাধারণের জন্য তা এখন সাধারণ মানুষ দেহ দিয়ে বুঝতে পারছেন। তাদেরও প্রাণচৈতন্য অন্তর্মুখী ও ঊর্ধ্বমুখী হচ্ছে যার পরিণতিতে ব্রেণ পাওয়ার বাড়ে ও স্বস্বরূপকে জানা যায়। ঠাকুর ঠাকুর করা—একজ্ঞানের চর্চা।

● ৭ই জ্যৈষ্ঠ জয়ের আলোচনা শুনতে শুনতে হঠাৎ দর্শন হলো—একটু দূরে একটা শহর। আকাশে পাখির মতো দুটি বিরাট ডানা মেলে উড়ে চলেছে এক বিন্দু মধু। অপূর্ব সে দৃশ্য।....

অভিজিৎ রায়
ইলামবাজার

ব্যাখ্যা —সমষ্টি চৈতন্যের সাথে একত্ব লাভ করে তাকে আপনসত্তা (আত্মাপাখি) জেনে সাধারণ মানুষ অনুচৈতন্য (এক বিন্দু মধু) লাভ করে ও তা ঊর্ধ্বমুখী গতি লাভ করে, চেতনার মানোন্নয়ন ঘটে।

লোকশিক্ষক

● গত রাত্রে (৯.১১.২০২২) স্বপ্নে দেখছি—এক জায়গা থেকে গাড়ী করে আসছি। গাড়ীটা আমাকে একটা ব্রীজের উপর নামিয়ে দিল। ভিতরে বসা ভদ্রলোক বললেন, যেতে পারবেন তো? বললাম, হ্যাঁ হ্যাঁ। কিন্তু নামার পর দেখছি খুব রোদ, হাঁটতে পারছি না। সঙ্গে ছাতাও আনিনি। এদিক ওদিক তাকাচ্ছি, কোন গাড়ী পাই কিনা দেখছি। একটা গাড়ী কাছেই দাঁড়িয়ে রয়েছে। তাতে বসে আছে আমার বাড়ীর নিচের তলার ভাড়াটে মেয়েটি। ওরই গাড়ী। ও আমাকে দেখেও গাড়ী নিয়ে চলে গেল। আমার দুঃখ হল, রাগও হ'ল। হঠাৎ দেখি পাশে জয়। ওকে বললাম, দ্যাখো একই জায়গায় থাকি, আমাকে দেখেও ডাকল না! আমি বাড়ি গিয়ে ওর দাদাকে বলব, এটা কি ওর উচিৎ হ'ল? জয় বলল, না, আপনি ওকে কিছু বলবেন না। বললাম, কিচ্ছু বলব না? ও বলল, না, কিছু বলবেন না। আপনার হাঁটতে কষ্ট হচ্ছে? আসুন—বলে আমার হাত ধরে বলল, চলুন। কী আশ্চর্য কত সহজে ওর সাথে হেঁটে বাড়ি পৌঁছে গেলাম। বাড়িতে ঢুকছি আর ভাবছি মেয়েটাকে আচ্ছা করে কথা শোনাবো। জয় যেন আমার কথা বুঝতে পেরে আমার হাত টেনে ধরে বলল, কিছু বলবেন না। তখন দেখি ঐ মেয়েটিও বাড়িতে ঢুকছে। আমার দিকে তাকিয়ে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে পড়ল। ওর দাদা ওকে বলল, কী হ'ল? কাকীমা আর তুই একই জায়গা থেকে আসছিস মনে হল। তাহলে উনি একা একা হেঁটে এলেন কেন? বুঝলাম ও জয়কে দেখতে পায়নি। মেয়েটি তখন মাথা নিচু করেই কোন কথা না বলে ভিতরে ঢুকে গেল। জয় বলল, দেখলেন তো ও guilty feel করছে। আমি খুব অবাক হলাম। জয়ের দিকে তাকিয়ে দেখি ও মৃদু মৃদু হাসছে।

—আলোরেখা ভট্টাচার্য
সখেরবাজার

ব্যাখ্যা ঃ প্রকৃত লোকশিক্ষক সমষ্টি চৈতন্য। তিনি ভিতর থেকে চেতনা জাগ্রত করে দেন।

ভাই ও বোন—জ্ঞান ও ভক্তি দ্রষ্টার ভিতরের দুই গুন। মেয়েটি সাহায্য করল না—ভক্তি সাহায্য করতে পারে না।

guilty feel করা —সমষ্টি চৈতন্যের ক্রিয়ায় ভক্তসত্তার মধ্যে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হওয়া। এবার জ্ঞান প্রকট হবে।

ভাড়াটে—যার সূক্ষ্মমন স্থায়ী হয়নি।

নবীনা

কব্জি কাটা

● দেখছি (৪.১০.২২)—আমার ডান হাতের কব্জি কে যেন কেটে দিয়েছে। মনে হচ্ছে বাঁ হাতের কব্জি কাটার কথা ছিল। আবার মনে হচ্ছে আমার কব্জি আমিই কেটেছি। কিন্তু যন্ত্রণা হচ্ছে না; রক্ত পড়ছে। আমাদের স্কুলের TIC (Teacher-in-charge) রশ্মিদি বলছেন, এই কাটা কব্জি হাতে লাগিয়ে রেখে দিন, আপনা থেকে জোড়া লেগে যাবে। টাটকা কাটা তো! ঐ হাতে বেশি কাজ করতে না পারলেও অন্তত দু'একটা আঙুল নাড়াতে পারবেন। আর হাতটা দেখতেও ভালো লাগবে।।

—জয়কৃষ্ণ চ্যাটার্জী
জামবুনি, বোলপুর

ব্যাখ্যা—ডান হাতের কব্জি কাটা—ব্যবহারিক জগতে জৈবী ভাবটা minimal (যেটুকু না থাকলে নয় সেটুকু থাকা) হয়ে যাবে। কখনো মনে হচ্ছে আমি কেটেছি কখনো মনে হচ্ছে অন্য কেউ কেটে দিয়েছে—আমারই ভিতরের অজানা শক্তি নির্গুণের শক্তির দ্বারা আপনা হতে হয়েছে ব্যাপারটা। কিন্তু খুঁত খুঁত ভাব ছিল, পরে তা থাকবে না। বাঁ হাত কাটার কথা ছিল কিন্তু কাটা যায়নি—"সত্তা নিয়ে মোক্ষলাভ হয় না"—শাস্ত্রের এই concept যে ভুল তা দেখাচ্ছে।

● স্বপ্ন দেখছি (14.09.22)—দেশের বাড়ি গেছি। জেঠুর ঘরে ঢুকে গিয়েছি। চশমা পরে আছি। কিন্তু খুব অন্ধকার। কিছু দেখতে পাচ্ছি না। ভিতরে আমার বাবা মুড়ি খাচ্ছেন। বাবার মুখটা অবিকল জয়ের মুখ। আমাকে বলল, দাঁড়া একটু সবুর কর। দেখ্ সব দেখতে পাবি। একটু সময় দে। বলার সঙ্গে সঙ্গে দেখি টিউব লাইটের মতো আলো হয়ে গেল ঘরটা। ঘরের সব কিছু দেখতে পাচ্ছি। তখন মনে পড়ল জয় একবার বলেছিল—অন্ধকারেরও একটা আলো আছে। মন ভালো হয়ে গেল। খুব আনন্দ হতে লাগলো।.....

—সঞ্চিতা চ্যাটার্জী (বোলপুর)

ব্যাখ্যা—দেশের বাড়ি—সহস্রার। বাবা—নির্গুণ ব্রহ্ম—সমষ্টিচৈতন্য। অন্ধকার ঘর—নির্গুণের ঘর যা unexplored–তা এবার explored হবে—আত্মিকে কিছু রহস্য থাকবে না।

যে ধর্মজগৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন বলে বোধ হচ্ছিল তা আলোয় ভরে যাবে, নতুন দৃষ্টিভঙ্গী (চশমা) যা লাভ হয়েছে তা দিয়ে অনুশীলনে সময় দিলে।

পূর্ণপ্রাপ্তি

এক বুধবার কথামৃত থেকে পাঠ হচ্ছিল। ঠাকুর রামকৃষ্ণ মাস্টার মশাইকে বলছেন, ‘‘আচ্ছা তখন পূর্ণকে আকর্ষণ করলাম, তা হলো না কেন? এইতে বিশ্বাস একটু কমে যাচ্ছে।’’ মাস্টার মশাই এর উত্তরে বললেন, ওসব তো সিদ্ধাই, এবং ঠাকুরও সেকথায় সায় দিলেন। পাঠে এই নিয়ে অনেক আলোচনা হল। সিদ্ধাইয়ের কথা ওঠায় আমাদের আলোচনা ওই দিকে মোড় নেয়।

রাত্রে ঘুমিয়ে স্বপ্নেও এই বিষয়টি নিয়ে যেন অনুশীলন চলছে, মনন চলছে। হঠাৎ উত্তর পাওয়া গেল...এ হলো। ভিতরে আকর্ষণ। বাইরের পূর্ণকে কাছে টেনে আনা নয়। রামচন্দ্র পূর্ণ ব্রহ্ম। সেই পূর্ণকে, সমগ্র আত্মিক জগতকে নিজের ভিতর গুটিয়ে নেওয়া। এই কথা ভাবতে ভাবতেই ঘুম ভাঙলো, বুঝলাম পূর্ণকে ভিতরে পাওয়া শ্রীরামকৃষ্ণের হয়নি যা জীবনকৃষ্ণের ক্ষেত্রে হয়েছিল। ভিতরের দর্শন যে কিভাবে নতুন জ্ঞানের উন্মেষ ঘটায় সেদিন আর একবার তার প্রমাণ পেলাম।

—বরুণ ব্যানার্জী
জামবুনি, বোলপুর

● দেখছি (১৩.০৭.২০২২)—রাস্তা দিয়ে হাঁটছি। হঠাৎ একটা সাপ দেখে আমি ভয় পেয়ে অন্যদিকে হাঁটতে শুরু করলাম। আমি যেদিকে যাচ্ছি সাপটি সেদিকে যাচ্ছে। কালো সাপ। হঠাৎ সাপটা হাঁ করলো। বিশাল বড় হাঁ। আমি দেখে অবাক হয়ে তাকিয়ে আছি। ভেতরে দেখছি অনেকে আছে। তখন আমাকে স্নেহময়দা বললো, চলো, ভিতরে চলো। স্নেহময়দা হাতে মশাল নিয়ে সবাইকে পথ দেখাচ্ছে। আমাকে টেনে নিয়ে ঢুকিয়ে দিল সাপের ভিতরে—সেখানে জয়দার গলা পাচ্ছি। পাঠ হচ্ছে। আমাকে নিয়ে গিয়ে বসিয়ে দিল সেখানে। খুব আনন্দ হল। মনে হ’ল অন্য জগতে চলে এসেছি।

—পিউ কয়াল
সখেরবাজার

ব্যাখ্যা—বিরাট সাপ—ক্রিয়াশীল আদ্যাশক্তি।
জয়ের গলা—সমষ্টি চৈতন্যের ক্রিয়া হচ্ছে ভিতরে।
স্নেহময়দা—অণুচৈতন্য

কালার মৃত্যু

স্বপ্ন দেখছি (২২.১০.২০২২)—আমি শুয়ে আছি। আমার মাথার পাশে বিরাট একটি সাপ শুয়ে আছে। আর মাথার গোড়ায় স্বামী শুয়ে ঘুমাচ্ছে। আমি সাপটার দিকে তাকিয়ে আছি। হঠাৎ মানুষের গলায় কথা বলে উঠল—৩০ মিনিট পরেই তোর মৃত্যু হবে। আরও অনেক কিছু বলল। তারপর বলল, সব শুনেছিস? আমি বললাম, না। সব শুনতে পাইনি। অমি যে কালা। তারপর সাপটি ডান হাত বের করে আমার সাথে hand shake (করমর্দন) করল। সাপটি যখন কথা বলছিল তখন দেখলাম মুখের ভিতর একটা সাদা দাঁত ঝক্‌ঝক্‌ করছে আর ভিতরটা কালো গহ্বর ...

—সবিতা পাল
ইলামবাজার

ব্যাখ্যা—সাপ— সমষ্টিচৈতন্য। সাপের একটি দাঁত—দ্রষ্টার অনুচৈতন্য। ৩০ মিনিট পর মৃত্যু— ৩০ সংখ্যার তাৎপর্য লক্ষে পৌঁছাতে দৈবী সহায়তা। এখানে সহায়তা মানে সমষ্টিচৈতন্যের নতুন নতুন কথা। এই সহায়তা গ্রহণ করার জন্য বিষয়যুক্ত মনের মৃত্যু হতে হবে। কালা—বিষয়যুক্ত মনে নতুন কথা গ্রহণে অসুবিধা হয়। তাই মনে হচ্ছে কালা। স্বামী=জগৎস্বামী।

● গত ৭ই জ্যৈষ্ঠ দেখছি—স্নেহময়দা পাঠ করছেন। আমি বসে শুনছি। হঠাৎ আমার চশমাটা দূরে ছিটকে পড়ে ভেঙ্গে গেল। আমি উঠে গিয়ে খুঁজছি। সেখানে কিছুলোক দলিল, কাগজপত্র নিয়ে কীসব করছে। আমাকে দেখে বিরক্ত হচ্ছে। তখন স্নেহময়দা উঠে গিয়ে চশমাটার কাঁচের একটুকরো কুড়িয়ে একটা ছাতার ভিতরে লাগিয়ে দিলো। আর সঙ্গে সঙ্গে ছাতাটা গোল হয়ে ঘুরতে লাগল ফুল স্পীডে।...

—কল্যাণী সেনগুপ্ত
হাওড়া

ব্যাখ্যা—চশমা ভাঙল—দৃষ্টিভঙ্গী বদলে গেল। আগেকার ভাবনার কিছু অংশ সত্য তবে তা সমষ্টিচৈতন্যের নিরিখে দেখতে হবে—এই সমষ্টিচেতনার বিস্তার ঘটবে। একটি ছাতার ভিতরে লাগিয়ে দিল=একজ্ঞানের নিরিখে ব্যাখ্যা করলো। ছাতা ঘুরতে লাগল=মানুষের মধ্যে এই চেতনার বিস্তার ঘটবে।।

নির্ভয়ে সংসার

● দেখছি (5.07.22)— একটা বড় হল ঘরে দক্ষিণ দিকে মাথা করে চিৎ হয়ে শুয়ে আছে জয়। মুখ নিখুঁতভাবে কামানো, সাদা চাদর দিয়ে পা থেকে গলা পর্যন্ত ঢাকা। ওর ডান পা ও বাঁ পা চাদরের ভিতর থেকে খুব জোরে নাড়াচ্ছে। এতে মধুর সুর সৃষ্টি হচ্ছে। মনে হল ডান পা-টা স্নেহময় আর বাঁ পা-টা বরুন। আমি ওর পাশে শুতে গেলাম। এবার দেখছি পুরো বরুনকে। কথামৃত হাতে নিয়ে জয়ের পাশে শুয়ে পড়ছে। আমি ওর পাশে শুলাম। কথামৃত শুনতে শুনতে দেখতে পেলাম আমাদের পায়ের দিকে একজন সদ্য বিবাহিত মহিলা শুতে যাচ্ছে উল্টোদিকে মুখ করে। আর স্নেহময়ের মা একটি শিশুকে ওর কোলে দিতে যাচ্ছে। ঐ মুহুর্তে আমি বললাম, না, না, ওখানে শোয়াতে হবে না, আমি উঠে যাচ্ছি। এখানে বাচ্চাটিকে শোয়ান। আমি ওঠার সময় আবার একবার জয়ের মুখটা নিরীক্ষণ করলাম।...

কমল মালাকার
জীবনকৃষ্ণ পল্লী, সুরুল

ব্যাখ্যা—হলঘর—সহস্রার। দক্ষিণদিকে মুখকরে=দাক্ষিণ্যমূর্তি। অর্থাৎ spiritual controller. মুখ নিখুঁত ভাবে কামানো বাবু যে বাবুকে নিদ্রিত দেখেছিলেন জীবনকৃষ্ণ 1932-33 সালের এক স্বপ্নে। তিনি এখন জাগ্রত ক্রিয়াশীল। ওর পা দুটির একটি বরুন অপরটি স্নেহময়—পাঠের লোকেরা শূদ্র হয়েছে—জ্ঞান আহরণ করতে শুরু করেছে—ব্রহ্মচর্য অবস্থা। পরে বরুন পাশে শুয়ে কথামৃত পড়ছে—শূদ্রত্ব থেকে বৈশ্যত্ব বা ব্রহ্মচর্য থেকে গার্হস্থ্য অবস্থায় উত্তরণ হল। মধুর সুর—একত্বের সুর। কথামৃত শুনে ভক্তি জাগল—তাই সদ্য বিবাহিত মহিলা এলো। উল্টোদিকে মুখ করে শুতে যাচ্ছে—ভক্তিতে একজ্ঞান হয় না। স্নেহময়ের মা—দ্রষ্টার আত্মিক জগৎ। শিশু=দ্রষ্টার অনুচৈতন্য। আমার জায়গায় বাচ্চাটিকে শোয়াল—আমার জৈবী চেতনা প্রতিস্থাপিত হোক অনুপরিমান একত্বের চেতনা দ্বারা, যা ক্রমবর্ধনশীল, যা সমষ্টিচৈতন্যের সঙ্গে একত্বের বোধ দান করবে—তাই জয়ের পাশে শোয়াতে বলছে।

● আমি স্বপ্ন দেখছি (24.08.22)— স্কুলের গেটের সামনে দাঁড়িয়ে আছি। এমন সময় দারোয়ান কাকু গেট খুলে দিল। আর স্কুলের ভিতর থেকে এক ষাঁড় বেরিয়ে এসে আমাকে তাড়া করল। আমি দৌড়াতে লাগলাম। ষাঁড়টা আমাকে ধরতে পারলো না।...

—অগ্নিশ চ্যাটার্জী
শীলপাড়া

ব্যাখ্যা—অপরাবিদ্যার (স্কুলের) ভিতর থেকে জাগে অহংকার (ষাঁড়) যা দ্রষ্টাকে স্পর্শ করতে পারবে না।

বিলেতে পড়া

● গত ৩.১০.২০২২-এ দেখছি—একজন আমাকে জিজ্ঞেস করল, তুমি বিলেত গিয়েছ কখনও? বললাম, হ্যাঁ। ওখান থেকে স্যানিটরী ইঞ্জিনীয়ারিং পড়ে এসেছি। ও বলল, তাই হয় নাকি? তাহলে ঠিকানা বল ঐ কলেজের। বললাম, তাহলে বাড়ি যেতে হবে, কাগজপত্র দেখে বলবো। মনে হচ্ছে জীবনকৃষ্ণ যা যা করেছেন আমিও তাই করেছি। আমিই জীবনকৃষ্ণ। আমার সামনে বরুন ও অমরেশ ছিল। ওরাও বলল, ওরা বিলেত গিয়েছিল এবং স্যানিটরী ইঞ্জিনীয়ারিং পড়েছে যেখানে জীবনকৃষ্ণ পড়েছিলেন। আমি ভাবছি এটা কী করে সম্ভব? অমনি জীবনকৃষ্ণ এলেন। ওনার মাথা থেকে অসংখ্য কণা বেরিয়ে বহু মানুষের মাথায় ঢুকে যাচ্ছে। একটা কণা বরুণের মাথায় ঢুকল, একটা অমরেশের মাথায়, আর একটা আমার মাথায় ঢুকল। তখন বোধ হচ্ছে আমি জীবনকৃষ্ণ হতে উদ্ভুত। উনি আর আমি এক। আমি অনু জীবনকৃষ্ণ—বরুন ও অমরেশও তাই।... তাঁর থেকে মনুষ্যজাতি সৃষ্টি হয়েছে। স্বর্গীয় আনন্দ নিয়ে ঘুম ভাঙল।

স্নেহময় গাঙ্গুলী
চারুপল্লী

ব্যাখ্যা—দ্রষ্টার ভিতরে তারই এক সত্তা জেগে উঠে প্রশ্ন করছে, ‘‘আমি কে’’ প্রশ্নের উত্তর জানা শুরু হ'ল। পরে জগতের মানুষের সঙ্গে সর্ম্পক জানা যায়। লন্ডন বা বিলেত সমগ্র বিশ্বের নিরিখে জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চার উৎসভূমি।

বিলেত—সহস্রার। সেখানে মন গেলে ব্রেনের analytical power বাড়ে। প্রকৃত জ্ঞানচর্চা শুরু হয়। স্যানিটরী (স্বাস্থ্য পরিষেবা সংক্রান্ত) ইঞ্জিনীয়ারিং পড়া—flexible হয়ে সংস্কারমুক্ত হওয়ার পদ্ধতি অনুধাবন। ব্রেন থেকে সংস্কারের নিকাশী ব্যবস্থা জানা। সবাই আমরা বিলেতে পড়ছি---স্যানিটরী ইঞ্জিনীয়ারিং—জীবনকৃষ্ণকে ভিতরে পেয়ে বহু মানুষ আধুনিক আত্মিক জ্ঞানচর্চায় যুক্ত হচ্ছে।।

● স্বপ্ন দেখছি—কোথাও পাঠ হচ্ছে, আমরা কয়েকজন শুনছি। পাঠের শেষে স্বপ্ন আলোচনা হচ্ছে। শুভাশিস একটি স্বপ্ন বলল, ও কাল সারারাত ধরে জয়ের বুকের দুধ খেয়েছে।...

কৃষ্ণা ব্যানার্জী
বোলপুর

আয়ণ ঝড়

● দেখছি (২৫.০৯.২০২২)— এক জায়গায় একটি বাড়িতে আছি। জায়গাটি একটি ছাদের মতো। যেন চারিদিকে প্যাণ্ডেল করা। কেউ একজন বলছে আয়ন ঝড় (ion storm) নিতে হবে সবাইকে। গায়ে কিছু বস্ত্র থাকবে না, কিন্তু মুখটা ঢেকে নিতে হবে। আমি এক জায়গায় বসলাম। মহিলারা একটু সংকোচ বোধ করছেন এই ভেবে যে বিবস্ত্র অবস্থায় মুখোমুখি কিভাবে বসবেন। আমি ওনাদের বললাম, কোন অসুবিধা নেই, আমি আপনাদের দিকে পেছন করে বসছি। এই বলে আমি ঘুরে বসলাম। মাথায় একটা টুপী ছিল সেটাকে টেনে প্রসারিত করে মুখ ঢেকে নিলাম। পরে শুনছি কেউ একজন বলছে, শুধু ঢাকলে হবে না। বোরোন ও লেবু জলের আস্তরণও (কোটিং) দিতে হবে। আমি ডাক শুনে ঘুরে দেখছি যে কোথায় যেতে হবে কোটিং (coating) করাতে। দেখছি অনেক লোকজন আছেন। পাঠেরও অনেককে দেখছি। সবাই কিন্তু মুখ ঢাকেন নি। যেন ঘোষণাটাকে গুরুত্ব দেন নি, সিরিয়াসলি নিচ্ছেন না। তাদের উপেক্ষা করে আমি বিষয়টাকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে আস্তরণ লাগাবার জায়গায় গেলাম।...

—সৌম্যদীপ সেন
নিউ আলীপুর

ব্যাখ্যা—আয়ন ঝড়—যা আসে কোন নক্ষত্র থেকে। আত্মিক জগতে এটি পরম বিবর্তন। অপরিবর্তনীয় অবস্থায় গতি বা অনুচৈতন্যের বিক্ষেপ যা আয়নের মত স্থায়ী নতুন কিছু সৃষ্টির জন্য গতিশীল। বর্তমান সময়ে এই বিক্ষেপ অনেক বেশি গতিয়মান। সুরক্ষা নিতে হবে—গভীর মনন করতে হবে যাতে সূক্ষ্ম মনের অবস্থা (বিবস্ত্র) বজায় থাকে। মহিলারা—ভক্তের জগৎ। সংকোচ করছে—ভক্তিতে গভীর মনন করা যায় না। সূক্ষ্ম মনে থাকা যায় না। পিছন ফিরে বসা—জ্ঞানের জগতে দৃষ্টি দেওয়া। অর্থাৎ সমষ্টি চেতনায় মনন করা। মাথার টুপী—আগের ধারণা। তাকে প্রসারিত করা—নতুন ধারায় আসা। বোরোন লাগানো—এই জ্ঞান adjusted form-এ (গ্রহণযোগ্য অবস্থায়) আত্মস্থ হবে। বোরোনের কাজ হ'ল নিউক্লিয় বিভাজনে নিঃসৃত কণা শোষণ করে নিয়ন্ত্রণ করা। যেহেতু লেবুজল (lemon water) তড়িৎ সাপেক্ষ ক্রিয়াশীল তাই লেবুজল লাগানো মানে ঐ জ্ঞান ক্রিয়াশীল হওয়া। এখানে চর্চাকে গুরুত্ব দিতে বলা হচ্ছে।

● স্বপ্ন দেখছি (20.07.2022)— কোন একটা সিনেমার প্রথম অংশ থেকে একটা ঘটনা খুঁজে বের করেছি যেটা কেউ আগে দেখেনি ওই সিনেমা থেকে। প্রথম দৃশ্যে একটা সদ্যজাত ছেলে পরের দৃশ্যে জীবনকৃষ্ণ (বৃদ্ধ অবস্থা) মৃত অবস্থায় পড়ে আছেন। তার natural death (স্বাভাবিক মৃত্যু) মনে হচ্ছে না। বাবার ঘরে আছি। মনে হচ্ছে বাবাকে ডেকে দেখাচ্ছি। বাবা শিশুটিকে কোলে নিল। শিশুটি বলছে ও লিখছে—"মধু হল শুধু মাধ্যম (নির্গুনের) আমরা বহুদল ...।" পরে কোন একটা ফাঁকা মাঠে বরুন কাকুকে এটা বলাতে আমাকে বললো যে মায়েদের এখন বলিস না।

মধু মাধ্যম যখন বলছিল তখন মনে হচ্ছিল যে আগে তো মধু মানে চৈতন্য ছিল আর এখন একত্বের মাধ্যম।।

—অমৃত চ্যাটার্জী (শঙ্খ)
ইলামবাজার

ব্যাখ্যা---সিনেমার অংশ---পূর্ব নির্ধারিত ঘটনা। অস্বাভাবিক মৃত্যু—জীবনকৃষ্ণের ইচ্ছামৃত্যু, জগৎচৈতন্য সত্তার রূপান্তর ঘটলো সমষ্টিচৈতন্যে। শিশুটা—সমষ্টিচৈতন্যের অনুচৈতন্য। বাবা কোলে নিল—নির্গুণ অনুচৈতন্যের সুরক্ষার দায়িত্ব নিল। মধু হ'ল মাধ্যম (যা আগে চৈতন্যকে বোঝাতো)—আমরা

জগৎ চৈতন্যকে ধারন করতে পারি না, অনুচৈতন্য তথা সূক্ষ্মমনের চেতনা লাভের মাধ্যমে জগৎচৈতন্যের এক রস আস্বাদন করতে পারি। আমরা বহুদল—আমরা যেন এক পদ্মের বহু দল (পাপড়ি) সত্তাহীন অস্তিত্বমাত্র হয়ে এক ব্রহ্মের সঙ্গে ওতপ্রোত। মায়েদের বলিস না এখন—যারা ভক্তি নিয়ে আছে তারা এক্ষুনি জগৎচৈতন্যকে আপন সত্তা বলে অনুভব করতে পারবে না, দেরী হবে।

মডেল

● গত ৭.৮.২০২২-এ দেখছি—একজন লোক কালো শার্ট প্যান্ট পরা, সাহেবদের মতো টিপটপ, একহাতে একটা মডেল নিয়ে আসছেন। মডেলটা (Maniquin) খালি গা ধুতি পরা এক পুরুষ মানুষের। সেটাকে একটা টেবিলের উপর রেখে মাথা থেকে পা পর্যন্ত লম্বা-লম্বি ভাবে অর্ধেকটা কেটে ফেলল। তাঁর চোখ মুখ নাক কিছুই নাই। শুধু একটা মানুষের আকৃতি। কিন্তু আমার দেখে মনে হল ওটা জীবনকৃষ্ণ। কোন রক্ত বেরোয়নি। অর্ধেকটা কেটে আমাকে উনি বললেন, এটা এখন পকেটে রেখে দে। আমিও ওনার কথা মতো অর্ধেকটা পকেটে রেখে দিলাম। তারপর বললেন, বাকীটা দেওয়ার সময় এখনও হয়নি। সময় হলে দেবো।...

অর্পিতা সাহা
সখেরবাজার

ব্যাখ্যা—যিনি বস্তুতত্ত্বে জগৎচৈতন্যকে অধিগ্রহণ করে নির্গুণের ঘনমূর্তি হয়ে উঠেছেন তিনিই পারেন জগৎচৈতন্যকে আমাদের কাছে মডেলের মাধ্যমে তুলে ধরতে। কাটলেন বোঝানোর জন্য কিন্তু পুরোটা আমরা এখনই ধরতে পারবো না। তাই অর্ধেক দিচ্ছেন। রক্ত বেরোলনা—কারণ তিনি চৈতন্যসত্তা—স্থূল মানব নন।

● দেখছি (16.10.22)— একটা আমগাছের তলায় জয় দাঁড়িয়ে অনর্গল ঈশ্বরীয় কথা বলে চলেছে। আমি অবাক হচ্ছি এই ভেবে যে কী করে বলছে?

তাকিয়ে দেখি জয়ের পিছনে খালি গায়ে দাঁড়িয়ে স্বয়ং জীবনকৃষ্ণ। আবার জীবনকৃষ্ণের পিছনে বাবা ও বড়দা (বিজয়) এবং আমার স্ত্রী কল্পনা। প্রত্যেকেই মন দিয়ে জয়ের কথা শুনছে। তারা প্রত্যেকে বর্তমানে মৃত। স্বপ্নেই বোধ হল জয়ের মধ্যে স্বয়ং জীবনকৃষ্ণ তেজ প্রদান করছেন।...

—অরুণ ব্যানার্জী
শিমূরালী, নদীয়া

ব্যাখ্যা—দ্রষ্টা ধর্মজগতে কল্পনা নিয়ে ছিলেন। পরে বাবা অর্থাৎ নির্গুণের প্রসন্নতা লাভে সেই অবস্থা থেকে উত্তরণ হ'ল—বিজয় (দাদা) লাভ করলেন, ভিতরে সত্যের (জীবনকৃষ্ণের) প্রকাশে। এতদিনে সেই সত্যের ক্রিয়াশীলতার এক নতুন পর্যায়ে উপনীত হয়েছেন। আমগাছের তলায়=অমৃত বৃক্ষ—একজ্ঞানই অমৃত। সেই একজ্ঞানের কথা বলছে। বাস্তব জগতে তারা প্রত্যেকেই মৃত= এ যে চিরকালীন, অতীত—বর্তমান—ও ভবিষ্যৎ ধরে বহমান চৈতন্য।

দু'মুখো সাপ

● গত ২৩/৯/২০২২ তারিখে স্বপ্নে দেখছি—সমুদ্রের মাঝে একটা বাড়ি। বাড়িতে আমি, জামাইবাবু (সুপ্রিয়), ভাগ্নে এবং আরও অনেকে আছে। বাড়ীর মেঝে স্বচ্ছ। সেই মেঝের উপর ভাগ্নে এবং আরও অনেকে ঘুমাচ্ছে। বাড়ির মধ্যে সমুদ্রের জল প্রবাহিত হচ্ছে। মেঝের উপর যারা শুয়েছিল তাদের গায়ের উপর দিয়ে জল বয়ে যাচ্ছে। ঐ জলের মধ্যেই তারা ঘুমিয়ে আছে। লক্ষ্য করলাম একটা মোটা সাপ ভাগ্নের গায়ের উপর চেপে রয়েছে। ভয় পেয়ে জামাইবাবুকে দেখালাম। বললাম, কামড়ে দিতে পারে। জামাইবাবু সাপটাকে লোহার বাঁকানো একটা রড দিয়ে ধরলেন এবং দু'হাতে সাপটাকে নিলেন। দেখলাম, ওটা দু'মুখো সাপ। বড় মুখটা দিয়ে কামড়াতে আসছে। তখন ওনাকে বললাম, সাপটাকে ছুঁড়ে ফেলে দিন। উনি সমুদ্রে ছুঁড়ে দিলেন কিন্তু হাতে সাপের বড় মুখটা রয়ে গেল। ওটাকে একটা মাটির সরাতে রাখলেন। একজন মাঝ বয়সী মহিলা সাপটার মুখের কাছে তার মুখটা নিয়ে গেলে ঐ কাটা মুণ্ডু

তার ঠোঁট কামড়ে ধরল। জোর করে তাকে ছাড়ানোতে ঐ মহিলার ঠোঁট ছিঁড়ে গিয়ে রক্ত পড়তে লাগলো।...

—অচিন্ত্য গুপ্ত

বোলপুর

ব্যাখ্যা—সমুদ্র—ব্রহ্মসমুদ্র। সমুদ্রের মধ্যে ঘর—সত্তাবিহীন অস্তিত্ব নিয়ে থাকা। জল বয়ে যাচ্ছে গায়ের উপর দিয়ে—চৈতন্যের প্রবাহ অনুভূত হচ্ছে। দু'মুখো সাপ—Dialectic thought—দ্বন্দ্বমূলক অধ্যাত্ম চিন্তা। বড় মুখটা রয়ে গেল—একজ্ঞানের চেতনা রয়ে গেল। এক মহিলার ঠোঁটে কামড়ে দিল—ঐ চেতনা ক্রিয়াশীল—জগৎকে মুখ খুলতে অর্থাৎ অনুশীলনে থাকতে বাধ্য করবে। ভক্ত সত্তা একজ্ঞানের কথা বলতে পারবে না। সুপ্রিয়= সমষ্টিচৈতন্য। সরা—সহস্রার।

● স্বপ্নে দেখছি (11.08.2022)— মা একজনকে জিজ্ঞাসা করছে, একত্ব কী? সেই ব্যক্তি জয়কে দেখিয়ে বলছে, ও একত্ব। তখন আমার মনে হচ্ছে এই তো মা স্বপ্ন দেখল। এটা মা পাঠে বলবে কি?...

—সোনালী রায়

বেহালা

ব্যাখ্যা—ব্যক্তিগতভাবে একত্বের সত্য উপলব্ধি করতে হবে। তারপর তার অনুশীলন দরকার হয়।

আত্মিক স্তম্ভ

● দীর্ঘ বারো বছর পর গত ২৯ শে জুলাই আমি স্বপ্নে শ্রীজীবনকৃষ্ণকে দেখলাম। দেখছি—মা বলছে, ঠাকুর এসেছেন। অমনি আমি ছুটে ঘরে ঢুকলাম। দেখি ঠাকুর জীবনকৃষ্ণ চেয়ারে বসে আছেন। আমি ওনার কাছে গিয়ে ওনার হাঁটু জড়িয়ে পায়ের কাছে বসলাম। কী স্পষ্ট ওনাকে দেখলাম। আমি বললাম আমি পাঠে যা বলি সেগুলো কি ঠিক বলি না ভুল বলি? উনি কিছু না বলে উঠে দাঁড়ালেন। তারপর ঘরের বাইরে এলেন। বাইরে সব ফাঁকা জায়গা দেখছি।

উনি এবার বললেন, ঠিকই বলছ, তবে কিছু কথা ভুল হয়। আমার প্রচণ্ড আনন্দ হ'ল একথা শুনে। ঘুম ভাঙল। মনে হল তাহলে সব ঠিকই আছে।

—**জয়কৃষ্ণ চ্যাটার্জী**
জামবুনি, বোলপুর

ব্যাখ্যা—আত্মিক জগতে দ্বান্দ্বিক ভাবনার মধ্যে দিয়ে দ্রষ্টা নিজেকে নিজে অতিক্রম করে এগিয়ে চলেছেন। পুরোন ভাবনার প্রেক্ষাপটে তার নতুন কিছু কিছু ভাবনা ভুল বলে মনে হবে। বস্তুত তা উত্তরণের বা অগ্রগতির লক্ষণ।। ঘরের বাইরে এলেন =অহংশূণ্য অবস্থা হ'ল। স্পষ্ট দেখা—স্পষ্ট ধারণা হওয়া। প্রচণ্ড আনন্দ হ'ল—আনন্দ স্বরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হলেন।

● একদিন T.V-তে দেখছি, প্রধানমন্ত্রী উত্তরাখণ্ডে অশোক স্তম্ভ সৌধটি প্রতিষ্ঠা করছেন। সেদিন রাতে (7.08.2022)—স্বপ্ন হলো—অশোক স্তম্ভটি বোলপুরে আনা হয়েছে। সেটি বোলপুরেই রাখা হবে। তবে অশোকস্তম্ভের মধ্যে যে চারটি সিংহের মুখ থাকে, বোলপুরে আনা সেই অশোকস্তম্ভে চারটি সিংহের মুখ নেই বরং একটি সিংহের মুখ রয়েছে এবং সিংহের মুখ বারবার বদলাচ্ছে। বদলে একবার জয়দার মুখ আর একবার সিংহের মুখ হচ্ছে। এই স্তম্ভটির নাম অশোকস্তম্ভের বদলে হয়েছে আত্মিক স্তম্ভ।...

—**সায়েরী রাউত**
বেহালা

ব্যাখ্যা—চারটির স্থলে একটি সিংহ—আত্মিকে বহু নেই, আছে এক। অশোক বাইরের ধর্মের দ্বারা মানুষকে এক করতে চেয়েছিলেন, অশোকস্তম্ভ তারই প্রতীক। কিন্তু এই একীকরণ সম্ভব আত্মিকে। তাই অশোকস্তম্ভের বদলে নাম হয়েছে আত্মিক স্তম্ভ।

পাঠ প্রসঙ্গে

পাঠ প্রসঙ্গে

পাঠ ও আলোচনা প্রসঙ্গে যেসব নতুন কথা উঠে আসে তারই কিছু সংক্ষেপসার সংগ্রহ করে এখানে উল্লেখ করা হলো।

● প্রসঙ্গ ঃ **মানুষে তিনি অবতীর্ণ হন যেমন ঘুঁটির ভিতর মাছ কাঁকড়া এসে জমে...শ্রীরামকৃষ্ণ।**

শ্রীরামকৃষ্ণের এই কথার বিশ্লেষণে কয়েকটি প্রশ্ন উঠে আসে। ‘‘তিনি অবতীর্ণ হন’’—বলতে কী বোঝা যায়? মাছ ও কাঁকড়া কীসের প্রতীক? তার অবতীর্ন হওয়ার সঙ্গে এই মাছ কাঁকড়া জমার সম্পর্কটা কী?

এখানে অবতীর্ন হওয়ার বিষয়টিকে দুভাবে দেখা যেতে পারে—(১) চৈতন্যের নির্যাস সংকলিত হয়ে আত্মা বা ভগবান দর্শন। (২) অবতারতত্ত্বে চৈতন্যের অবতরণ ও মানুষ রতন হওয়ার কথা। ভগবান দর্শন বা মানুষরতন দর্শনের ক্ষেত্রে মাছ কাঁকড়া জমার উপমাটির মিল খুঁজতে হলে মাছকে আত্মার প্রতীক ধরতে হবে কিন্তু কাঁকড়া কীসের প্রতীক হবে? কাঁকড়ার প্রতীকার্থ নিয়ে একটা বিভ্রান্তি সৃষ্টি হবে। আসলে ঠাকুরের এ বিষয়ে কোন দর্শন হয়নি, তিনি বাইরে কোথাও এ ঘটনা দেখেছিলেন বা কারও কাছ থেকে শোনা কথা বলছেন। অবতীর্ন হওয়ার সাথে মাছ কাঁকড়ার উপমাটি সামঞ্জস্য পূর্ণ হচ্ছে না। অনুভূতি ছাড়া এই ধরনের কথা বলা বা ব্যাখ্যা করার মধ্যে কল্পনা এসে পড়ে। তাই জীবনকৃষ্ণ তার এক অনুভূতি থেকে এ বিষয়ে আলোকপাত করেছেন। তিনি দেখেছিলেন, ‘‘ঘুঁটির ভিতর কাঁকড়া এসে জমেছে। শুধু কাঁকড়া নয়, মাছও কিলবিল করছে।’’ ভগবান দর্শনের পরে তার এই দর্শন হয়েছিল। তিনি এই দর্শন থেকে বুঝতে পেরেছিলেন যে মাছ কাঁকড়া জমাটা ভগবান দর্শন বা অবতারত্বের কথা নয়। কাঁকড়া হল ইন্দ্রিয় নিয়ে যা নিম্নাঙ্গের জিনিস তা ঊর্ধ্বাঙ্গে উঠেছে, সহস্রারে উঠেছে। সুতরাং কোনভাবেই অবতীর্ণ হওয়ার সাথে মাছ কাঁকড়া জমার উপমাটি মেলে না।

নিম্নাঙ্গে কাঁকড়া হল ইন্দ্রিয় সমূহ (পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় ও পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়) যা চিত্তের অবলম্বন বা আধার স্বরূপ হয়ে থাকে। আর মাছ হ’ল মনের প্রতীক। এই মনও চিত্তের অবলম্বন হয়ে থাকে। কিন্তু একথা পরিষ্কার যে বস্তুতত্ত্বে প্রথম স্তরের সাধন যার তার আত্মাসাক্ষাৎকার বা ভগবান দর্শনের সময় পূর্ণরূপে

চিত্তবৃত্তি নিরোধ হয়। অতীন্দ্রিয় অবস্থা হয়। সুতরাং আত্মাসাক্ষাৎকারের অবস্থার সঙ্গে মাছ কাঁকড়া জমার উপমাটি খাপ খায় না।

তাহলে জীবনকৃষ্ণ ভগবান দর্শনের পর কেন মাছ কাঁকড়া জমতে দেখলেন? এখানে কাঁকড়া অর্থাৎ ইন্দ্রিয় নিচয় বলতে ইন্দ্রিয়ের development বা বিকাশের কথা বলা হয়েছে। নিচয় শব্দের এক অর্থ হল বৃদ্ধি। জীবনকৃষ্ণ বলেছেন নিম্নাঙ্গের জিনিস ঊর্ধ্বাঙ্গে উঠেছে। নিম্নাঙ্গ মানে under developed বা অনুন্নত অবস্থা আর ঊর্ধ্বাঙ্গ মানে developed অর্থাৎ বিকশিত অবস্থা। জ্ঞানেন্দ্রিয়, কর্মেন্দ্রিয় ও মন ভগবান দর্শনের আগে পূর্ণরূপে ঈশ্বরমুখী থাকে না। বিকশিত অবস্থা হলে তিনি আধ্যাত্মিক বিষয়ে কোনটা ঠিক কোনটা ভুল তা ধরতে পারেন। তার ইন্দ্রিয়ের বিশেষ গঠন মূলক পরিবর্তন হয়। ফলে বোধ উন্নত হয় এবং মন সূক্ষ্ম মনে পরিবর্তিত হয়ে যায়। তখন ইন্দ্রিয় মানে হল উন্নত বোধ। চক্ষু মানে বিশেষ দৃষ্টিকোন, দৃষ্টিভঙ্গী। জিহ্বা বলতে বোঝায় উন্নত আলোচনার ধারা। কানে কোন কথা শোনামাত্র তার যোগের ব্যাখ্যা মনে উদয় হয়—আন্ কথা মাথায় স্থান পায় না।

শ্রীজীবনকৃষ্ণের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে দীর্ঘদিন তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের দৃষ্টিতে জগৎকে দেখেছেন। তিনি ভাবতেই পারতেন না যে শ্রীরামকৃষ্ণের এসব দর্শন হয়নি। তিনি মনে করতেন যে শ্রীরামকৃষ্ণ কোন ভুল করতে পারেন না। তিনি সবই ঠিক বলেছেন। তাই তাকে অনুসরণ করে তার আট্‌কে প্রসাদ খাওয়া বা একাদশী করার মতো ব্যবহারিক আচরণও লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু ঊর্ধ্বাঙ্গে এসে ইন্দ্রিয় সকল বিকশিত হয়ে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন ঘটল। ঠাকুরের চশমায় জগতকে না দেখে নিজের চোখে জগতকে দেখতে লাগলেন। ঠাকুরের প্রতিটি কথার চুলচেরা বিশ্লেষণ করতে লাগলেন। ধর্মকথার মধ্যে কোন অসঙ্গতি থাকলে ধরে ফেলছেন।

এ কিন্তু ঠাকুরের সমালোচনা নয়। তার অনুভূতি ঠাকুরের ভুল ধরার জন্য নয়, ঠাকুরের ব্যবহৃত উপমার যথার্থ অর্থ কী, কখন এরূপ দর্শন হয়, এর effect কি, এতে দৃষ্টিভঙ্গীর কী পরিবর্তন হয় তা জানার জন্য। ঠাকুরের ভুল ধরা মানে এ পর্যন্ত জগতে প্রকাশিত সত্যের অপূর্ণতা কোথায় তা ধরতে পারা ও পূর্ণ সত্যে প্রতিষ্ঠিত হওয়া।

শ্রীজীবনকৃষ্ণের বিভিন্ন অনুভূতি হওয়ায় শ্রীরামকৃষ্ণের অনুভূতি সমূহের গুরুত্ব যেমন বোঝা গেল, তেমনি বোঝা গেল তিনি প্রকৃত অবতার আবার

তার কোন কোন অনুভূতি ত্রুটিপূর্ণ তাও জানা গেল, ঠাকুর যেন ব্রহ্মবিদ্যা চর্চার এক অনুপম প্রেক্ষাপট (background) দিয়েছেন আমাদের। রামকৃষ্ণরূপী পাতার উপর জীবনকৃষ্ণরূপী কলম ব্রহ্মবিদ্যার পূর্ণ পরিচয় ফুটিয়ে তুলেছেন। পাতা যদি ভালো না হয়, যদি কালি ছেপে যায়, তাহলে কলম যে খুব সুন্দর, লেখাটি যে মুক্তাক্ষর তা বোঝা যায় না। তাই জগতে শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাণীর গুরুত্ব নতুন করে যেন আমাদের কাছে ফুটে উঠতে লাগল। কথামৃত যেন খুব ভালো একজন ছাত্রের উত্তর পত্র। তার ভুল ভ্রান্তি বিশ্লেষণ (Error analysis) করে জীবনকৃষ্ণ আমাদের ব্রহ্মবিদ্যা ঠিক ঠিক ধারনা করতে শিক্ষা দিচ্ছেন।

যারা স্বঘোষিত গুরু, পরমহংস, ভগবান, বা অবতার তাদের বাণী অনুভূতিমূলক নয়, তাদের কারও ইষ্টমূর্তি দর্শনকে অতিক্রম করে ভগবান দর্শনই হয়নি। তাই তারা ব্রহ্মবিদ্যা অনুশীলনের ভিত্তিভূমি (background) হতে পারেন না—যাদের বানীর সঙ্গে জীবনকৃষ্ণের অনুভূতির তুলনামূলক আলোচনা করে ব্রহ্মবিদ্যার উচ্চশিক্ষা লাভে এগোন যায়।

শ্রীজীবনকৃষ্ণের মাছ কাঁকড়া জমার অনুভূতির পরিণতি স্বরূপ নতুন দৃষ্টিভঙ্গী লাভে তিনি সাধারণ মানুষের জন্য হয়ে উঠলেন লাইট হাউস। লাইট হাউসের আলো যা সমুদ্রের নাবিকদের পথ দেখায় তা অনেক উচ্চে থাকে। নীচে থাকলে মানুষকে পথ দেখানো যায় না। ঊর্ধ্বাঙ্গে উঠে বিকশিত হয়ে উঠলে তবেই তিনি পথ প্রদর্শক হয়ে উঠতে পারেন। ঐ ঘুঁটি হচ্ছে সহস্রারে চেতনার একটি বিশেষ স্তর যেখানে ইন্দ্রিয় নিচয়ের অবস্থান হলে তিনি সার্চ লাইট পেয়ে যান, হয়ে ওঠেন সার্জেন্ট সাহেব। নিজের উপর যেমন আলো ফেলতে পারেন তেমনি সকলের উপরও আলো ফেলতে পারেন। তার আলোতে আমরা পরস্পর কে জানতে পারি সত্যভাবে। যদিও এই অবস্থা লাভ হয় যখন তিনি নির্গুণের ঘনমূর্তি হয়ে ওঠেন। এই অবস্থায় তিনি সাধারণ মানুষের উপর আলো ফেলেন যা অনুচৈতন্য রূপে প্রকাশ পেয়ে তাদের চিত্তের বিকার দুর করতে থাকে। তাদেরও ইন্দ্রিয় সমূহের বিকাশ ঘটতে থাকে এবং ধীরে ধীরে মনও সূক্ষ্ম মনে পরিবর্তিত হতে থাকে। তখন তাদের আধ্যাত্মিক বিষয়ে শুষ্ক বিচার বন্ধ হয়ে যায়। তারা অনুভূতি দিয়ে ও উন্নতবোধ দিয়ে তা বিশ্লেষণ করতে পারে।

● প্রসঙ্গ ঃ **জ্ঞানলাভের পর, তত্ত্বজ্ঞানের পর, ভগবান দর্শনের পর দাস আমি, ভক্তের আমি, বিদ্যার আমি রাখে লোকশিক্ষার জন্য—কথামৃত।**

ঠিক ঠিক জ্ঞানলাভের পর দাস আমি, ভক্তের আমি, বা বিদ্যার আমি থাকতে পারে না। এখানে দাস আমি, ভক্তের আমি বা বিদ্যার আমি লোকশিক্ষার জন্য রাখে বলা হলেও বাস্তবে দেখা যায় শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে দাস আমি বা ভক্তের আমি বা বিদ্যার আমি ছিল। ষোল আনা বা পূর্ণ মাত্রায় ব্যষ্টির সাধন হয়নি বলে দাস আমি থেকে গেছিল। দাসভাবের দুটি অবস্থা দেখা যায়। ভগবান দর্শনের আগের অবস্থা আর জড় সমাধি বা স্থিত সমাধির পরের অবস্থা। ভগবান দর্শনের আগে সচ্চিদানন্দ গুরু থাকে। তাই গুরু শিষ্যের বোধ যে সম্পর্কের সৃষ্টি করে তাতে দাস ভাব থাকে। এই অবস্থা রামকৃষ্ণ এবং জীবনকৃষ্ণ উভয়ের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। কিন্তু ভগবান দর্শন অর্থাৎ আত্মাসাক্ষাৎকারের পর আত্মার সাধন হয়ে যদি জড়সমাধি হয় তাহলে সগুণের এলাকায় থাকেন। তখন মনে হয় যে তিনি ছাড়া আর কিছু ভাববো না। তিনি যা করবেন তাই করবো। ঠাকুর বলছেন, মা যা করান তাই করি, মা যন্ত্রী আমি যন্ত্র ইত্যাদি। অর্থাৎ তিনি (ঠাকুর) পূর্ণরূপে দাসভাবে ছিলেন। অবতারত্ব অবস্থায় তার যে ভক্তির আমি বা বিদ্যার আমি তাও কিন্তু ‘‘দাস আমি’’-র-ই নামান্তর। এখানেও দাস ভাব-ই রয়েছে। মা তাকে যা বলান তাই বলেন। তিনি বলছেন, মা রাশ ঠেলে দেন। কিন্তু স্থিতসমাধির পর দাসভাব থাকে না। জীবনকৃষ্ণের স্থিতসমাধির পর যে সাধকের আমি ছিল তাতে দাস ভাব ছিল না। তবে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি তার ভক্তি বা শ্রদ্ধার কোন ঘাটতি ছিল না। একটা উদাহরণ নিলে বিষয়টা পরিষ্কার হয়ে যাবে।

বিদ্যালয়ে পড়ার সময় একজন ছাত্রের তার শিক্ষকের সঙ্গে যে সম্পর্ক সেখানে সে শিক্ষককে প্রভু ভাবে, কর্তা ভাবে। সে থাকে তার অধীনে। কিন্তু পরবর্তীকালে এই ছাত্রটি যদি সেই বিদ্যালয়েরই শিক্ষক পদে যোগ দেয় তাহলে সে আগের ঐ শিক্ষকের সহকর্মী হয়ে যায়। ফলে শ্রদ্ধা বা ভক্তি অটুট থাকলেও দাসভাব থাকে না। যে নির্গুন থেকে রামকৃষ্ণরূপে সচ্চিদানন্দ গুরুর আবির্ভাব স্থিত সমাধিতে সেই নির্গুনে নিজে লীন হলে আর দাসভাব, গুরুশিষ্য বোধ থাকে না। কারণ সাধক তখন একজ্ঞানে অধিষ্ঠিত হন। আমিই আছি, আমারই জগৎ এই বোধ থাকে। পরে অবতারতত্ত্বের সাধনেও সাধকের ব্যাষ্টির আমি থাকার জন্য তার মধ্যে একটা ভক্তি বা শ্রদ্ধাভাব থাকে।

সম্পর্কটা অনেকটা সহকর্মী বা বন্ধুর মত হয়। তাই শ্রীরামকৃষ্ণ কোন স্বপ্নেই জীবনকৃষ্ণকে বকছেন না বা স্পষ্ট কোন আদেশ দিচ্ছেন না। ‘‘তুই এতো গরম জিনিস খাস কেন?’’ আমায় শুনিয়ে খাইয়েছিস’—ইত্যাদি বলছেন। গরম জিনিস খাস না, আমায় লিখে খাওয়া—এমন কথা বলছেন না।

সাধকের ব্যষ্টির আমি সম্পূর্ণ চলে যায় যখন তার বিশ্বব্যাপীত্ব লাভ হয়। তিনি তখন জগৎ বিক্ষেপ করেন। সকলের মধ্যে স্বপ্নে, ধ্যানে, তন্দ্রায় চিন্ময়রূপে প্রকাশ পান। আমার জগৎ-একথা তাকে বলতে হয় না—জগতের অসংখ্য মানুষ বলেন যে আত্মিকে আপনি একাই আছেন। আত্মিক জগৎ আপনারই। তখন তার ‘বিশ্বব্যাপী আমি’ থাকে যার স্বীকৃতি জগৎ থেকেই আসে।

ব্যষ্টিতে স্থিত সমাধির পর একথা বুঝলেও বলা যায় না যে জগৎব্যাপী হয়ে এক আমিই আছি। যেমন, উপরাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব সাময়িক কালের জন্য নিলেও তিনি নিজেকে রাষ্ট্রপতি হিসাবে ঘোষনা করতে পারেন না কারণ তখন তিনি দেশের জনগন কর্তৃক নির্বাচিত ও স্বীকৃত রাষ্ট্রপতি নন।

আসলে জগৎব্যাপী চৈতন্যের প্রকাশে অর্থাৎ অন্যের মধ্যে তার রূপ স্বস্বরূপ হিসাবে ফুটে উঠলে বোঝা যায় যে তিনি শাশ্বত হয়েছেন। জীবনকৃষ্ণকে বহু মানুষ সূর্য মণ্ডলস্থ পুরুষ হিসাবে বা পরম এক রূপে অন্তরে দর্শন করেন। বোঝা যায় সূর্য যেমন শাশ্বত তিনিও তেমনি শাশ্বত, ভবিষ্যতেও মানুষ তাকে অন্তরে দেখতে থাকবে।

জীবনকৃষ্ণ যখন বুঝলেন যে জগৎব্যাপী এক চৈতন্য সত্তাই আছে আর তা আমি অর্থাৎ একজ্ঞান লাভ করলেন তখন ‘‘তিনি’’ নয়, আমিই আছি বোধ জাগে। তখন দাস আমি ভক্তের আমি বা বিদ্যার আমি কিছুই থাকে না। এই অবস্থাটা উপনিষদ্ বর্ণিত সেই অবস্থার বাস্তব রূপ—একোবশী সর্বভূতান্তরাত্মা একং রূপং বহুধা যঃ করোতি। তিনি হয়ে ওঠেন পরম এক, বশী অর্থাৎ নিয়ন্তা। তিনি সর্বভূতের অন্তরাত্মা জগৎচৈতন্য।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে কিভাবে সাধারণ মানুষের, যাদের ২য় স্তরে অনুভূতি হয় তাদের একজ্ঞান হবে? কিভাবে এই জ্ঞান শাশ্বত হয়ে উঠবে আমাদের জীবনে? এক্ষেত্রেও উপনিষদ্ বলছে, ত্বমাত্মাস্থং যে’নুপশ্যন্তি ধীরাঃ তেষাং সুখং শাশ্বতং নেতরেষাম্। নিজের মধ্যে যিনি জগৎব্যাপী এক চৈতন্য সত্তাকে দেখবেন তিনি শাশ্বত সুখ বা জ্ঞানের অধিকারী হবেন। এই দেখা বলতে একবার স্বপ্নে দেখা

নয়। তাকে একজ্ঞানের মূর্তরূপ হিসাবে দেখতে হবে অর্থাৎ তাকে দেখে একজ্ঞানের উপলব্ধি হলে তবে শাশ্বত জ্ঞানের অধিকারী হবে।

যেমন, একজন একদিন কোন রকমে সাইকেল চালালো, তাকে ৫ বছর পর আবার সাইকেল চালাতে বললে পারবে না। কিন্তু যে এক বছর ধরে সাইকেল চালিয়েছে তাকে যদি আবার দশ বছর পর সাইকেল চালাতে বলা হয় তাহলে সে একই রকমভাবে তা চালাতে পারবে। আত্মিক জগতেও তেমনি একজ্ঞানের উপলব্ধি একবার হলে তা নষ্ট হবার নয়। সে যদি কোন কারণে পাঠ ও আলোচনা থেকে বিছিন্ন হয় কিছু কালের জন্য তাহলেও যে কোন সময়ে এই একজ্ঞান তার মধ্যে ক্রিয়াশীল হতে পারে অর্থাৎ এই জ্ঞান সদা ক্রিয়াশীল থাকে।

এই একজ্ঞান আমরা পাব কিভাবে? জগৎ চৈতন্য সমষ্টি চৈতন্যে পরিবর্তিত হয়ে যখন তার একত্বের এককণা বা অনুচৈতন্য দান করছেন তখন আমাদের মধ্যে ঈশ্বরমুখী প্রকৃত মনন শুরু হয়। প্রাণশক্তির গঠনের পরিবর্তন হয়ে আমরা একজ্ঞানের দিকে যাত্রা শুরু করি, জগৎচৈতন্যকে জানতে পারি। যদিও তাকে পুর্ণভাবে জানতে পারি না, সমষ্টি চৈতন্য আত্মিক নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে যতটা ধারণা করিয়ে দেন ততটুকু বুঝি, liberty না পেলেও freedom এর আস্বাদন পাই তাতে।

জঙ্গল থেকে একজন মধুর চাক ভেঙ্গে মধু সঞ্চয় করলেন। এবার তিনি যখন সেই মধু দেবেন তখনই সাধারণ মানুষ সেই মধুর পরিচয় তথা আস্বাদন পাবে। সেইরূপ সমষ্টিচৈতন্য সেই মধু অর্থাৎ চৈতন্যের কণা যেন বহু মানুষকে দান করছেন। এর ফলে মানুষ কল্পনার ধর্ম থেকে সরে আসতে পারছে।

প্রচলিত অবতার বাদ মিথ্যা। মৎস, কূর্ম, বরাহ নৃসিংহ, ...রাম, কৃষ্ণ ইত্যাদি অবতার মানুষের দেহে যোগের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার প্রতীক মাত্র। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ দেহের ভিতর চৈতন্যের অবতরণ্ ও মানুষরতন দেখে অবতারত্ব লাভ করেছেন। অবতার প্রত্যক্ষ সিদ্ধ। ঈশ্বরত্ব লাভের আগে অবতারত্বের সাধনে মানুষটা অবতার হয়, এ কল্পনা নয়, সত্য। প্রচলিত পরমহংসের ধারণাও ভুল, কল্পনা মিশ্রিত। বেদান্ত মতে সিদ্ধ হলে পরমহংস হয়। আত্মিকে এক অখণ্ড চৈতন্য সত্তাই আছে এবং আমিই সেই সত্তা প্রমান সাপেক্ষে (বহুর অন্তরে) এই উপলব্ধি যার হয়েছে তিনি পরমহংস। কল্পনার অবতার, পরমহংস ইত্যাদি ভাবনা থেকে সৃষ্ট দাস ভাব মানুষের জীবনের শাশ্বত গতিকে—আত্মিকে সৃষ্টি স্থিতি ও

প্রলয়ের মধ্যে দিয়ে একজ্ঞানকে বোধে বোধ করার অভিমুখে, চিরকালের মতো রুদ্ধ করে দিয়েছে। তাই যে দাসভাব্ সাধারন মানুষকে বোঝায় যে সে তুচ্ছ, কীটানু কীট, দাসানুদাস ইত্যাদি—সমষ্টি চৈতন্যের অনুচৈতন্য লাভে তার সেই ভাবের পরিবর্তন ঘটতে থাকে, মননের ধারা বদলে যাওয়ায়। একসময় সে বুঝতে পারে যে তারই প্রাণশক্তি সমষ্টিচৈতন্যের এই রূপ ধারণ করে। ধীরে ধীরে বোধে আসে এই সমষ্টি চৈতন্যই তার আপন বৃহৎ সত্তা। জগৎব্যাপী এই এক অখণ্ড চৈতন্য সত্তাই আছে। ব্যক্তিবোধ থেকে সৃষ্ট দাসভাব, ভক্তিভাব তার থাকে না। তখন একজ্ঞান লাভ হয়।

এই একজ্ঞান চেতনার স্থায়ী পরিবর্তন ঘটায়। ধর্ম সম্বন্ধে আমাদের পুরোন ধ্যান ধারনা যেমন পুজো করা, নামাজ পড়া, বাইরে ভগবান আছেন তাকে ডাকলে তিনি প্রার্থনা শোনেন ইত্যাদি ধারনার পরিবর্তন হয় যখন সমষ্টিচৈতন্যকে ভিতরে দেখে উপলব্ধি হয় তিনিই পরম এক, নির্গুণ ব্রহ্ম। তখন মানুষটির সকল ধর্মীয় সংস্কারজ ভাবনা সমূলে উৎপাটিত হয় ও চেতনায় একজ্ঞান প্রতিস্থাপিত হয় যা অপরিবর্তনীয় আর তাই শাশ্বত।

উপলব্ধি হয়, সারাজীবন ধরেই চেতনার বিভিন্ন স্তরে গুরু, ভগবান, ব্রহ্ম, পরম এক ইত্যাদি রূপে এই একই ছিলেন, ভবিষ্যতেও এই একজ্ঞান চেতনায় ক্রিয়াশীল থাকবে। বাইরের জগতের দিকে তাকিয়ে দেখেন অসংখ্য শিশু কিশোর যুবক পৌঢ় ও বৃদ্ধ এই এককে, সমষ্টিচৈতন্য বা জগৎ চৈতন্যকে অন্তরে দেখে ঘোষণা করছে তিনি কালাতীত। এই এক-ই সত্য, চিরন্তন। ঋষিরা এই একজ্ঞানের কথাই উপনিষদে প্রতিধ্বনিত করেছেন, যা বর্তমানে মূর্ত হয়েছে। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের মানুষের অন্তরেও ধ্বনিত হবে এই একজ্ঞান। এই শাশ্বত জ্ঞান যে বয়সেই লাভ হোক সেই বয়সেই মানুষটা স্মরণাতীত কাল হতে প্রবাহিত ও ভবিষ্যতে অনন্তকাল ধরে যা প্রবাহিত হবে সেই চেতনায় যুক্ত হয়, শাশ্বত হয়ে যায়।

● প্রসঙ্গ ঃ **চেতনা ও তার বিকাশ**।

একজন মানুষের নিজের সত্তা সম্পর্কে বোধ, পরিবেশের সঙ্গে তার সম্পর্ক ও আচরণ যার দ্বারা নির্ধারিত হয় তা হলো চেতনা। মানুষের চেতনাকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়। (১) ব্যবহারিক বা বাহ্যচেতনা এবং (২) আধ্যাত্মিক চেতনা।

ব্যবহারিক জগতের যে কোন ক্রিয়াকলাপ যে চেতনা দ্বারা সম্পাদিত হয়

তা বাহ্য চেতনা যাকে চিরন্তন বাহ্য চেতনা বলে। মানুষের নিজস্ব জৈবী সত্তা বা অহংসত্তা অনুযায়ী তার বাহ্যচেতনার প্রকাশ ঘটে। ফলে তার নিজস্ব সুখ স্বাচ্ছন্দ্য, দুঃখবেদনা, মান সম্মান, জীবনযাপনের মান (living standard) ইত্যাদি বিষয় বাহ্যচেতনা দ্বারা সম্পন্ন হয়। ব্যবহারিক জীবনে আচরণ বিধির মধ্যে উচ্চ ও নিম্ন চেতনার প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। প্রসঙ্গত অন্য প্রাণীদের যে বাহ্যচেতনা থাকে সেটিরও মানুষের বাহ্যচেতনার মতো বিকাশ দেখা যায় না। যেমন একটি মৌমাছি বা একটি বাবুই পাখি চিরকাল একইরকমের ঘর বানায়। তারা নতুন কিছু ভাবতে পারে না। কিন্তু মানুষের বাহ্যচেতনার উল্লেখযোগ্য বিকাশ লক্ষ্য করা যায়। সে নিত্যনূতন উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় দিচ্ছে।

আধ্যাত্মিক চেতনা শুধুমাত্র মানুষেরই থাকে। যে চেতনা আমাদের ঈশ্বরীয় চিন্তার দিকে ঠেলে দেয় তাকে বলি অন্তর্মুখী প্রাণ চৈতন্য বা প্রাণশক্তি। এ কিন্তু Vital power নয়। এই চেতনা সূক্ষ্মচিন্তায় গতিয়মান হয় বলে একে কুণ্ডলিনীও বলে। আচার অনুষ্ঠানের ধর্ম ঈশ্বরীয় চেতনাকে অগ্রমুখী করে না। তাই আধ্যাত্মিক চেতনারও কিছু স্তর ভেদ রয়েছে। চেতনার বিভিন্ন সমান্তরাল জগতের উপস্থিতির দ্বারা তা বোঝা যায়। যেমন (১) বৈধী ধর্মের চেতনা ও (২) পরাধর্মের চেতনা।

অনেকেই ঈশ্বরচিন্তা করেন উপর উপর (Superficial). পূজা, পাঠ, মন্ত্রোচ্চারণ, মন্দির বা তীর্থ দর্শন ইত্যাদি ক্রিয়াকলাপকে তারা ধর্মচিন্তা বলেন। তবে এই চেতনায় ব্যবহারিক ক্রিয়াকলাপ দেখা গেলেও শুধুমাত্র বাহ্যচেতনা অর্থাৎ যারা ঈশ্বরচিন্তা করেন না কেবল বিষয়চিন্তা নিয়ে আছেন তাদের সঙ্গে পার্থক্য অবশ্যই আছে। কিন্তু আধ্যাত্মিকতার প্রাথমিক পর্যায়ের এই জগতে প্রাণশক্তি বা কুণ্ডলিনীর জাগরণ হয় না, মন অন্তর্মুখী হয় না।

পরাধর্মের বিষয়টি সম্পূর্ণ ভিন্ন। মন সম্পূর্ণরূপে অন্তর্মুখী হয় ও কুণ্ডলিনী পূর্ণরূপে ক্রিয়াশীল হয়। মানুষটা আর মিথ্যাচার করতে পারে না। শুরু হয় ঈশ্বরীয় চেতনার বা আধ্যাত্মিক চেতনার বিকাশ। আমরা জানি বিকাশ দু'রকম। একটা হল—(১) বৃদ্ধি (growth) আর একটা হল (২) পরিস্ফুরণ (development)-যেখানে সংকোচনমূলক বিকাশ হয়।

বাহ্যচেতনার ক্ষেত্রে দুই ধরনের বিকাশই দেখা যায়। কিন্তু অন্তর্চেতনার বিকাশের ক্ষেত্রে শুধু এই development (পরিস্ফুরণ)-ই ঘটে। তখন নানান

জ্ঞান ত্যাগ হয়ে একজ্ঞানের গভীরতা বাড়ে। চেতনা আরও ঘনীভূত হয়। একেই চেতনার মানোন্নয়ণ (কোয়ালিটি বৃদ্ধি) বলে। আসলে চিত্তবৃত্তি নিরোধের দিকে অগ্রসর হওয়াই আত্মিক চেতনার বিকাশ। চিত্তের যেখানে বিকার নেই। আত্মা চিত্তকে পুরোপুরি অধিগ্রহণ করে। পরে আত্মা নির্গুণ আত্মা বা পরমাত্মায় পরিবর্তিত হয়। প্রাণশক্তি একেবারে finest form-এ পৌঁছে যায়। এটাই আত্মিক চেতনার বিকাশ।

একজন মানুষের মধ্যে এই চরম আত্মিক বিকাশ হলে পরবর্তীকালে তার চৈতন্য সত্তা হয়ে ওঠে অখণ্ড চৈতন্য সত্তা। বাকী মানুষ গুলির মধ্যে এই অখণ্ড চৈতন্যসত্তা ঐ মানুষটির রূপ ধরে প্রকাশ পায় এবং তাদের মধ্যে 'অনু" রূপে ঈশ্বরীয় চেতনার প্রকাশ ঘটান। তখন তাদের সূক্ষ্ম চিন্তা গতিয়মান হয়। শুরু হয় ঈশ্বরীয় চিন্তার মনন ও অনুশীলন। তখন তারা আত্মিক চেতনার আর একটি সমান্তরাল জগতে, পরাধর্মের জগতে প্রবেশ করে।

সমগ্র একটি রকেটকে যদি ঈশ্বরীয় চেতনার সঙ্গে তুলনা করা হয় তাহলে রকেটের self propelling সিস্টেমের জন্য রকেটের বিভিন্ন অংশ ত্যাগ হতে হতে গিয়ে সামনের সূক্ষ্ম অংশ কক্ষপথে স্থাপিত হয়। তেমনি ঈশ্বরীয় চেতনার বিকাশে নানা সংস্কার চলে যায়, প্রচলিত ঈশ্বর বিশ্বাস যা সংস্কারের একরূপ তা সরে যায় মাথা থেকে। যেমন মন্দির মসজিদ বা চার্চে ঈশ্বর থাকে, পুজো পাঠ, মন্ত্র, নামাজ, রোজা বা গীর্জায় প্রার্থনা ইত্যাদির দ্বারা ঈশ্বরকে পাওয়া যায়—ইত্যাদি চিত্তের বিকার চলে যায়। এছাড়া শাস্ত্রজ্ঞান জনিত অহং চিত্তে যে বিকার সৃষ্টি করে তাও ধীরে ধীরে চলে যায়। চিত্তে তার সত্তা পুরো প্রতিস্থাপিত হলে তাঁকে আপনসত্তা বোধ হয়। এরপর থেকে আরও সূক্ষ্মভাবে আমাদের ঈশ্বরীয় ভাবনার বিকাশ ঘটতে থাকে। চেতনার এই স্তরে যে বেদ উপনিষদকে মানুষ এতদিন পুজো করে এসেছে তাকেও অপ্রয়োজনীয় বোধ হয়।

মানুষ প্রথমে ঈশ্বরীয় চেতনার মধ্যে নানা জ্ঞান অন্তর্ভুক্ত করে ফেলে। চেতনার বিকাশের সাথে সাথে শুধু ঈশ্বর কী, একজ্ঞান কী তা জানার চেষ্টা করে। আত্মিকে সকলের এক সত্তা বোধ ও একত্বের চিন্তন ও উপলব্ধি গাঢ় হতে থাকে। বাইরে যেমন যাযাবর মানুষ যখন থেকে এক জায়গায় স্থায়ীভাবে বসবাস করতে লাগল তখন থেকেই তাদের সভ্যতার বিকাশ ঘটল ধরা হয় ঠিক তেমনি আত্মিকেও সংকোচন মূলক বিকাশ ঘটতে থাকলে তাকে প্রকৃত

অগ্রগতি বলা হয়। আর এই বিকাশের মূল লক্ষ্য হল আত্মিক একত্ব লাভ। কিন্তু চূড়ান্ত একত্বলাভের আগেও চেতনার বিকাশের কিছু সুফল পাওয়া যায়। যেমন, মানুষ প্রগতিশীল চিন্তা করতে পারবে, analytical brain হবে, কোনটি ঠিক, কোনটি ভুল তা ব্যাখ্যা করতে পারবে এবং মানবিক গুণসমূহ সূক্ষ্ম হতে সূক্ষ্মতর হয়ে কার্যকরী হয়, তেমনি মানব সভ্যতার বিকাশেও কার্যকারী ভূমিকা গ্রহণ করে।

● প্রসঙ্গ ঃ **চতুরাশ্রম—ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস**।

বাহ্যিকে চতুরাশ্রম সম্বন্ধে যে ধারণা প্রচলিত আছে তা সম্পূর্ণ ভুল। কেননা ব্রহ্মচর্য ঠিক ঠিক পালন করলে গার্হস্থ্য জীবন যাপন করা যায় না। গার্হস্থ্য জীবনে থেকে বানপ্রস্থ অবলম্বন অর্থাৎ গৃহত্যাগ করে জঙ্গলে গিয়ে বাস করা সম্ভব নয়। পরিশেষে বৃদ্ধ বয়সে সন্ন্যাস জীবন অবলম্বন অবাস্তব পরিকল্পনা।

শ্রীজীবনকৃষ্ণ বলেছেন, ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস—এই চার অবস্থাই তাঁর লাভ হয়েছে। যোগীর দৃষ্টিতে চতুরাশ্রমের আসল অর্থ যা সাধারণ মানুষকে ঋষিরা বলতে চেয়েছিলেন তা নিম্নরূপঃ

(১) ব্রহ্মচর্য—ঈশ্বর সম্বন্ধে জ্ঞান তথা স্বরূপকে জানার প্রথমধাপ। এই পর্বে আশ্রমে থেকে গুরুর কাছে শিক্ষা লাভ করতে হয়। শ্রীজীবনকৃষ্ণ তার দেহরূপ আশ্রমে সচ্চিদানন্দগুরু রূপে শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শন করলেন। তারপর থেকে শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন অনুধ্যান ও শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত পাঠই হল তার আধ্যাত্মিক জ্ঞান লাভের উৎস। ব্রহ্মচর্য অর্থাৎ ব্রহ্মচৈতন্যের উর্ধমুখী গতি বজায় রাখা—

—এই অবস্থায় জ্ঞান আহরণের ক্ষেত্রে রক্ষণশীল হবার কথা বলা হয়েছে। ব্যবহারিক জীবনেও সরল সাধাসিধে অনাড়ম্বর জীবনযাপন ও যতটা সম্ভব অপরিগ্রহ নীতি অবলম্বন করে চলতে হয়।

(২) গার্হস্থ্য — গার্হস্থ্য শব্দের অর্থ গৃহের পতি হওয়া। গৃহ হল এই দেহঘর। ঈশ্বরীয় জ্ঞান যা হল তা মননে ও দেহফুঁড়ে জেগে ওঠা দর্শন অনুভূতির অনুশীলনে মন সম্পূর্ণ অন্তর্মুখী হয় ও ঈশ্বরীয় জ্ঞান ঠিক ঠিক বোধগম্য হতে থাকে ও নিজের জীবন নিয়ন্ত্রণে আসে। সাধকের ব্যবহারিক জীবন সঙ্কুচিত হয়, আত্মিক জীবনের গভীরতা বাড়ে। বস্তুতত্ত্বে সাধন যার তার গার্হস্থ্য জীবন শুরু হয় নিজের মধ্যে জগৎ অনুভবে অর্থাৎ বিশ্বরূপ দর্শনে।

(৩) বানপ্রস্থ — বানপ্রস্থ মানে বনে যাওয়া নয়। বন বা জঙ্গল মানে এখানে আরণ্যক উপনিষদ, যা জঙ্গল থেকে বেরিয়েছে বলা হয়। গার্হস্থ্য জীবনে চেতনার মননে দেহারণ্য থেকে উদ্ভুত জ্ঞান—দেহজমি কর্ষণের ফলে যে ফসল পাওয়া যায় তাতে মায়া সম্পর্কে জ্ঞানলাভ হয় ও মায়া ত্যাগ হয়—ঈশ্বরত্ব লাভের আস্বাদন পাওয়া যায়।

(৪) সন্ন্যাস—বস্তুতত্ত্বে যখন সন্ন্যাস জীবন লাভ হয় তখন তিনি চেতনার বিক্ষেপ ঘটান জগতে। অন্যের মধ্যে অনুচৈতন্যের প্রকাশ ঘটে। অনুচৈতন্য লাভ হলে সাধারণ মানুষের প্রকৃত ব্রহ্মচর্য শুরু হয়। তারা তখন চেতনার ঊর্ধ্বমুখীনতা বজায় রাখার জন্য রক্ষনশীল হতে পারে অর্থাৎ যে কোন যোগ বিরোধী পরিবেশ থেকে নিজের মনকে সরিয়ে নিতে পারে। এরপর যখন তাদের আপনসত্তা বোধ হয় তখন গার্হস্থ্য জীবন শুরু হয়। তখন সাধকের ব্যবহারিক জীবন সংকুচিত হয় অর্থাৎ খণ্ডজ্ঞানের সংস্কার চলে যায়। অন্তর্মুখী হয়ে মনন করতে পারে।

তাদেরও বানপ্রস্থ জীবন শুরু হয় যখন আপনসত্তা বোধে বোধ করে। তাদের জীবনে মায়া ত্যাগ হয়—একত্বলাভের আস্বাদন করতে থাকে।

এই একত্ববোধ স্থায়ী হলে তাদের ২য় স্তরে সন্ন্যাস জীবন লাভ হয়। তারা তখন অপরের সঙ্গে এই একজ্ঞানের চর্চা করে জীবন কাটায়। মহাসন্ন্যাসীর একত্ববোধ দ্বারা পরিচালিত হয় ও জীবন পূর্ণতা পায়।

চতুরাশ্রমের ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস এবং চতুর্বর্ণের শূদ্রত্ব, বৈশ্যত্ব, ক্ষত্রিয়ত্ব ও ব্রাহ্মণত্ব একই কথা বোঝায়। বলা হয় পরম পুরুষ শ্রীবিষ্ণুর মুখ থেকে ব্রাহ্মণ, বাহু থেকে ক্ষত্রিয়, উরু থেকে বৈশ্য এবং চরণ থেকে শূদ্রের উৎপত্তি হয়েছিল। সব মানুষের জীবনের লক্ষ্য হল ব্রাহ্মণ হওয়া।

শূদ্রঅবস্থা ঃ মনের নমনীয়তা ও গতিশীলতা থাকবে। কোথাও গিয়ে প্রকৃত জ্ঞানী ব্যক্তির কাছে ঈশ্বরীয় কথা শুনতে হবে, জ্ঞান অর্জন করতে হবে। কেননা সে জানে যে, সে সব কিছু জানে না।

বৈশ্য অবস্থা ঃ প্রচলিত অর্থে ব্যবসা করে সম্পদ অর্জন করা যার কাজ। ব্যবসা করা মানে বিনিময় করা। জ্ঞানের বিনিময়ে জ্ঞান সুদৃঢ় হয়। মন পুরোপুরি অন্তর্মুখী হয়, বোঝে যা কিছু দর্শন অনুভূতি হয় তা দেহের ভিতরেই হয়। অপরের সাথে দর্শন অনুভূতি থেকে প্রাপ্ত জ্ঞান বিনিময় করে জ্ঞানের অনুশীলন করে। আত্মিক সম্পদ তথা জ্ঞান বৃদ্ধি পায়।

ক্ষত্রিয় অবস্থা ঃ মানুষ যখন ঐ সকল জ্ঞানকে কেটে একজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হয় তখন সে ক্ষত্রিয় হয়। প্রবল আত্মিক তেজে সে রজোগুণ নাশ ও নানাবিধ সংস্কার বর্জন করে শেষে মায়ার অতীত হয়। তখন নিজের জীবনকে নিজে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।

ব্রাহ্মণ অবস্থা ঃ সত্যে অধিষ্ঠান ও মুখনিঃসৃত বানীর দ্বারা অন্যের অন্তরে সত্যের ধারনা করিয়ে দিতে পারেন যিনি তিনি ব্রাহ্মণ। সুতরাং শূদ্রত্ব, বৈশ্যত্ব, ক্ষত্রিয়ত্ব, ও ব্রাহ্মণত্ব একই মানুষের জীবনে বিভিন্ন আত্মিক অবস্থাকে বোঝায়। ভিন্ন ভিন্ন বর্ণ বা জাতির ভাবনা এসেছে পরবর্তীকালে রাজনৈতিক ও সামাজিক নানা পরিবর্তনের ফল হিসাবে।

● প্রসঙ্গঃ **Esoteric condition (অভ্যন্তরীণ গূঢ় অবস্থা)**।

যে অবস্থায় প্রাণশক্তির বিকাশে কোন ব্যক্তি তার মধ্যে প্রকাশিত (revealed) বিশেষ জ্ঞানের বিষয়কে খুব গূঢ়ভাবে জানতে অর্থাৎ তার অভ্যন্তরীণ অর্থকে অনুধাবন করতে পারেন তাকে esoteric condition বলে। এই অবস্থায় তিনি সত্য জানতে পারেন।

কাশ্মিরী শৈববাদ অনুসারে esoteric condition এ সাধকের কাছে আত্মিক রহস্য উদ্ঘাটিত হয়। প্রথম esoteric condition পরমশিব অবস্থায় ''আমি কে'' এই রহস্য উদ্ঘাটিত হয়। এই সময় সাধকের দেহস্থ চৈতন্যশক্তি সহস্রারে পূর্ণমাত্রায় সংকলিত হয় ও আত্মারূপে দেখা যায়। সাধক শিবত্ব অর্থাৎ একের অস্তিত্বকে বোঝেন, উপলব্ধি করেন। সচ্চিদানন্দগুরু যে আত্মাকে দর্শন করিয়ে তাতে লীন হয়ে গেলেন সেই এক আত্মাই সত্য আর কিছু নেই।

এরপর শিবশক্তি অবস্থায় উপলব্ধি করেন এই আত্মার মধ্যেই জগৎ আছে। বিশ্বরূপ দর্শন হয়। এও এক esoteric condition.

পরবর্তী ধাপের esoteric condition এ অর্থাৎ স্থিতসমাধিতে সাধক উপলব্ধি করেন, আমি একাই আছি, আমিই জগৎ হয়েছি। এই মায়া আমারই সৃষ্টি। আমিই জগৎ তৈরী করেছি, আমিই সব, তাহলে ও জগৎ মিথ্যা নয়। জগৎ মিথ্যা হলে ব্রহ্মও মিথ্যা হয়ে যাবে। এই অবস্থায় সাধকের কাছে জগতের পার্থিব বিষয় মিথ্যা বলে বোধ হয়। কিন্তু বোঝেন জগৎ মিথ্যা নয়। উপলব্ধি হয়, সমস্ত জগৎ তার ভিতরে। সাধকের ক্ষেত্রে এই গুঢ় অভ্যন্তরীণ সত্যের উন্মোচনের অবস্থাকে বলা হয়েছে—'ব্রহ্মসত্য জগৎ মিথ্যা'র esoteric

condition. একেই সদাশিব অবস্থা বলা হয়েছে। সাধক তখন আত্মিকের সমস্ত বিষয়ে গূঢ় জ্ঞানের অধিকারী হন। কালে কালে তার প্রকাশ হতে থাকে।

শিশু কথা বলা শুরু করার আগেই যেমন তার ব্রেনে যথেষ্ট পরিমানে words stock হয়ে যায়। পরে তা একটু একটু করে প্রকাশ পায়। তেমনি সাধক স্থিত সমাধিতে সব জানলেও পরে পরে রহস্য ভেদ করতে করতে এগোন আর ততই দেহে আনন্দের স্রোত বইতে থাকে। একে perpetual bliss বলা হয়।

এরপর তার চৈতন্য ব্যষ্টির সীমা ছেড়ে জগৎব্যাপ্ত হয়, তিনি জগৎচৈতন্যে পরিবর্তিত হন। জগতের মানুষের মধ্যে তার চিন্ময় রূপে তার চৈতন্য প্রতিবিম্বিত হলে, তিনি একাই আছেন, জগৎ তার ভিতরে এই সত্য বহুমানুষের দর্শনে সমর্থিত হয়।

এই esoteric condition এর চরমসীমায় সাধক পৌঁছান যখন জগৎচৈতন্য একটি দেহে অধিগৃহীত ও নিয়ন্ত্রিত অবস্থায় পৌঁছায় অর্থাৎ সমষ্টি চৈতন্যের পূর্ণবিকশিত অবস্থা হয়। এই অবস্থাটি সম্পূর্ণ অপরিবর্তনীয় একটি অবস্থা। তিনি এই অবস্থায় সাধারণ মানুষের মধ্যে তার অনুচৈতন্য দান করে তাদের প্রাণশক্তির পরিবর্তন ঘটাতে শুরু করেন। তারা তখন তাকে আপন সত্তা রূপে অনুভব করে তার সঙ্গে একত্ব লাভ করে এবং এক অখণ্ড চৈতন্য সত্তাই আছে—এই সত্যে অধিষ্ঠিত হয়। এই অবস্থাকে ২য় স্তরে অভ্যন্তরীন গূঢ় অবস্থা বলা যায়। তারাও আত্মিক জগতের গূঢ় বিষয়ে জ্ঞানলাভ করে ও একজ্ঞানে অধিষ্ঠিত হয়।

● প্রসঙ্গ ঃ ব্রেনই আমাকে Control করে- শ্রী জীবনকৃষ্ণ।

আমরা জানি ব্রেনই মানুষকে Control করে সব বিষয়ে। স্থূল মস্তিষ্ক (physical Brain) থেকে মন বুদ্ধি ও আমিত্ব উদ্ভুত হয়। বুদ্ধি বিশেষ মাত্রায় জাগলে আমার আমিত্ব দিয়ে ঐ বুদ্ধিকে কাজে লাগাই, বলি ব্রেন খাটাচ্ছি। বস্তুত ব্রেনই আমাদের নিয়ন্ত্রণ করছে পরোক্ষ ভাবে।

জীব জন্তু পশুপাখীদের সব কাজ তাদের স্থূল ব্রেন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত (Biologically controlled) হয়। তাদের চিরন্তন বাহ্যচেতনা মানুষের মতো উন্নত মানের নয়।

বিজ্ঞানীরা যখন বুদ্ধি খাটিয়ে নতুন কিছু আবিষ্কার করে তার সুফল মানুষ পায় বটে তবে তার কিছু কুফলও থাকে কারণ সে ব্যক্তিবিশেষের আমি দিয়ে বুদ্ধিকে কাজে লাগাচ্ছে, খাটাচ্ছে। ভ্যাকসিন আবিষ্কারে মানুষের অনেক উপকার হল আবার এই নিয়ে নানা দুনীর্তি ও অন্যান্য ব্যাবসা হল যা বহু মানুষের ক্ষতি করেছে। বিজ্ঞান আমাদের

জীবনে যেমন আশীর্বাদ তেমনি আবার অভিশাপও বয়ে আনে। তার কারণ বিজ্ঞানীরা মানুষের ব্রেণ পাওয়ার বাড়াতে পারে না। ফলে তাদের কাজের naive action হয় মানুষের মধ্যে। মানুষ তার সুফলটা নেয় কিন্তু চেতনার নিরিখে গতানুগতিক ধারায় চলতে থাকে। বিজ্ঞানীর চিন্তন বা মননশীলতা লাভ করে না সাধারণ মানুষ।

কৃষি গবেষনায় ফসল উৎপাদন বেড়েছে কিন্তু আশানুরূপ (যা হওয়া উচিত) হয় নাই। কারণ নতুন নতুন প্রযুক্তি নতুন পদ্ধতিতে সেচের ভাবনা কৃষকেরা গ্রহন করেনি। সামান্য কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া। ঐ প্রযুক্তি বুঝে নিজেরা তাদের পরিবেশে উপযুক্ত নতুন প্রযুক্তির কথা চিন্তা করা তো দূর অস্ত, তারা নানা ঝুঁকির (Risk factor) কথা ভেবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে পুরোন ধারা অনুসরণ করে। "Oh My God" -নামে একটা সিনেমা প্রকাশ হল। তা দেখে সকলে ধন্য ধন্য করলো, সিনেমাটা ভালো বাজার করল। কিন্তু সেখানে মানুষের ধর্ম ভাবনার যে দিকগুলি যুক্তি দিয়ে অসার প্রমান করা হয়েছিল, আঘাত করার চেষ্টা হয়েছিল মানুষ সেগুলো নিয়ে ভেবে তাদের ধর্মাচরণের কোন পরিবর্তন ঘটালো না। তারা naive behaviour করল।

বিজ্ঞানীর ব্রেন যদি বিজ্ঞানীকে Control করত তাহলে তা অন্য দেরও ব্রেন পাওয়ার বাড়াতো। অন্যরা তার মননশীলতা লাভ করতো। তাদেরকে নিজের মধ্যে নিয়ে নিজের সাথে এক করে নেওয়ার মাধ্যমে।

আত্মিক চেতনা হল physical brain থেকে জেগে ওঠা উচ্চ বাহ্যচেতনার একটি পরিবর্তিত অন্তর্মুখী সূক্ষ্ম অবস্থা। এই অন্তর্চেতনার দ্বারা মানুষ Control হলে একত্ব হোক বা না হোক তাদের naive আচরণ দেখা যাবে না। তাদের সামাগ্রিক উন্নয়ন, মেধা নাড়ী জন্মানো ও প্রগতিশীল চিন্তার বিকাশ ঘটে। একজনকে বহু মানুষ অন্তরে দেখলে আত্মিক একত্ব স্থাপিত হয়। এর কোন অপকারীতা নেই। এতে শুধুই মঙ্গল হয়, আত্মিক চেতনার বিকাশের সাথে সাথে বাহ্যিক চেতনারও অগ্রগতি ঘটে। বাহ্যিক চেতনা বলতে ভালো অংক কষতে পারাকে বোঝায় না। বাহ্যিক চেতনা বাড়া মানে analysis করার ক্ষমতা বাড়া। সে naive আচরণ করবে না। যে কোনও কথার ঠিক ভুল যাচাই করে নিতে পারবে সে।

কোন মানুষের এই আত্মিক চেতনা যদি ব্যষ্টিতে আবদ্ধ থাকে যেমন আধ্যাত্মিক জগতের বিজ্ঞানী অবতার পুরুষ, তারও ব্যক্তি বিশেষের "আমি" থাকে। তাই সে বুদ্ধি খাটিয়ে নানা উপমার সাহায্যে ঈশ্বরীয় কথা মানুষকে বোঝায় অর্থাৎ সে ব্রেনকে খাটায়। অবতার নতুন কথা বলেন। তার সুফলও পায় জগৎ। কিন্তু মানুষের মধ্যে naive আচরণ দেখা যায়। মানুষের চেতনা জাগ্রত হয় না। যেমন শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, মানুষ কখনও গুরু হতে পারে না। সচ্চিদানন্দই গুরু, শ্রাদ্ধান্ন খেওনা, শিবজ্ঞানে জীবে দয়া,

যারা সমাজসেবা করে তারা ভক্ত নয়, আলাদা থাকের ইত্যাদি কথা। শ্রদ্ধার সঙ্গে মানুষ তাঁর কথা শুনে শ্রাদ্ধের অন্ন এড়িয়ে লুচিমিষ্টি খেতে লাগলো। শ্রাদ্ধ বন্ধ হল না। একজনকে গুরু ধরে তাকে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতিনিধি জ্ঞান করে তার কাছে মন্ত্র নিল। গুরুগিরির শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হল না। সকল মানুষের মধ্যে শিবের অধিষ্ঠান জেনে সকলকে ভালোবাসতে গিয়ে ভক্তের মধ্যে শিব দর্শনের ও তাকে জানার জীবন থেকে সরে গিয়ে সমাজসেবী হয়ে গেল। শ্রীরামকৃষ্ণকে, ভক্তের রাজার জীবনকে আদর্শ করে চলা হল না।

অবতারের তো বিক্ষেপিত জগৎ নেই। তাই তিনি নিজের চৈতন্যকে control করেন, নতুন কথা বলেন, নতুন দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন কিন্তু তার লোকশিক্ষা কার্যকরী হয় না। কিন্তু শ্রীজীবনকৃষ্ণ প্রথম থেকেই সংস্কারমুক্ত। তাই তার ব্রেণ তাকে control করেছে জন্ম থেকেই। তিনি যখন অবতারত্ব লাভ করলেন, তিনি নিজের অনুভূতির আলোকে রামকৃষ্ণ কথার দেহতত্ত্বে ব্যাখ্যা দিলেন। বুদ্ধি খাটিয়ে ঈশ্বরীয় কথা বোঝাবার চেষ্টা করেননি। পরে যখন তিনি জগৎ চৈতন্যের আধার হয়ে উঠলেন সেই জগৎ চৈতন্য তথা তার ব্রেন তাকে control করতে লাগলো। তখন তিনি দেখলেন, সকলে তার ভিতরে তার সাথে এক হয়ে আছে। তখন তিনি আর ব্যক্তিবিশেষ নন, জগৎচৈতন্য নিয়ন্ত্রিত । তার কথা ও কাজে আপানা হতে মনুষ্যজাতি তথা তার বিক্ষেপিত জগতের মানুষের brain-এ action হচ্ছে।

তার কথা বুঝতে পারছে নানা দর্শনের মাধ্যমে। ফলে তার কথার naive action হচ্ছে না। তিনি যখন বলেন, শ্রাদ্ধ মিথ্যা—আমরা শ্রাদ্ধ করতে বা শ্রাদ্ধান্ন খেতে পারি না। বিষয়টা বুঝতে পারি কখনও বা দর্শন-অনুভূতি দিয়ে বুঝিয়ে দেন। পূজা প্রসাদাদি মন্দিরের সংস্কারও ত্যাগ হয়ে যায়, আমার আমিকে গ্রাস করে অন্তর মধ্যে স্বস্বরূপ রূপে প্রকাশ পেলে । এমনকি আমাদের জীবনে তার না বলা অসংখ্য সংস্কারও চিহ্নিত করে ত্যাগ করতে পারি ।

আপনা হতে যে তার ব্রেনের চিন্তন দ্বারা নির্গুনের শক্তিতে আমরা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছি তা বুঝতে গেলে অনুশীলনে থাকা আবশ্যিক। জীবনকৃষ্ণও বলেছেন, আপনা থেকে সব হয়, তবে ভিতরে ভগবান আছেন তাকে প্রেমের দ্বারা ঠ্যাঙালে উৎসমুখী মননে তিনি বেরিয়ে পড়েন।

জগৎচৈতন্যের সব কথা সম্যক ধারনা করতে পারে না সাধারণ মানুষ। দেহবান ব্রহ্মের ব্রেন হতে তার বিক্ষেপিত জগতের মানুষের ব্রেণে তার মননশীলতা সঞ্চারিত হয়। তারা তাঁর অনুসত্তা লাভ করে। ফলে তারা তার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে আত্মিক একত্ববোধ লাভের দিকে অগ্রসর হয়। ইনি যেন আদিপুরুষ যিনি মানুষের প্রানশক্তির

গঠনের পরিবর্তন ঘটিয়ে ব্রেনে চেতনার স্তরের উত্তরণ ঘটান ও মানুষকে অতিমানস স্তরে পৌঁছে দিতে পারেন। প্রথমে দর্শন অনুভূতি দান করে নুতন কথা বোঝান, পরে অনুভূতি ছাড়াই উন্নত বোধের দ্বারা তারা তা বুঝতে সক্ষম হবে। আজকের সভ্যমানুষের চিন্তাভাবনা তখন বালখিল্য বলে মনে হবে।

● প্রসঙ্গঃ ভাবসমাধি ও Higher self

শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন, ভাব কিছু সত্য নয়। কোন প্রকার ভাবই সত্য নয় বটে তবে তাকে মিথ্যাও বলা যায় না। ভাবে থাকলে সত্যের পূর্ণ প্রকাশ হয় না। ভাব একপ্রকার সুসংস্কার (পজিটিভ সংস্কার) যা মানুষকে ভাবিয়ে ভাবের মধ্যে ভাব সমাধিতে রেখে দেয়। ভাবে থাকার নানা স্তর আছে। এর সর্বোচ্চ স্তর ভাব সমাধিতে থাকা। ব্যষ্টির সাধনে জড় সমাধি লাভ হলে সংযোগ সমাধি হয়, জীবাত্মা ও পরমাত্মার সমতা বোধ জাগে। ঈশ্বর সদৃশ (God like) একটি অবস্থা হয়। একেই ভাব সমাধি বলে। শ্রীরামকৃষ্ণের জড় সমাধি পূর্ণমাত্রায় না হলেও জড় সমাধি কী তা তিনি বুঝেছিলেন। যেমন কেউ দশ ক্লাশ পর্যন্ত পড়েছে। কিন্তু মাধ্যমিক পরীক্ষায় বসা হয়নি, সে মাধ্যমিক পাশের সার্টিফিকেট না পেলেও মাধ্যমিক কোর্সের সব বিষয়ে জ্ঞান লাভ করবে। তাই শ্রীরামকৃষ্ণ ঈশ্বরের ভাবে ভাবিত থাকতেন, অন্য অনেকে তা বুঝতে পারত। এটি কিন্তু ভক্তিভাব নয়। এটি ভাব-সমাধি। ঈশ্বরের ভাবে ভাবিত বা আচ্ছন্ন একটি অবস্থা। কিন্তু যেহেতু তার স্থিত সমাধি হয়নি তাই তিনি সত্যি সত্যিই ঈশ্বরে পরিবর্তিত হয়ে যাননি। তার higher self তাকে বলতে উদ্বুদ্ধ করত যে, "যে রাম যে কৃষ্ণ সেই ইদানীং রামকৃষ্ণ" অর্থাৎ তিনি ঈশ্বর বা ঈশ্বরের অবতার।

জড় সমাধি লাভ হলে সাধকের higher self জাগে। যার স্থিত সমাধি হয় তার ক্ষেত্রে higher self পূর্ণ পরিনত রূপ লাভ করে স্থিত সমাধিতে।

শ্রীজীবনকৃষ্ণের দেহে যোলো আনা জড়সমাধি প্রকাশ পেয়েছিল। তাই তিনি ভাবসমাধি সম্বন্ধে পূর্ণজ্ঞান লাভ করলেন, যেন মাধ্যমিক পরীক্ষা পাশের certificate পেলেন। পরে তার স্থিতসমাধি হওয়ায় তিনি ঈশ্বরে পরিবর্তিত হয়ে গেলেন। ফলে তাকে আর ঈশ্বরের ভাবে ভাবিত বা ভাবসমাধিতে নিমজ্জিত হয়ে থাকতে দেখা গেলো না।

ঈশ্বর দর্শনের পর ঈশ্বরের কথা বলার আদেশ হয়। সাধকের higher self এই আদেশ দেয়। স্থিত সমাধিবান জীবনকৃষ্ণের মনে হত higher self তাকে আদেশ দিচ্ছে যে বলো, আমি একাই আছি, আমিই জগৎ। কিন্তু তিনি সেই আদেশ অগ্রাহ্য করতেন। তার মনে হত কাকে লিখে বা বলে সত্য জানাবো? কাকে উদ্ধার করবো?

আমিই তো জগৎ। তাই পরবর্তীকালে "পাশ্চাত্য কাঁদছে আপনি দয়া করে সেখানে

গিয়ে তাদের উদ্ধার করুন" এই দৈববানী শুনে উনি পাশ ফিরে শুয়েছিলেন। ভাবলেন, জগৎ আমার। আমি মানুষকে তাদের স্বস্বরূপ দেখিয়ে আমার সত্তা দান করে তাদের কাছে টেনে নেব, আমি কেন জগৎ পর্যটক হতে যাব? এটা যে তার higher self নয়, তার lower self বলছে তিনি তা ধরতে পারলেন। যদি দশজন মাত্র লোক তাকে অন্তরে দেখে তাহলে ঐ দশজনই মনুষ্য জগৎ , বাকী মানুষেরা জীবমাত্র।

স্বঘোষিত ভগবানদের অনেক ভক্ত। কিন্তু তারা মানুষকে আত্মিক সত্তা দান করতে পারে না। তারা একজনকেও স্বস্বরূপ দেখাতে পারেনা। কারণ নিজেরা স্বস্বরূপের মূর্তরূপ হননি। সত্যমূর্তি হন নি।

স্থিত সমাধির অনেক পরে জীবনকৃষ্ণ ঈশ্বরীয় কথা লেখার আদেশ পেলেন এক স্বপ্নে। তিনি বই লিখতে শুরু করেও থেমে গেলেন। তার কাছে যে ১২/১৩ জন বন্ধু আসতো কথামৃত পাঠ শুনতে তারা প্রত্যেকেই যখন ঐ স্বপ্ন নির্দেশের সমর্থনে স্বপ্ন দেখল তখন উনি আবার লিখতে শুরু করলেন । ধর্ম ও অনুভূতির ২টি ভাগ লিখলেন। ১৩ বছর পর যখন ৩য় ভাগ লিখলেন তখন আর স্বপ্নাদেশের জন্য অপেক্ষা করলেন না। বহুমানুষের তাঁকে নিয়ে বিচিত্র দর্শন অনুভূতির কথা শুনে বুঝলেন তার বিক্ষেপিত জগৎকে সত্যের বৃহত্তর রূপ, বিশ্বব্যাপীত্বে প্রকাশিত এক ও একত্বের কথা ধরিয়ে দেওয়া দরকার। তিনি যখন জগৎ বিক্ষেপ করেন তখন ইচ্ছা জাগে কীভাবে কী রচনা করেছেন তা জানিয়ে দিতে। আবার যখন জগৎকে গুটিয়ে নেন ভিতরে তখন কিছু লিখতে ইচ্ছে করে না।

সমষ্টির সাধনে তিনি নির্গুনের ঘনমূর্তি বা সমষ্টি চৈতন্যে পরিবর্তিত হন, তিনি হন রাম—এক—তিনি বহু বাল্মিকী সৃষ্টি করে তাদের দিয়ে আত্মিক একত্বের রূপরেখা ও তার বিচিত্র প্রকাশ কাহিনী লেখান। তাদের জীবসত্তা (দস্যু রত্নাকর) থাকলেও তাদের চেতনায় নিজের চৈতন্য প্রতিস্থাপিত করে তাদের বাল্মিকী করে তুলে সকলের স্বস্বরূপ যে রাম (সমষ্টি চৈতন্য) তা উপলব্ধি করান। তারা ভগবান বাল্মিকী হয়ে অর্থাৎ ২য় স্তরে ঈশ্বরত্ব লাভ করে লেখেন রামায়ণ, যা তাদের দর্শন অনুভূতি ও উপলব্ধির কথা সাজিয়ে বহুত্বে একত্বের যে চিত্র ফুটে ওঠে তারই চিত্রায়ন।

মহাভারতেও বলা হল, ব্যাসদেব বলে গেলেন আর গণেশ লিখল। শর্ত হল বুঝে বুঝে লিখতে হবে। সাধারণ মানুষ, যারা জনগণের ঈশকে, সমষ্টি চৈতন্যকে বোধে বোধ করছে তারা সমষ্টি চৈতন্যের কথা যতটুকু বুঝবে ততটুকুই লিখবে।

ব্যষ্টির higher self বিশ্বব্যাপীত্বে বড়ো আমি হয়ে যায়। আর lower self অর্থাৎ তার ব্যক্তিসত্তা যা ভক্তসত্তা তা ক্ষীন হলেও একটু থেকে যায়, একে ছোট আমি বলে।

তাই শ্রীজীবনকৃষ্ণ ১৯৬৪ সালে এক দর্শনে দেখলেন, বড়ো আমি বলছে ছোট

আমিকে যে, তোর চা খাওয়া আমি বন্ধ করবো। শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল ও ভক্তিভাব প্রকাশ করে তার যে ব্যক্তিসত্তা সেটিই ছোট আমি। তাই জীবনের শেষ পর্যায়েও (১৯৬৬ সালে) তিনি বলছেন, আমার ছোট্ট ঠাকুরের পায়ে মাথা রেখে ঠাকুর ঠাকুর করে যেন চলে যেতে পারি। অর্থাৎ ছোট আমি সবসময় একটা গণ্ডীতে আবদ্ধ রাখতে চায়।

১৯১৮ সালে তার ভগবান দর্শন হয়েছিল। বহু পরে ১৯৫৭ সালের Nov -এ যখন 'মানুষ তাকে ভগবান রূপে দেখতে শুরু করেছে তখন একদিন স্বপ্নের মধ্যে শুনলেন শ্রীরামকৃষ্ণ যেন তাকে বলছেন, ভগবান দর্শনের কথা তোকে যদি কেউ জিজ্ঞাসা করে তাহলে বলবি, ঠাকুর কৃপা করে আমায় ভগবান দর্শন করিয়ে দিয়েছেন। শ্রীজীবনকৃষ্ণ ভাবলেন আহা বেচারী মানুষ, তুমি ভাবছ কেন? সে তো আমি বলবই। বেচারী শব্দেই বুঝিয়ে দিলেন এটি তার lower self তা তিনি বুঝতে পেরেছেন।

ব্যাষ্টির সাধন পর্বে higher self এর ক্ষমতা চূড়ান্ত। তার আদেশ সাধক মানতে বাধ্য। এ যেন রাজ্যের প্রশাসনে রাজ্যপালের ক্ষমতা। অপর পক্ষে বিশ্বব্যাপীত্বে বড়ো আমি Adjusted form এ অন্যের মধ্যে প্রকাশ পেয়ে ধাপে ধাপে অন্যদের আত্মিক চেতনা দান করে নিজের সর্বময় ক্ষমতা, spiritual controlling Power প্রয়োগ করেন। ঠিক যেন রাষ্ট্রপতির ক্রিয়া রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে।

সাধারন মানুষের ক্ষেত্রে lower self ও higher self কী এ বিষয়ে একটি ধারণা পাওয়া যায় শ্রাবন্তীর (ইলামবাজার, বীরভূম) একটি স্বপ্ন থেকে। ও দেখেছে— শ্রীজীবনকৃষ্ণ ওকে হত্যা করতে উদ্যত হয়েছে। এমন সময় শ্রীরামকৃষ্ণ ছুটে এসে ওনাকে বলছেন, ওকে মেরো না, ওকে মেরো না। এখানে শ্রীরামকৃষ্ণ তথা দ্রষ্টার ভক্তসত্তা হ'ল lower self আর জীবনকৃষ্ণ তথা দ্রষ্টার ভিতর আত্মিক একত্বদানকারী সমষ্টিচৈতন্যের অনুচৈতন্য, দ্রষ্টার higher self.

যাদের দর্শন অনুভূতি নেই তাদের ক্ষেত্রে জীবসত্তাই হল lower self এবং ভক্তিভাব বা দেবভাব যুক্ত সত্তাকে Higher self বলা যায় যা তাকে ঈশ্বরীয় চিন্তায় আকৃষ্ট করে।

● প্রসঙ্গ: মন চলে গেল রসকে মেথরের বাড়িতে, তাদের বাড়িতে সকলের ভিতর এক চৈতন্য বা কুণ্ডলিনী দেখলাম।" ...শ্রীরামকৃষ্ণ।

তথাকথিত সমাজের প্রচলিত মত মেথর খুব নিচুস্তরের মানুষ কারণ তারা মানুষের মল পরিষ্কার করে। কিন্তু তাদের মধ্যেও একই চৈতন্য আছে। ঠাকুর তার এই দর্শনের মধ্যে দিয়ে মানুষে মানুষে যে ভেদ নেই, সকলেই সমান, এই কথা বোঝাতে চেয়েছেন। তিনি বেশ্যার মধ্যে, দুষ্ট লোকের ভিতরেও মাকালীকে দর্শন করেছেন। এই ধরনের দর্শন ও তার শিক্ষার মধ্যে তন্ত্র সাধনার ভাবধারা লুকিয়ে আছে। ঠাকুর একসময় তন্ত্র

সাধনা করেছেন, তার প্রভাব পড়েছে। তন্ত্রে সামাজিক ভাবে নিচু স্তরের মানুষদেরকে উচুঁস্তরের মানুষদের সমান গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। বৌদ্ধ ধর্মেও এ বিষয়টি লক্ষ্য করা যায়। মার্তণ্ড জাতকে আছে কোন এক জন্মে বুদ্ধদেব একজন চন্ডাল হয়ে জন্মগ্রহন করেন এবং ভালো কাজের মাধ্যমে ও উচ্চ ভাবনার দ্বারা বোধিসত্ত্ব লাভ করেন। এছাড়া মা, মা করা, সকলের মধ্যে জগন্মাতাকে দেখা তন্ত্র সাধনার অঙ্গ।

মাতৃ পূজা তন্ত্রেই আছে। বেদে কোন পূজা নেই।

অতীতে ধর্মাচার্যরা মানুষের মধ্যে সমানত্ব বা equality-র কথা বলতে চেয়েছেন। মহম্মদ বলেছেন সকল মুসলমান ভাই ভাই। মহাপ্রভু বললেন, 'যে জন কৃষ্ণ ভজে সে হয় আমার প্রাণ রে।' এই বলে আচন্ডালে কোল দিলেন। আসলে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ধর্মগুলিতে মানুষে মানুষে এত ভেদ এবং একই ধর্মের বিভিন্ন মানুষের মধ্যে এত ভেদাভেদ দেখে ধর্মাচার্য বা ধর্ম সংস্কারকরা সমন্বয়ের একটা ঝাপসা ধারনা দিতে চেয়েছেন। কিন্তু equality বা সমানত্ব আসলে ধর্মবিরোধী কথা। সকল মানুষ সমান বললে Parallel বহু entity স্বীকার করতে হয়। কিন্তু ধর্মে বহু entity থাকতে পারে না। আছে এক। তাই ধর্ম unity বা Oneness-এর কথা বলে। প্রতিটি মানুষ আত্মিকে এক- identical.

তাই স্বামীজি নিজেকে সংশোধন করে বললেন, Vedanta formulates not the universal brotherhood but universal Oneness. Equality হয় শর্ত সাপেক্ষে। কিন্তু identical -এর কোন শর্ত নেই। যেমন সাধারণভাবে বলে দেওয়া হয় যে সব ধর্মেই একই কথা আছে। আদপেই কি তারা সব ধর্মগ্রন্থ পড়েছেন? বেদে যা লেখা আছে কোরানে কি তাই-ই লেখা আছে? বাইবেল, দ্বাদশ অঙ্গ, আদিগ্রন্থ, ত্রিপিটক-সব গ্রন্থে কি একই কথা বলা হয়েছে? বেদে যে পুরুষ যজ্ঞের কথা আছে তা অন্য কোন ধর্মগ্রন্থে নেই।

তাহলে একটা শর্ত আরোপ করে বলছে যে সব ধর্মে একই কথা বলেছে। যেমন, সব ধর্মে মিথ্যা কথা বলতে ও চুরি করতে বারন করেছে। মানুষকে ভালোবাসতে ও সেবা করতে বলেছে। ঈশ্বরের নামে কাজ শুরু করতে বলেছে।

আবার ত্যাগের শর্ত আরোপ করে বলেছে যে গীতা, দ্বাদশ অঙ্গ, আদিগ্রন্থ, কোরান, মহাভারত ইত্যাদি সব গ্রন্থেই ত্যাগের ধর্মের কথা বলেছে। কোরানে আছে প্রিয়বস্তু আল্লাকে উৎসর্গ করতে আপন সন্তানকেই জবাই করেছিলেন হজরত ইব্রাহিম। আল্লার আশীষে পুত্র প্রাণলাভ করে ও তার জায়গায় একটি দুম্বা জবাই হয়েছে দেখে। অনুরূপ কাহিনী মহাভারতেও আছে। কর্ণ তার পুত্র বৃষকেতুকে কেটে ব্রাহ্মনবেশী ইন্দ্রকে খেতে দিলেন তার মাংস ব্রাহ্মনেরই ইচ্ছা অনুসারে। কারন পুত্রই ছিল তার প্রিয়তম বস্তু। তখন ইন্দ্র নিজের স্বরূপ প্রকাশ করে কর্ণের পুত্রকে জীবিত করে দেন ও কর্ণের ত্যাগের

প্রশংসা করেন। তাই বলে কি কোরাণে যা আছে মহাভারতেও তাই আছে বলা যাবে?

কিন্তু Oneness-এ কোন শর্ত নেই। কেননা আত্মিকে এক অখন্ড চৈতন্য সত্তাই আছে। আমরা সকলে সত্তাহীন অস্তিত্ব মাত্র। ঐ অখণ্ড চৈতন্যই তথা সমষ্টি চৈতন্যই আমাদের সকলের আপন বৃহৎ সত্তা—এই উপলব্ধিতেই একত্ববোধ। এই একত্বে কোন শর্ত নেই। সূর্যের দুটি রশ্মি এক। তা কি কোন শর্ত সাপেক্ষ? না। দুটি রশ্মির-ই সত্তা এক। তেমনি সকল মানুষের সত্তা এক। মানুষের সঙ্গে মানুষের এই একত্ব তথা আত্মিক অভিন্নতা উপলব্ধিই ধর্ম।

সামাজিক ধর্মগুলিতে দেখা যায় যে পোষাক, ধর্মাচরণ, ধর্মবিশ্বাস ইত্যাদি বিভিন্ন দিক থেকে মানুষে মানুষে ভেদ সৃষ্টি করা হয়েছে। হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, শিখ, জৈন, বৌদ্ধ ইত্যাদি পরিচয়ে মানুষকে ভূষিত করা হয়েছে কতকগুলো বাহ্যিক আচরণগত শর্তসাপেক্ষে। তা নাহলে তাদের মধ্যে ভেদ থাকার কথা নয়। সকলেই মানুষ- তথা মানহুঁশ। তাহলে শর্তসাপেক্ষে ভেদ সৃষ্টি করে আবার সমানত্বের কথা বলা ধর্ম কথা নয়, লোকচক্ষে মহৎ সাজার প্রচেষ্টা মাত্র।

ঠাকুরের দর্শনটির আরও একটু গভীরে যাওয়া যেতে পারে। এক চৈতন্য বা কুন্ডলিনী বলতে ঠাকুর কি দেখেছিলেন? ঐ কুণ্ডলিনীর রূপ কানার হাতি দেখার মতো বিভিন্ন জনের কাছে বিভিন্ন হতে পারে। কেউ জ্যোতি দেখতে পারেন, এই জ্যোতিকেও নানাভাবে দেখা যেতে পারে, কেউ ইষ্টমূর্তি দেখেন যেমন, কালী, রাম, কৃষ্ণ, যীশু ইত্যাদি।

শ্রীরামকৃষ্ণ দেখেছিলেন, জ্যোতি রূপে। এর থেকে বোঝা যায় তিনি আংশিক চৈতন্যকে দেখেছিলেন অর্থাৎ সগুন ব্রহ্মের এলাকার মধ্যে আটকে ছিলেন। যার জন্য তিনি বলেছেন, তোমরা যাকে ব্রহ্ম বলো আমি তাকেই মা বলি। কবীর বলেছেন, নির্গুণ মেরা বাপ, সগুণ মাতৃত্তয়ারী। মা হলেন, সগুন ব্রহ্ম। রসকে মেথরের পরিবার যদি ঠাকুরকে দেখতো তাহলে ঠাকুরের চৈতন্য তাদের মধ্যে ক্রিয়া করতো, তবে তাতে তাদের. ব্রেন পাওয়ার বাড়তো না। কারণ ঠাকুরের চৈতন্যের গতি ছিল সগুণে সীমাবদ্ধ। তিনি নির্গুনের পরিচয় পাননি। তাই বলেছেন, নির্গুনের সঙ্গে আলাপ চলে না। তাই তিনি সর্ব সংস্কারমুক্ত হলেন না এবং অপর কাউকে সংস্কারমুক্ত করতে পারলেন না। এটি নন এরিয়ান (Non-aryan) ব্রেনের লক্ষন।

শ্রীজীবনকৃষ্ণ নির্গুণব্রহ্মে লীন হয়ে পুরুষে পরিবর্তিত হয়েছেন। এরপর নিজেকে বিক্ষেপ করেছেন জগতে। তাই জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে অসংখ্য মানুষ তাকে দেখেছে পুরুষ বা আদি পুরুষ রূপে। এতে তাদের ব্রেন পাওয়ার বেড়েছে। সংস্কার কাটিয়ে জীবনকৃষ্ণের নতুন চিন্তাধারা গ্রহন করতে পারছে। তাদের ব্রেনও এরিয়ান ব্রেন হয়ে উঠেছে। তাই একত্বের ধর্ম তারা উপলব্ধি করতে পারছে। তারা যেন সমাজের

উচ্চস্তরের মানুষ হয়ে উঠছে। হোক তার বাহ্য পরিচয় হাড়ি, ডোম, মেথর বা সামাজিক কর্মের দিক থেকে উচ্চস্তরের মানুষ। রামকৃষ্ণ মেথরের মধ্যে কুন্ডলিনী দেখার ফলে মেথরের কিন্তু ব্রেন পাওয়ার বাড়ল না। একত্বের ধর্ম বুঝতে সে অক্ষম অর্থাৎ ঈশ্বরীয় ভাবনার দিক থেকে সে নীচুস্তরেই থাকল। তার ব্রেন, নন-এরিয়ান ব্রেন হয়েই থাকলো। এই দর্শনে শুধু সমানত্বের এক ঝাপসা কথা আমরা পেলাম।

ধর্মাচার্যরা বহু ভালো কথা বলতে পারে। শুনে মনে হবে অনেক উচ্চস্তরের কথা বলছেন। কিন্তু তাদের মূল বক্তব্য সামাজিক সাম্যের কথা যা আধ্যাত্মিক দিক থেকে ভুল কথা। এদের নন-এরিয়ান ব্রেন। আধ্যাত্মিক কথা আমরা প্রথম শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে পেলাম। তবে তিনিও সগুন ব্রহ্মের কথা বললেন। সগুনের সীমা ছাড়িয়ে নির্গুণ ব্রহ্মের কথা বলতে পারেন নি। সেখানেও এরিয়ান ব্রেনের প্রকাশ দেখা গেল না। ''মা, মা'' করে একটা ভাবনার মধ্যে আটকে গেলেন। এক জ্ঞানের কথা বললেন না। আমি কে? আমার সঙ্গে জগতের মানুষের সম্পর্ক কী? এসব প্রশ্নের সমাধা হল না তার জীবনে।

জীবনকৃষ্ণও ''ঠাকুর, ঠাকুর'' করেছেন। কিন্তু তা রামকৃষ্ণের ''মা মা''- করার সমতুল্য নয়। কারন তিনি নির্গুনে লীন হয়ে পুরুষে পরিবর্তিত হয়েছেন। বিশ্বব্যাপ্ত হয়ে সবার মাঝে নিজেকে দর্শন করেছেন। তাদের দর্শন শুনে আমরা যদি ঠাকুর বলতে ষষ্ঠভূমির ইষ্টমূর্তি, তথাকথিত ঠাকুর দেবতা বুঝি তাহলে তা শ্রীরামকৃষ্ণের মতো মা মা করাই হলো। আর যদি ঠাকুর বলতে জগৎ চৈতন্যকে (বিশ্বমানব জীবনকৃষ্ণকে) বুঝি তাহলে তা আর্যকৃষ্টি।

আর্যরা ধর্ম বলে না, বলে কৃষ্টি। অর্থাৎ ব্রেন কর্ষনের ফলে প্রাপ্ত উন্নত বোধ দ্বারা পরিচালিত জীবন। আর্য শব্দের অর্থ চাষী, যারা জমি কর্ষণ করে কৃষিকাজ করতে জানে। এদেশে এসে এদের কৃষিকাজ দেখল এবং তার উন্নতি ঘটালো, জমির পুনর্ব্যবহার করতে শেখালো। জনক দুহিতা সীতাকে বিয়ে করল। তাকে নিয়ে গেল রাবণ শ্রীলঙ্কায় অর্থাৎ আর্যাবর্তের বাইরেও সুদুর দাক্ষিণাত্যে তাদের কৃষিশিক্ষা ছড়িয়ে পড়ল। অনুরূপভাবে আর্যরা নির্গুন ব্রহ্মের প্রসন্নতা লাভে চিন্তন ও পূনর্চিন্তনের মাধ্যমে অর্থাৎ ব্রেন কর্ষণের মাধমে একজ্ঞান তথা মানুষে মানুষে আত্মিক অভিন্নতা উপলব্ধি এবং সেই বোধে জীবন যাপনের কৃষ্টি ছড়িয়ে দিয়েছিল। কিন্তু অনুশীলনের অভাবে কালক্রমে তা হারিয়ে যায়।

এযুগে আদিপুরুষ রূপে জীবনকৃষ্ণকে দর্শন করে আমাদের ব্রেন পাওয়ার বাড়ছে। ভাষান্তরে এরিয়ান ব্রেন লাভ করে ''চরৈবেতি'' মন্ত্রে আমরা উদ্বুদ্ধ হচ্ছি। এই এগোনোর প্রধান নীতি হল মনন—দ্বন্দ্বমূলক অধ্যাত্মবাদ। নন-এরিয়ান ব্রেণ যাদের তারা বাইরে সমানত্বের ধর্মে আটকে যায়। আর ধর্মগুরুদের এই সাম্যের কথায় সমাজে পরিবর্তন আসে না। সামাজিক সাম্য আসে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক নানা পরিবর্তনের মাধ্যমে।

তবে প্রকৃত মহাপুরুষ একত্বের অনুভূতি দান করে মানুষের ব্রেন পাওয়ার বাড়িয়ে বাইরেও সমানত্বের দৃষ্টিভঙ্গী (Sense of equality) জাগান। আর তখনই ধর্মের নামে শোষণ ও প্রতারনা বন্ধ হতে পারে।

● প্রসঙ্গ: জিতেন বাবু ছেলের পৈতের সময় জীবনকৃষ্ণ ও তার ২/৪ জন ভক্তকে নেমন্তন্ন করেছিলেন। সেদিন তাঁর ঘরে আগত ৭০/৮০ জনকে তিনি পাঠিয়ে দিলেন পৈতে বাড়ীতে। প্রশ্ন হ'ল পৈতে একটি সংস্কারজ ধর্মীয় অনুষ্ঠান হওয়া সত্ত্বেও উনি কেন সকলকে সেখানে যেতে বললেন?

দেখা যায় এ জাতীয় অনুষ্ঠানে উপস্থিত মানুষদের বেশির ভাগই সংস্কারের সমর্থক হয়ে থাকেন। তাদের উপস্থিতি সংস্কারের অনুকূল পরিমণ্ডল গড়ে তোলে। আবার যদি সংস্কার বিরোধী মানুষদের ভীড় বেশি হয় তাহলে পরিবেশ পাল্টাতে থাকে। তাদের নিজেদের মধ্যে আলোচনা নতুন এক পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারে। যা পরবর্তীকালের জন্য সংস্কার বর্জিত পরিবেশ সৃষ্টির সহায়ক হয়। এক্ষেত্রে সেই ব্যাপারটি হয়েছিল। তাই দেখা গেল পরে তার এক অনুরাগী উপেন মুখার্জী তার ছেলের পৈতে না দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন।

বিষয়টি একটি ঘটনার সঙ্গে তুলনীয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় প্রথমে ফ্রান্স জার্মানীকে সন্ধির প্রস্তাব দেয়। জার্মানী সেই প্রস্তাব ফিরিয়ে দেয়। কিন্তু পরবর্তীতে জার্মানী বেকায়দায় পড়ে সন্ধি-প্রস্তাব পাঠালে ফ্রান্স সশস্ত্র সেনাবাহিনী নিয়ে সন্ধিস্থলে হাজির হয়। সেনাবাহিনীর বহর দেখে জার্মানী সহজেই বুঝতে পারে যে এক্ষেত্রে ফ্রান্স কোন আপোস (compromise) করতে আসে নি। তারা তাদের নিজস্ব মত স্পষ্ট করে জানাতে এসেছে।

শ্রীজীবনকৃষ্ণ ঠাট্টা করে অনেক সময় তার সঙ্গীদের সৈন্য সামন্তের সাথে তুলনা করতেন।

এই আপোসহীন অবস্থা স্পষ্ট রূপ পায় পরবর্তীকালে সমষ্টি চৈতন্যের প্রকাশে। সংস্কার ভিতর থেকে নাশ করে তিনি আত্মিক তেজ দান করে এই সংস্কারহীন, আপোসহীন মনের অবস্থা বজায় রাখেন।

স্মৃতিচারণ

স্মৃতিচারণ

শ্রীজীবনকৃষ্ণের পুতঃসঙ্গ লাভে ধন্য কিছু মানুষের টুকরো কিছু স্মৃতিকথা এখানে উল্লেখ করা হলো।

চারু ভট্টাচার্য

১. জীবনকৃষ্ণের ঘরে যারা আসতেন তাদের মধ্যে অনেকেই তখন একাদশী করতেন শুনতাম। একাদশীর দিন হঠাৎ আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, হ্যাঁরে, চারু, তুই একাদশী করিস নাকি? আমি বললাম, না। উনি খুশী হয়ে বললেন, হ্যাঁ বাবা, ধর্মের জন্য কিছুই করবি না।

২. আমাকে তিনি কোনদিন ঘরে কথামৃত পাঠ করতে বলেননি। এ নিয়ে আমার মনে ক্ষোভ ছিল। বহু প্রতীক্ষার পর তিনি একদিন সুযোগ করে দিয়েছিলেন। এই সুযোগ আসার সঙ্গে পাঠচক্র জড়িয়ে আছে। প্রসঙ্গটা গোড়া থেকেই বলি। জহরলাল নেহেরু 'ডিসকভারি অফ ইন্ডিয়া' তে একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করেছেন। জহরলালকে, তার এক ফরাসি বন্ধু আন্দ্রে ম্যালরো জিজ্ঞাসা করেছিলেন, আচ্ছা, বুদ্ধ তোমাদের দেশের লোক, তার এত বড় ধর্ম তার নিজের দেশের লোক গ্রহন করলো না, বিদেশীরা তা সাদরে গ্রহন করলো। তোমাদের দেশে এমন কি আছে যা এত বড় ধর্মকে ডিসকার্ড করলো? আন্দ্রে ম্যালরো ছিলেন ফরাসি মন্ত্রিসভার এক বিশিষ্ট মন্ত্রী। পরবর্তীকালে তিনি যখন ভারত ভ্রমনে আসেন এই প্রসঙ্গ কদমতলার ঘরে ওঠে। শ্রী জীবনকৃষ্ণ ক্ষিতিশদা প্রমুখকে বলেছিলেন, তোরা কি কলম বিহীন হোলি, তোরা কি লিখতে জানিস না? কালচারাল হেরিটেজ অফ ইন্ডিয়া হচ্ছে, ''অহম্ ব্রহ্মাস্থি।'' বুদ্ধের ধর্ম ব্রহ্ম বা ভগবানের সম্বন্ধে নীরব। তোরা তোদের অনুভূতি দিয়ে, এখানকার কথা দিয়ে উত্তরটা দিয়ে দে।

এই ঘটনার পর থেকে আমি অনেক পণ্ডিত এবং জ্ঞানীগুণী ব্যক্তিদের সহিত যোগাযোগ করি এবং অনেককে তার কাছে নিয়ে যেতেও সক্ষম হয়েছিলাম। এছাড়াও ধর্ম ও অনুভূতি পাঠ করার জন্য বিভিন্ন ধর্ম সংস্থার সহিত যোগাযোগ করি। প্রথম ডাক আসে গীতাভবন থেকে। পাঠ করেন শ্রী জিতেন্দ্রনাথ চ্যাটার্জী। ক্রমে ক্রমে পাঠ চক্রের সংখ্যা বৃদ্ধি পেল। কিন্তু আমার পাঠের সুযোগ হয় না।

হিমাংশু দাস এণ্টালিতে এক ভদ্রলোকের বাড়িতে পাঠ করতো। কি একটা কারণে হিমাংশুর পাঠে যেতে অসুবিধা হয়। শ্রীজীবনকৃষ্ণ আমাকে ডেকে বললেন, দ্যাখ চারু, তুই ওখানে পাঠ করবি। মনে মনে ইচ্ছা থাকলেও আমি প্রথমে ঘাবড়ে গেলাম। সেদিন ছিলো রবিবার। পাঠে যাবার আগে তাকে প্রণাম করতে গেলাম। ঘরে ঢুকতেই তিনি আমাকে ডেকে যিনি কথামৃত পাঠ করছিলেন তার পাশে বসতে বললেন। একটা পরিচ্ছেদ শেষ হলে আমাকে বললেন, তুই পাঠ কর। দু-চার লাইন পাঠ করেছি, এমন সময় ধীরেন দা—শ্রী ধীরেন্দ্রনাথ রায় ওনাকে জিজ্ঞাসা করলেন, ও পাঠ করছে কেন? তিনি উত্তর দিলেন, চারু আজ পাঠে যাবে কিনা তাই। সেই থেকে পাঠ সমানে চলছে। পরে এক সময় বলেছিলেন, যেখানেই পাঠ করতে যাস বাবা, গৃহস্থকে বলিস, এই পাঠ শ্রবণে গৃহস্থের মহান কল্যাণ ও শান্তি। এই পাঠ চালিয়ে যাবি।

বঙ্কিমচন্দ্র চক্রবর্তী

এক সময় জীবনকৃষ্ণকে নিয়ে প্রায় প্রতিদিনই এক একজনের একেক বিশেষ অভিজ্ঞতা হতো। একটা বিশেষ ঘটনার কথা মনে পড়ছে। শিবদাস মুখোপাধ্যায় নামে একজন কদমতলার ঘরে যাতায়াত করতেন। ১৯৫৫ সালের এক রবিবারের ঘটনা। সেদিন শিবদাস কদমতলার বাস থেকে হাওড়া স্টেশনে নেমে পুল পার হবার সময় দেখেন শ্রীজীবনকৃষ্ণ আগে আগে যাচ্ছেন। জীবনকৃষ্ণকে দেখে তিনি তাড়াতাড়ি তার পা দুটি ধরে বললেন, এই আপনাকে কদমতলার ঘরে দেখে এলাম। আপনি এরই মধ্যে কি করে এখানে চলে এলেন? পা ধরা অবস্থাতেই তার চমক ভেঙ্গে গেল। তিনি দেখলেন যার পা ধরে আছেন, তিনি শ্রীজীবনকৃষ্ণ নন। একজন পথিক মাত্র। শিবদাসের কাণ্ড দেখে পথিক অবাক হয়ে গেছেন। আশ্চর্য হয়ে তার দিকে তাকিয়ে আছেন। এদিকে শিবদাস অপ্রস্তুত। খুব লজ্জায় পড়ে গেছেন।

কদমতলার ঘরে এসে শিবদাস পুরো বিষয়টা আমাদের কাছে নিবেদন করলেন। আমরা সকলেই হাসতে লাগলাম। জীবনকৃষ্ণ ঘটনাটি শুনে সহাস্য বদনে বলতে লাগলেন, বাবা তুমি তোমার নিজের ভিতর দর্শন করছিলে। বাইরে যেই আরোপ করেছো, অমনি গোলযোগ সৃষ্টি হয়েছে। আমরা সকলেই সেদিন শিবদাসের অবস্থা দেখে মুগ্ধ হয়ে গেছিলাম।

অনাথনাথ মন্ডল

১. একদিন বিকালে জীবনকৃষ্ণের কাছে গেছি। তিনি খাটে বসে আছেন। নিমাই কীর্তন করছিল। কীর্তন শুনতে শুনতে জীবনকৃষ্ণ মাঝে মাঝে ভাঙা গলায় গাইছেন

ও কখনো সমাধিস্থ হচ্ছেন। তাঁর শরীরে ভাব-মহাভাবের পুলক প্রকাশ পাচ্ছিল এবং তার তলপেট দধিমন্থনের মতো ঘুরে ঘুরে দুলছিল। নিমাই খাটের এক কোনে বসে চন্ডীদাস, বিদ্যাপতির পদাবলী গেয়ে চলেছেন। তারও শরীর ভাবস্থ। নগেনবাবুকে দেখলাম তিনি চেয়ারে বসে মুদ্রিত নেত্রে শরীর দোলাচ্ছেন ভাবে। কীর্তন সমাপ্ত হলে তিনি কথামৃত খানা মাথায় ঠেকিয়ে আমাকে পাঠ করতে দিলেন। কয়েক পাতা পড়ার পর যখন এক জায়গায় পড়ছি, 'অসতো মা সদগময়, তমসো মা জ্যোতির্গময়, মৃত্যুর্মা অমৃতংগময়, উনি পাঠ থামিয়ে জনৈক ভক্তকে প্রশ্ন করলেন, ও মশাই আপনাকে তো আপনার অফিসের ডিরেক্টররা lawyer বলেন। আপনি 'মৃত্যোর্মা অমৃতংগময়' কথাটাকে attack করুন। প্রশ্ন শুনে তিনি তার শরীর সামনে পিছনে দোলাতে দোলাতে এক রকম উত্তর করলেন। উনি শুনে বললেন, ওকে কি বলে জানেন, petitio principi (begging the question), অর্থাৎ আমি প্রশ্ন করেছি, আবার সেই প্রশ্নই আমাকে করা। খালি ঘরে বসে বসে ছেলেপিলের বাপ হবেন, উত্তর দেবেন কি করে? তিনি এই কড়া কথা শুনে ভাবে হাত পা ছুঁড়ে কেঁপে উঠলেন। জীবনকৃষ্ণ ওই দেখে বলে উঠলেন, থাক থাক, খুব হয়েছে, আর দেখাতে হবে না। শেষকালে আমার চেয়ারটা কি ভাঙবেন নাকি? এই বয়সে আর চেয়ার তৈরী করতে পারবো না। তিনি নিজেই ওই কথার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বললেন, আরে মশাই ও কথার জবাব বিদ্যাসাগর মশায়ের প্রথম ভাগে আছে—'অজ'। 'অজ-নিত্য শাশ্বত,' আমার জন্মই হয়নি, তার আবার মৃত্যু কি? অমৃত কি?

২. ফেলুবাবু বলে জীবনকৃষ্ণের কদমতলার ঘরে একজন আসতেন। তিনি সেদিন একটু রাত করে এলেন। ঘরে ঢোকা মাত্র জীবনকৃষ্ণ তাকে খাটে বসার জন্য ইঙ্গিত করলেন। ফেলুবাবু খাটে মাথা ঠেকিয়ে তারপর উঠে বসলেন। উনি জিজ্ঞাসা করলেন, ফেলুদা আপনার সংবাদ কি? ফেলুবাবু বললেন, আজ সকালে বাড়ি থেকে বেরিয়ে একটা কুদৃশ্য চোখে পড়ার আগেই দেখছি আপনি সেই দৃশ্যকে আড়াল করে আমার চোখের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। তখন ভাবলুম, সকালে উঠে যখন আপনার দর্শন পেলুম, নিশ্চয়ই আজকের দিনটা ভালো কাটবে। সকালে এসে ও কথা বলে যাব ভাবলুম। কিন্তু কাজের গতিকে আর আসতে পারলুম না। উনি ফেলুবাবুর কথার সুর ধরে বলে উঠলেন, 'প্রভাতে উঠিয়া ওমুখ হেরিনু দিন যাবে আজি ভালো।' না মশাই, আপনার সে জিনিস নয়। আপনার দেহ সবসময় যোগযুক্ত। ওই কুদৃশ্য দেখে পাছে আপনার যোগ- বিচ্যুতি ঘটে, তাই আপনার দেহস্থ ভগবান আমার রূপ ধারণ করে আপনার দৃষ্টি পথে উদয় হয়ে আপনার দেহকে রক্ষা করলেন।

ঋষিদের যুগে আত্মা এইরকম করে তাদের দেহকে পরিচালনা করতো। একথা বলেই তিনি সমাধিস্থ হয়ে গেলেন।

৩. জীবনকৃষ্ণের সঙ্গকারী ধীরেন রায়, যাকে জীবনকৃষ্ণ 'আমার পণ্ডিত মশাই' বলে সম্বোধন করতেন তিনি চাকরিতে বড় প্রমোশন নিয়ে দিল্লি চলে যান। সেখানে যাওয়ার আগে জীবনকৃষ্ণকে বিষয়টি জানালে তিনি বলেছিলেন, 'দ্যাখ, আমি তো বাবা অত বড় চাকরি দিতে পারবো না।' ধীরেনবাবুর কিন্তু বড় পদে চাকরি নিয়ে জীবনকৃষ্ণের স্থূল সঙ্গ করা বন্ধ হলো। এর কিছুদিন পর রতনদার ভগ্নিপতি সুধাংশুদা একটি স্বপ্ন দেখেন। কদমতলার ঘরে এসে তিনি জীবনকৃষ্ণকে বললেন, 'আমি স্বপ্নে দেখছি, ধীরেনদা যেন আপনার জন্য কাঁদছেন।' জীবনকৃষ্ণ শুনে বললেন, তুই কি ভেবেছিস যে হয়তো আমি মরে যাব, তাই ধীরেন কাঁদছে? ওরে না, আমি এখন টপ করে মরছি না। দৈববাণী করে আমায় জানিয়ে দিয়েছে আমার নতুন জীবন আরম্ভ হবে। এই স্বপ্নে দেখাচ্ছে যে যারাই এইখান থেকে অর্থাৎ আমার সঙ্গ থেকে দূরে সরে আছে তাদেরই অন্তরটা ওইরকম করে কাঁদে। ওরে ডাইরেক্ট সঙ্গটাও দরকার।

অতীন্দ্র গোপাল সিংহ রায়

১৯৬৩ সালে জীবনকৃষ্ণ যখন পুরীতে ছিলেন আমি ওনার সাথে কিছুদিন কাটিয়েছিলাম। সেই সময়ের অনেক কথাই মনে পড়ে। ওই সময়ে এক বিকালে জীবনকৃষ্ণ আমাদের আলেকজান্ডার সম্পর্কে ছোট্ট একটি ঘটনা বলেছিলেন।

আলেকজান্ডার তখন গ্রিসের রাজা। রাজা গর্ডিয়ান একটি গ্রন্থি দিয়ে বলেছিলেন যে, যে এই গ্রন্থি খুলতে পারবে সে রাজ চক্রবর্তী হবে। এই গ্রন্থির নাম Gordian knot. এই গ্রন্থি খোলা খুব শক্ত। আলেকজান্ডার অস্ত্রের সাহায্যে সেই গ্রন্থি কেটে দিলেন। আলেকজান্ডার গ্রন্থি কাটলেন বটে কিন্তু তিনি রাজ চক্রবর্তী হতে পারেন নি। এই কথা বলেই জীবনকৃষ্ণ যোগের বিষয়ে ঢুকে গেলেন। বললেন, দ্যাখ, এই কথা যে আত্মিকের কথা, ওটা আগে কেউ জানতো না। আজ আমরা বুঝতে পারছি। গর্ডিয়ান নট খোলা মানে চিৎ-জড়-গ্রন্থি ভেদ হওয়া। আর এই চিৎ-জড়-গ্রন্থি ভেদ হলে তবেই লোকটা রাজ চক্রবর্তী হতে পারে। তবে এটি হতে হবে আপনা হতে, চেষ্টা করে নয়।

জিতেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

আমরা যারা জীবনকৃষ্ণের ঘরে যেতাম তাদের বেশিরভাগই ছিলাম বিবাহিত। ঠাকুর রামকৃষ্ণের কামিনী কাঞ্চন ত্যাগের আদর্শের কথা শুনে নিজের ক্ষুদ্রতার কথা

বুঝতে পারতাম। ঘরে একদিনের আলোচনার পর মনের সেই হীনমন্যতা দূর হয়েছিল।

জীবনকৃষ্ণ বললেন, ঠাকুর বলছেন, কামিনী কাঞ্চন ত্যাগ না করলে হবে না। Oh! then what did he come here for? ঠাকুর এমন কথা বললেন যা করা কোন মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। মানুষের পক্ষে প্রযোজ্য না হলে সে কথার মূল্য কি? আমি কি কখনও এসব কথা বলেছি? For any day? any time? any moment? No– never! এই কথা বলে তিনি আমাদের এক মজার গল্প শোনালেন।

এক পাঠশালে এক পণ্ডিতমশাই পড়াতেন। তার অভ্যাস ছিলো ছেলেদের অংক দিয়ে একটু ঘুমিয়ে নেওয়া। ছেলেদের অংক কষতে যেটুকু সময় লাগতো তার মধ্যে তিনি একটু ঝিমিয়ে নিতেন। এখন ছেলেরাও একটা মতলব করলো। পণ্ডিত মশাই অংক দিয়ে ঝিমোবার উদ্যোগ করছেন, আর ছেলেরাও তাড়াতাড়ি অংক কষে নিয়ে হাজির। পণ্ডিত মশাই তো গেলেন রেগে। বললেন, দাঁড়া ব্যাটারা, এবার এমন অংক দেবো যে তোদের বাপ-চোদ্দপুরুষও সে অংক কষতে পারবে না। গল্পটা শেষ করেই বললেন, তা ঠাকুর আমার হলেন সেই পণ্ডিত মশাই এর মত। তিনি এমন কথা বললেন, যে চৌদ্দ পুরুষে কখনো কেও মেনে চলতে পারবে না।

ওরা মানুষের Common frailty-কে আঘাত করে মানুষকে কাবু করে দেয়। আমি কি কখনো এই ধরনের কোন কথা তোদের বলেছি? ভণ্ডুল একদিন আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিল, দাদা 'ব্রহ্মচর্য কি?' সে অনেকদিন আগেকার কথা, তখন সে গেরুয়া পড়েনি। আমি তাকে বলেছিলুম, দ্যাখো ভন্ডুল, ব্রহ্মচর্য ব্রহ্মচর্য করে ব্রহ্মচর্য হবে কিনা জানি না, কিন্তু যদি ভগবান ভগবান করো তবে ভগবান হয়ে যাবে।

মুরারী মোহন দে

একবার জীবনকৃষ্ণ তাঁর ঘর বন্ধের সময় আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন। ডাক পেয়ে তাঁর কাছে গেছি। উনি আমার কুশল সংবাদ নেওয়ার পর বললেন, ধর্মকথা রাখ, আজ কি খাওয়া দাওয়া করেছিস বল। আমি যা খেয়েছি তাই বললাম। এরপর আমাকে বললেন, আমার স্বপ্নে একটা দৈববানীর মানে কর, 'আদর্শবাদের ফল ফলবে।' আমি বলতে পারলাম না। উনি কি একটা বলেছিলেন তা আজ আমার আর মনে নেই।

ওর কাছে গিয়ে ভিতরে অদ্ভুত পরিবর্তন অনুভব করতাম। একবার ওর কাছ থেকে ফিরবার সময় ট্রাম থেকে নামতে যাচ্ছি। জাগ্রত অবস্থায় দেখছি সবকিছু চৈতন্যময়। কোথায় পা ফেলব ঠিক করতে পারছি না। এই অবস্থাটা দু-তিন দিন ছিলো।

মানিক (৭৯ সংখ্যা)

ভূমিকা

ভগবান মানুষ হয়ে আসেন একথা ঠিক নয়। এতে ভগবান সম্বন্ধে কল্পনা চলে আসে। আসলে মানুষ ভগবান হয়। মানুষ জন্মায় ভগবান হবার জন্য।

এই কথাটা অবশ্য একজনের ক্ষেত্রেই খাটে। কারণ এই মানুষটিই সমগ্র মনুষ্যজাতি। বাকী সকল মানুষ জন্মায় তার সাথে আত্মিক একত্বলাভের জন্য, সে অবস্থায় অবশ্য তাদেরকেও ২য় স্তরে ভগবান বলা যায়।

১ম স্তরে ভগবান হওয়ার লক্ষণ হল জাতিধর্মবর্ণ নির্বিশেষে অসংখ্য মানুষের মধ্যে তার চিন্ময় রূপ ফুটে উঠবে স্বপ্নে ধ্যানে বা জাগরণে। কিন্তু ভগবান হওয়ার এটাই একমাত্র লক্ষণ নয়। তাহলে কেউ বলবেন, স্বঘোষিত ভগবান রবিশংকরকেও তো বহু মানুষ স্বপ্নে দেখে। কিন্তু চেতনার উত্তরণে এই স্বপ্নগুলির কোনও ভূমিকা দেখা যায় না। এগুলি ফ্রয়েডের তত্ত্ব দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায়। যিনি প্রকৃতই ভগবান হয়েছেন তাঁর চিন্ময় রূপ অন্তরে দেখে সাধারণ মানুষের প্রাণশক্তির গঠনের পরিবর্তন হয়, একজ্ঞান লাভের পথে চেতনার ঊর্ধ্বমুখী যাত্রা শুরু হয়। মানুষের আত্মিক জীবনের সূচনা হয়। অন্যথায় এক কোটি মানুষও যদি কাউকে ভিতরে দর্শন করে তাকে ব্রহ্ম বলা যাবে না।

তাই জীবনকৃষ্ণ বললেন, Truth Comes from reverse. Reverse কথাটিকে তিনভাবে দেখা যায়। (১) Reverse কথার মানে হল যা খণ্ডন করে, যার রহস্য ভেদ করে সত্য জানা যায়। চেতনার স্থিতিশীল পরিবর্তনে ভগবান বা পরম এক হয়ে ওঠা যায়। এখানে reverse হ'ল তার দর্শন ও অনুভূতি। ধাপে ধাপে ধারাবাহিক সাধনে (Self evolution-এ) নানান দর্শন অনুভূতি লাভ ও নেতি নেতি করে এগিয়ে যাওয়া। দ্বন্দ্বমূলক আধ্যাত্মিক মনন বা একজ্ঞান অভিমুখী বিশ্লেষণ তাকে চরম সত্যে পৌঁছে দেয়। (২) Reverse এর দ্বিতীয় মানে হ'ল— চেতনার অগ্রগতির অভিমুখ—যে চিন্তায় আমরা চলেছি দর্শন সাপেক্ষে ঐ চিন্তার গতিধারার পরিবর্তন হয় ও সত্য জানতে পারি। এটা কিছুটা Reverse mathematics-এর সাথে তুলনীয়। কোন একটা স্বতঃসিদ্ধ (axiom) ধরে রেখে প্রমাণের দিকে এগোন নয় বরং backward process-এ বা অন্য

কোন ভাবনায় প্রমাণে পৌঁছানো যা পুরানো স্বতঃসিদ্ধকে পরিবর্তন করে নতুন সিদ্ধান্তেও পৌঁছে দিতে পারে।

যেমন, জীবনকৃষ্ণ একসময় রামকৃষ্ণময় হয়ে উঠেছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ আত্মিকে যা করতেন উনি তাই করতে ও ভাবতে লাগলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ জগন্নাথের আট্‌কে প্রসাদ খেতেন বলে উনিও খেতেন। রামকৃষ্ণ একাদশী করতে বলেছেন, তাই উনি করছেন। এই স্বতঃ চিন্তার গতিপথ পরিবর্তন (reverse) করে দিল তার একটা দর্শন।

তিনি একদিন স্বপ্নে দেখলেন, ছবিতে রামকৃষ্ণের চোখ থেকে চশমা খুলে পড়ে গেল। তিনি তা ধরতে গেলেন কিন্তু ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেল। এর সোজাসুজি মানে করে তিনি বুঝেছিলেন যে তিনি এখন রামকৃষ্ণময়, তিনি অবতারত্ব লাভ করেছেন। আর তার চশমা পরার দরকার হবে না। সত্যি সত্যি বাইরে আর চশমা পরার দরকার হয়নি।

কিন্তু reverse thinking তার দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন ঘটালো। উনি বুঝলেন, রামকৃষ্ণের ভাবনা সবটা ঠিক নয়। তার চশমায় আর আত্মিক জগৎ দেখা ঠিক নয়। ধীরে ধীরে রামকৃষ্ণের ভাবনা থেকে সরে এসে নিজের ভাবনা দ্বারা চালিত হতে লাগলেন। যেমন নিউটনের গতিসূত্রকে স্বতঃসিদ্ধ ধরা হত। পরে আইনস্টাইন অন্যভাবে ভেবে (Reverse Thinking করে) প্রমাণ করলেন ওর মধ্যে সামান্য ভুল আছে। তার সংশোধন দরকার। রামকৃষ্ণ যে স্বতঃসিদ্ধ দিয়েছিলেন তার কিছু কিছু সূক্ষ্ম সংশোধন করে জীবনকৃষ্ণ নতুন স্বতঃসিদ্ধ দিলেন। এটা কি বাইরে থেকে কেউ বলল? না। ভিতরের ঐ দর্শন ধরে দ্বন্দ্বমূলক আধ্যাত্মিক মননের মাধ্যমে উনি জানলেন ।

আবার উনি একবার দেখলেন, বিছানায় ৪/৫ ফোঁটা মধু পড়ে গেল। মনে হল বিছানার চাদর নোংরা হয়ে যাবে। হাত দিয়ে মুছতে গেলেন কিন্তু পুরো চাদরটা মধুতে আপ্লুত হয়ে গেল। তখন মনটা খারাপ হয়ে গেল। কিন্তু জেগে উঠে reverse Thinking-এ নতুন চেতনায় পৌঁছালেন। ব্যাখ্যা করলেন, মধু মানে চৈতন্য—তার একত্বের চেতনায় জগৎ (বিছানা) আপ্লুত হবে। তাঁর জগৎব্যাপীত্ব লাভ হবে। হাত দিয়ে মোছা মানে গভীরভাবে মনন বা অনুশীলন করা। এই ধরনের বিশ্লেষণ রিভার্স ইঞ্জিনীয়ারিংয়ের সঙ্গে তুলনীয় (reverse-এর ৩য় অর্থ)। যেমন, একটি finish product কে ভেঙে তার root-এ পৌঁছানো, কিভাবে তা নির্মাণ করা হয়েছে সেই রহস্য উদ্ঘাটন করা, তেমনি দর্শন

অনুভুতির উৎসমুখী মননে যে নির্গুণ থেকে ওই দর্শন সমূহ সৃষ্টি হয়েছে সেই নির্গুণের রহস্য উদ্ঘাটিত হয়। বস্তুতত্ত্বে যার সাধন তিনি তার ভিতরের দর্শন থেকে reverse Thinking করে চেতনার সকল স্তর ও সকল দিক সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা লাভ করেন। এই সত্যে পৌঁছে তিনি অন্যের দর্শন থেকে বা নিজস্ব দৈববাণী থেকে আগত নির্দেশকে reverse Thinking-এর মাধ্যমে অগ্রাহ্য করতে পারেন।

যেমন হরেন বাবু এক স্বপ্নে শ্রীরামকৃষ্ণের কাছ থেকে জীবনকৃষ্ণের পা পুজো করার নির্দেশ পেলেন। স্বপ্ন শুনে জীবনকৃষ্ণ বললেন, ‘‘বাইরে আমার পা পুজো করলে আমার আত্মিক গতি রুদ্ধ হয়ে যাবে। অপরপক্ষে আমার চৈতন্যের গতি যা ক্রমে জগৎব্যাপ্ত হয়েছে, যার দ্বারা মনুষ্যজাতিকে আমি আত্মিকে আমার সঙ্গে এক করে নিয়েছি তা মনন করলে, প্রকৃত পা পুজো করা হবে।’’

আবার ‘‘পাশ্চাত্য কাঁদছে, আপনি দয়া করে সেখানে গিয়ে তাদের উদ্ধার করুন’’— এই ধরনের দৈববাণীও তিনি অগ্রাহ্য করেছেন। বলেছেন, ভগবান, তোমার জগৎ, তুমি কাঁদাচ্ছ তাই তারা কাঁদছে। তুমি পাশ্চাত্যকে নিয়ে এসো না এখানে তাহলেই ল্যাঠা চুকে যায়। এই বলে পাশ ফিরে শোয়াটাও reverse thinking-এর ফল।

তবে একথা ঠিক যে একটা দর্শন হলেই পরক্ষণে তার অর্থ বোঝা যায় না। মননের জন্য সময় দিতে হয়। পরে সত্যে পৌঁছানো যায়। স্থিত সমাধি থেকে নেমেই কি সাধকের উপলব্ধি হয় যে আমি একাই আছি? না। স্থিত সমাধিতে প্রথমে আমি নেই বোধ হয়। পরে তুমি (ঈশ্বর) আছো, তুমিই কর্তা-জ্ঞান হয়। তত্ত্বজ্ঞান হয়। আমি তুমিতে পরিবর্তিত হয়। আবার ওই তুমি আমিতে পরিবর্তিত হয়। তুমি না, আমি একাই আছি— এই একজ্ঞান হয়ে বোধের লয় হল মানে বোধ সম্পূর্ণতা পেল। এটাই প্রকৃত reverse যা থেকে পুর্ণ অদ্বৈতে পৌঁছান সাধক। স্থিত সমাধির এই জ্ঞান আত্মীকরণ হতে সময় নেয় প্রায় আড়াই থেকে তিনমাস।

এরপর অবতার তত্ত্বে, আমি একাই অছি এই বোধ আরও স্পষ্ট হয়। তবে এই বোধ আরও দৃঢ়তা পায় বিশ্বব্যপীত্বে। এই একবোধে কুটিচক হয়ে থাকাই ভগবান হওয়া। তখন তিনি মনুষ্যজাতির মধ্যে নিজেকে বিক্ষেপ করে তাদের

মুখ থেকে নিজের ভগবান হওয়ার কথা শোনেন। এটাকে broader sense-এ বলা যায় যে truth comes from reverse. তবে এর পরিণত অবস্থা লক্ষ্য করা যায় যখন তিনি সমষ্টি চৈতন্যে পরিবর্তিত হয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে অনু চৈতন্য দান করেন এবং সাধারণ মানুষ তাকে আপন সত্তা হিসাবে উপলব্ধি করে ঘোষণা করে যে তিনি একাই আছেন। তাদের প্রাণশক্তির গঠনের পরিবর্তন ঘটে ও বহু বিচিত্র স্বপ্নের মাধ্যমে আত্মিক জগতের রহস্য, নির্গুণের রহস্য, ক্রমে উন্মোচিত হয়। তারাও reverse thinking-এর মাধ্যমে অন্তরে তাঁর হাত যে আজও মধু মুছে চলেছে তা অনুভবে এক বোধে স্থিত হবার অভিমুখে এগোতে থাকে।

৭ই জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩০

পরিবেশন

● গত 23-03-2023-এ স্বপ্নে দেখছি—শ্রীজীবনকৃষ্ণ আমাদের বাড়িতে এসেছেন। পরনে সাদা ধুতি আর পাঞ্জাবী। আমার স্বামী ও শ্রীজীবনকৃষ্ণ দুপুরের খাবার খেতে বসেছেন আর আমি ওনাদের খাবার পরিবেশন করছি। ওনারা পাশাপাশি বসেছেন, গল্প করছেন, হাসছেন আর খুব তৃপ্ত হয়ে খাবার গ্রহণ করছেন। শ্রীজীবনকৃষ্ণ বললেন, ভালো করে হাত ধুয়ে খাবার দে।.... তীব্র আনন্দ নিয়ে ঘুম ভাঙল।

— **রমা হাটি**
বোলপুর

ব্যাখ্যা— যুগপৎ বাইরের স্বামী ও অন্তরের স্বামী ভগবান জীবনকৃষ্ণকে খাবার যোগাতে (পরিবেশন) হবে অর্থাৎ দ্রষ্টাকে স্বামীর সঙ্গে আধ্যাত্মিক অনুশীলনে ও আপন অন্তরে ঈশ্বরীয় মননে থাকতে বলা হচ্ছে।

● 22-03-2023-এ দেখছি—আমি আর বন্‌শী (বংশী) একসাথে শুয়ে আছি আমার খাটে। হঠাৎ দেখি একটি রাক্ষস যার বড় বড় দাঁত, সবুজ ল্যাজ আর লাল শিং আমার আলমারী থেকে বেলুন বের করে কামড় দিয়ে ফাটিয়ে দিচ্ছে একের পর এক। বেলুন আমার খুব প্রিয়, তাই খুব কষ্ট পাচ্ছি। তখন বন্‌শী উঠে পুলিশকে ফোন করে এবং পুলিশ রাক্ষসটাকে খাঁচায় পুরে মারতে মারতে নিয়ে গেল। তারপর আমি খাটের দিকে তাকিয়ে দেখি সাদা ধুতি ও ফতুয়া পড়ে এক বুড়ো লোক, মাথায় অল্প চুল, বসে রয়েছেন। মনে হল উনি জীবনকৃষ্ণ। আমি এই প্রথমবার জীবনকৃষ্ণকে স্বপ্নে দেখলাম।

—**অভিস্মিতা ব্যানার্জী**
বয়স-চার
পাটনা, বিহার

পদ্মদিঘি

● স্বপ্ন দেখছি (14.04.2023)— ৭ই জ্যৈষ্ঠ অফ্‌লাইনে পাঠ হবে আর সেখানে একটা ছবি দেখানো হবে। সেই ছবিটা স্নেহময় জেঠু আমাকে আঁকতে বলল। ছবিটা এই রকম—একটা জলাশয়। সেখানে অনেক পদ্মপাতা ও পদ্মফুল রয়েছে। সূর্যের আলো ঐ জলাশয়ে পড়ছে। সূর্যের রঙ হাফ্ বয়েলড্ (boiled) ডিমের কুসুমের মতো। সূর্যের reflection টা জলে পড়ায় পুরো জলের রঙই ঐ half boiled ডিমের কুসুমের মতো হয়ে গেছে— এই ছবিটা আঁকতে হবে।...... ছবিটা আঁকা হয়ে গেছে। ৭ই জ্যৈষ্ঠের অনুষ্ঠানে এবার জেঠু ছবিটা সবাইকে দেখাচ্ছে। ছবিটা হাতে ধরে সবাইকে দেখানোর সময় ছবিটার ব্যাখ্যা করছে। অনেক কথা বলছে। তবে যেটুকু আমার মনে আছে তা হ'ল—"এই যে পাল বংশ আর সেন বংশের পতন...।" তারপর আরও কিছু কথা হল সেগুলো আমার মনে নেই। স্বপ্ন ভেঙে গেল।

—প্রকৃতি ব্যানার্জী
জামবুনি,বোলপুর

ব্যাখ্যা—অনেক পদ্ম = অসংখ্য অবতার সৃষ্টি করবেন।
প্রভাত সূর্য = জগৎ চৈতন্য।
স্নেহময় জেঠু = সমষ্টি চৈতন্য।
পাল বংশ ও সেন বংশ = বিভিন্ন ঘরানার ধর্মভাবনার প্রতীক।
যেমন, শঙ্করের অদ্বৈত বেদান্ত, রামানুজমের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, কর্তাভজা, রামকৃষ্ণ মঠের ঘরানা, শাক্তধর্ম, বৈষ্ণব ধর্ম, ব্রাহ্ম ধর্ম ইত্যাদি।

● 29-3-2023 এ রাতে শুয়ে পাঠের কথা ভাবতে ভাবতে দেখছি—অনেকজন মিলে আমরা একটা জায়গায় বসে আছি। হঠাৎ দেখি একজন ষণ্ডামার্কা লোক একটি মেয়েকে তুলে নিয়ে যাচ্ছে। তার পরনে লাল বেনারসী শাড়ি। সবাই অবাক হয়ে দেখছি। আমি বললাম, মেয়েটি তো জয়। পাশের মেয়েটি জিজ্ঞেস করলো, জয় কে? আমি বললাম, "ও ক্রিয়াশীল সমষ্টি চৈতন্য।"... নিজের কথা শুনে নিজেই অবাক হয়ে গেলাম।

— কল্পনা রায়
ইলামবাজার

ব্যাখ্যা— হঠাৎ দেখি = হঠাৎ সিদ্ধের অবস্থা।
ষণ্ডামার্কা লোক = জগতের সাধারণ মানুষ যাদের ব্রেন পাওয়ার বেড়েছে ও একত্ব লাভের জন্য ব্যাকুলতা জেগেছে।
ক্রিয়াশীল সমষ্টি চৈতন্য = সমষ্টি চৈতন্যের অনুচৈতন্য।

সাসারাম

● গত ২৮ শে জানুয়ারী, ২০২৩, স্বপ্নে দেখছি— জয়ের বিয়েতে সুমন চট্টোপাধ্যায় এসেছেন। তিনি জয়কে একটা কবিতা উপহার দিতে চান। জয়দের বাড়ির দরজার কাছে চেয়ারে বসে কবিতাটা লিখছেন। দীর্ঘ এক ছন্দোবদ্ধ কবিতার প্রতি দুলাইনের দ্বিতীয় লাইনটা লেখা আছে। উনি আগের লাইনটা লিখছেন। ধুতি পাঞ্জাবী পরিহিত সুমন বাবুকে অপরূপ সুন্দর লাগছে। জয় ওনার পাশে দাঁড়িয়ে লেখাটা দেখছে একমনে। ওনার হাতের লেখাটি একেবারে মুক্তাক্ষর।... ঘুম ভাঙলো।

— **বরুণ ব্যানার্জী**
বোলপুর

ব্যাখ্যা—সুমন = সমষ্টি চৈতন্য।
জয় = দ্রষ্টার অনু চৈতন্য।
কবিতা = ঈশ্বরতত্ত্বের ঘনীভূত ছন্দোবদ্ধ রূপ— এখানে ধর্ম ও অনুভুতি গ্রন্থ, জীবনকৃষ্ণের দর্শন সমূহ ও তার উপলব্ধির কথা।
আগের লাইনটা লিখছেন = Reverse Thinking করে জীবনকৃষ্ণের অমৃতবাণীর উৎসভাবনা ধরার ক্ষমতা দান করছেন।।

● দেখছি (26.04.2023)— আমার পুরোন স্কুলে গেছি। আগে স্কুলের পাশে একটা মন্দির ছিল সেটা দেখছি এখন স্কুলের বাউণ্ডারির ভিতরেই রয়েছে। মন্দিরটা ইস্কনের মন্দিরের আদলে গড়া। রঙ সাদা, তার ভিতরে সিমেন্টের রঙের দুর্গামূর্তি। তার উপরের অংশটা দেখা যাচ্ছে— গঠন কাঠপুতুলের মতো-বেশ লম্বা। মনে হল এর কোন বিজ্ঞানভিত্তিক কারণ আছে। পরক্ষণে মনে হল এটা বিজ্ঞানী সাসারামের তৈরী।... ঘুম ভাঙল।

— **শাশ্বতী পাল**
বোলপুর

ব্যাখ্যা—পাঠচক্ররূপ প্রকৃত বিদ্যামন্দিরে অন্তর্মুখী হয়ে আমরা এখন ব্রহ্মবিদ্যার পাঠ লাভ করছি। এই বিদ্যামন্দিরে সূক্ষমনে ঈশ্বরের ধারণাকে কংক্রীট (স্থায়ী) রূপ দিচ্ছেন এক অধ্যাত্ম বিজ্ঞানী— যিনি সমষ্টি চৈতন্য। যিনি এক আবার বহু—সহস্ররাম (সাসারাম)। তিনি ক্রিয়াশীল হয়েছেন।

গঠন কাঠ পুতুলের মতো— কাঠকাঠ ভাব— স্থায়ী সূক্ষ্মমন গড়া চলছে।

মন্দির ইসকনের আদলে— সর্বজনীন ঈশ্বরীয় চেতনার (international Krishno Consciousness) ভাবধারার প্রকাশ সেখানে।

পেঙ্গুইন

● দেখছি (জুলাই ২০২৩)–একটা সমুদ্রের মাঝখানে কিভাবে পড়ে গেছি। সেখানে ঘুর্নিঝড়ে জল ঘুরপাক খাচ্ছে। মাঝে মাঝে পায়ের তলায় একটা জাহাজ ঠেকছে। পরক্ষনে বোধ হচ্ছে নিচে কিছু নেই—খুব ভয় পাচ্ছি। ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ পাড়ের দিকে এসে পড়েছি। সেখানে বালিতে কনুইয়ে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়ালাম। তখন গা থেকে একটা নীল পেঙ্গুইন পাখীর খোলস খুলে নিচে পড়ল । ওটা কিন্তু জীবন্ত। ও আমাকে ঢেকে রেখেছিল, তাই আমি ভিজে যাইনি বা জলে ডুবে যাইনি। তারপর তীরে উঠে এলাম। এক ভদ্রমহিলা বলল, তুমি খুব বুদ্ধিমতী ও ভাগ্যবতী। এবার রাস্তা দিয়ে হাঁটছি। রাস্তটা চেনা কিন্তু দুদিকে শুধু আমের দোকান, কারখানা। সবাই আম ও আমের তৈরী নানা জিনিস খাচ্ছে। আম ছাড়া কিছু নেই যেন!

—সান্ত্বনা চ্যাটার্জী
বেলঘড়িয়া

ব্যাখ্যা — সমুদ্র— ভবসুমদ্র। পায়ের তলায় জাহাজ ঠেকছে, পরক্ষণে নেই= কাউকে কাউকে ধর্ম জগতে বড় মানুষ বলে মনে হয় পরে বোঝা যায় এরা ধর্ম দান করতে পারে না। নীল পেঙ্গুইন— সমষ্টি চৈতন্য। তিনি দ্রষ্টার চেতনাকে আবৃত করে থাকায় দ্রষ্টার চেতনা বিষয় জলে সিক্ত হয়নি। সংসার চিন্তায় ডুবে যায়নি। খোলস খুলে পড়ল = এক সত্তা বোধ হ'ল। ভদ্রমহিলা = অনুচৈতন্য লাভ কারী মানুষদের জগৎ। বুদ্ধিমতী ও ভাগ্যবতী— যে সংসারে থেকেও ঈশ্বরকে পেতে চায়। ঈশ্বরীয় চর্চায় একের চেতনায় যে চলে সে সৌভাগ্যবতী। চেনা রাস্তা কিন্তু সর্বত্র আম- এই চেনা জগৎ-ই ঈশ্বরময় বলে উপলব্ধি হয় সূক্ষ্মমনের মননে।

● দেখছি (16.06.2022) আমাকে একটা বিশাল সাপ তাড়া করে আসছে। কাছে এসেই মুখটা হাঁ করে স্থির হয়ে গেল। তখন তার মুখের ভিতর থেকে একটা সরু কালো সাপ বেরিয়ে এল। আর আমাকে জিভ দিয়ে চাটতে লাগলো। আমার কিন্তু ভয় করলো না।... —**সঞ্চিতা চ্যাটার্জী**

বোলপুর

ব্যাখা---বিশাল সাপ---সমষ্টিচৈতন্য। সরু ছোট সাপ---অনুচৈতন্য। সমষ্টিচৈতন্যের ভিতর থেকে তার অনুচৈতন্য বেরিয়ে এসে দ্রষ্টাকে লেহন করছে, একত্ব দান করে একজ্ঞান দান করছে।।

ধুসর মানব

● আজ ভোরে (18.01 2023) স্বপ্নে দেখছি—আমি আর একজন রাস্তা দিয়ে হাঁটছি। হঠাৎ চারদিকে ঝড় ওঠার মতো পরিবেশ তৈরী হল, সবাই ছোটাছুটি শুরু করল নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে। আমার মনে হল দীপদা যে আয়ন ঝড়ের স্বপ্ন দেখেছিল সেটা যেন শুরু হয়ে গেল। যথারীতি ঝড় শুরু হল এবং শুরু করলো ধ্বংসলীলা। আমিও যেন যাচ্ছি নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে, আর ঠিক তখনই সামনে আকাশে একটা মহাজাগতিক দৃশ্য দেখা গেল। সূর্য বা সূর্যের মত বড় গোলাকার একটা বস্তুর দক্ষিণ প্রান্তের বিন্দু থেকে লোহা গলার মতো উজ্জ্বল লাল রঙ ওর পুরোটা ঢেকে দিচ্ছে। তখন মনে পড়ছে জয়ের স্বপ্নে সূর্যের পুনর্গঠনের কথা। এদিকে তখন ধ্বংসলীলা চরম পর্যায়ে পৌঁছেছে এবং ঐ সূর্যের মতো বস্তুর উপরের শেষ বিন্দু পর্যন্ত ঢাকা পরা মাত্র সমস্ত কিছু ধ্বংস হয়ে গেল। চারিদিকে সব শূণ্য আর কোথাও কিছু নেই। এমনকি তখন কোন বোধও নেই। সব ব্লাঙ্ক (Blank), কিছুক্ষণ পর যেন আমার পা-টা কেঁপে উঠল এবং আমার বোধ ফিরতে শুরু হল।...

দেখছি, সূর্য উঠছে। খুব বড় সূর্য। আর তার সামনের রাস্তা দিয়ে কেউ যেন আসছে। কালো অস্পষ্ট একট অবয়ব। কাছে এলে দেখি উনি স্নেহময়দা। আমার তখনও পুরো সম্বিৎ ফিরে আসেনি। ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে আছি। খুব কাছে এসে কথা বলায় চমক ভাঙলো। চারদিকে তাকিয়ে দেখি কিছুই নেই। হঠাৎ মোবাইলটা ডান হাতে চলে এলো এবং reboot হয়ে চালু হয়ে গেল ও contact list টা খুলে গেল। দেখা গেল সেখানে তখন দু'হাজার তিনশো কতজনের নাম রয়েছে (বাস্তবে আমার contact list-এ 2392 জনের নাম

আছে)। সে সময় আমার পিছন দিক থেকে প্রথমে বরুণদা বেরিয়ে এল, তারপর মমতা ব্যানার্জী। চেহারাটা মুখ্যমন্ত্রী হবার আগে যেমন ছিল সেই রকম। তিনি এসে নতুন দল তৈরী করার জন্য ভাষণ দিতে লাগলেন। একে একে অনেক জন সৃষ্টি হতে শুরু করল, কিন্তু সকলকে ধূসর বর্ণের দেখাচ্ছে। সবাই একরকম দেখতে তবে তাদের আলাদা করে চেনা যাচ্ছে। স্নেহময়দা বললেন, প্রশাসন তো নেই, সব ধ্বংস হয়ে গেছে। তাই তুই প্রশাসনটা দ্যাখ। আমরা যেন ধীরে ধীরে কাজ করা শুরু করলাম এবং একে একে ঐ ধূসর বর্ণের মানুষ সৃষ্টি হতে লাগলো, তাদের মধ্যে পাঠের মানুষের সংখ্যাই বেশি ....ঘুম ভাঙল।

একটা অদ্ভুত বিষয় লক্ষ্য করলাম যে ঘুম ভাঙার পর স্বপ্ন দেখে যে আনন্দ, বিস্ময় ভয় ইত্যাদি অনুভূতি হয় তার কিছুই আমার মধ্যে নেই।

—শুভাশিস দাস

বোলপুর

ব্যাখ্যা—স্নেহময়দা = সমষ্টিচৈতন্য। বরুনদা= ব্যক্তিচৈতন্য। জগৎচৈতন্যের সমষ্টি চৈতন্যে রূপান্তরের ফলে সমষ্টির সাধনে বহু মানুষের ব্যক্তি চেতনার পরিবর্তন হচ্ছে, তারা নতুন করে সৃষ্টি হচ্ছেন, recreated হচ্ছেন । নতুন এক মমতাময়ী ও মধুমতী জগৎ জেগে উঠছে যেখানে মানুষ একত্বের চেতনায় সদা আলোকিত (ধূসর বর্ণের) থাকবেন।। Contact list খুলে গেল = জগতের সঙ্গে সত্য সম্পর্ক স্থাপিত হচ্ছে।

● গত ২৭ শে জুলাই ২০২২ স্বপ্নে দেখছি—আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে আছি, নিজের মুখটা দেখছি। দেখি কানের পাশে একটা কালো মতো দু'আঙুল চওড়া ও উঁচু কী যেন রয়েছে। আমি ভাবলাম, বাবা, এটা কী? হাত দিয়ে অনুভব করলাম , ওটা ছোট্ট একটা মৌমাছির চাক। তখন মনে উদয় হল আশ্চর্য এক ভাবনা। মনে হল—আমরা যে অন লাইন পাঠ শুনি তাতে করে আমাদের যে অনুচৈতন্য জেগেছে সমষ্টিচৈতন্যের কৃপায়, এটা তারই প্রমাণ।...

কেতকী পাঠক

সখেরবাজার, বেহালা

ব্যাখ্যা—এক ফোঁটা মধু নয়, ছোট খাটো মৌচাক লাভ হয় অনুচৈতন্য লাভ হলে, দেহ সদা যোগযুক্ত থাকে, ফলে চৈতন্যময় হয়ে থাকা যায় ও নিত্য অমৃত বর্ষিত হয় কানে ঈশ্বরীয় চর্চ্চায়।

অদ্রিজা

● দেখছি (23. 04.2023)—একটা বয়েজ স্কুলে গেছি। সেখানে আমার সাথে আমার বন্ধু অদ্রিজা আছে। ক্লাসের অবসরে দেখছি অদ্রিজা আমার সাথে ঘুরছে আর ওর পিছনে একটা ছেলে ঘুরছে । সেই ছেলেটা যেন কিছুই জানে না। ও আঙুল দিয়ে যা দেখাচ্ছে দরজা, ফ্যান ইত্যাদি সেই জিনিসটা অদ্রিজা ওকে বোঝাচ্ছে ব্যাখ্যা করে করে। আমার খুব অবাক লাগল। একটা হলঘরে এসে পৌঁছানোর পর প্রথম বার ছেলেটির মুখ দেখলাম। মুখে একটা দৈবী ভাব। দেখে খুব সহজ সরল মনে হল। ও কাঁদছিল । আমি জিজ্ঞেস করলাম, কাঁদছো কেন? ও বলল, আমি বুঝতে পেরেছি মানুষের ভিতরে ভগবান। তুমি কি সেটা বুঝতে পেরেছো? আমি বললাম, হ্যাঁ। অমনি সেই ছেলেটা আমাকে জড়িয়ে ধরলো। তখন আমারও মনে হল যে মানুষের ভিতরেই ভগবান—এটা যখন আমার অনুভূত হয়েছিল তখন আমারও কাঁদতে ইচ্ছা করেছিল। এই ছেলেটার কাছ থেকে অনুপ্রেরনা নিয়ে আমাকেও এখন সেটাই করতে হবে।...ঘুম ভাঙার পর মনে হ'ল—মানুষের ভিতরেই ভগবান—এই অনুভূতি যখন হয় তখন যেন পৃথিবীকে নতুন করে দেখতে হয়, সব জানা জিনিস অজানা হয়ে যায় নতুন করে যোগদৃষ্টি সহায়ে (অদ্রিজা- মানে হিমালয় কন্যা পার্বতী—অর্থাৎ ব্রহ্মের শক্তি, তার দৃষ্টিতে) সব জানতে হয়। আর ঈশ্বরীয় অনুভূতি সমমনোভাবাপন্ন অন্য মানুষদের সঙ্গে ভাগ করে নিতে হয়, share করতে হয়।

—দিশা গাঙ্গুলী
বেলুড়

● দেখছি— (12-4-23)— জীবনকৃষ্ণের ব্যবহৃত জিনিস পত্রের একটা মিউজিয়ামে গেছি। সেখান থেকে একটা পালক নিয়ে সাগর দেখছিল। হঠাৎ সেটা জানলা দিয়ে বাইরে ড্রেনে পড়ে গেল। তখন ও বলে উঠল, যাক্ গে।... **ব্যাখ্যা**— পালক— উপাধি। ব্যক্তি জীবনকৃষ্ণের আশ্চর্য গুণের ভাবনা ব্যক্তি পূজার (heroworship-এর) জন্ম দেয়, জগৎচৈতন্য জীবনকৃষ্ণকে বুঝতে দেয় না, তাই তা দূরে গেল, দ্রষ্টা বাঁচলেন।

— কৃষ্ণা ব্যানার্জী
বোলপুর

এ. টি. এম. কার্ড

● দেখছি (20. 04. 23)— রাতের বেলা বাড়ি থেকে জাম্বুনী যাবো। ওখানে পাঠ হচ্ছে। একটু লেট (Late) হয়ে গেছে। এখন যাওয়াটা কি ঠিক হবে? ছোটমামা বলল, হ্যাঁ, যা। জয়দার পাঠ। রাস্তায় বেরোনোর পর দৃশ্য পাল্টে গেল। দেখছি আমরা পাঠের সবাই একটা মিউজিয়ামে গিয়েছি। সেখানে জওহরলাল নেহরুর সব জিনিসপত্র রাখা আছে। সেখানে ঢুকতে হলে নিজেদের ব্যাগ রেখে ওদের দেওয়া একটা ব্যাগ নিতে হচ্ছে। ভিতরে ঢুকে একজন স্টাফ (staff) কে নেহরুর A.T.M card দুটি দেখাতে বললাম। সে তা দেখালো। ...ওখানে সবাই মিলে খাবো, আমরা যেন মিউজিয়ামটা বুক করেছি। একদিনের জন্য। খাওয়া দাওয়া হল— আনন্দ হল—ঘুম ভাঙল। দেখি আমি ঘরে আছি। ঘরে পাঠ হচ্ছে। জয়দাদা, ছোটমামা, স্নেহময় মামা সবাই রয়েছে। বুঝলাম, কাল যে পাঠে যাবো বলে বেরিয়েছিলাম, আসলে রাস্তাতেই স্বপ্ন দেখতে দেখতে ঘরে পৌঁছে গেছি। পাঠে জয়দাকে স্বপ্নটা বললাম। তারপর জানলায় রাখা একটা অ্যাকোয়ারিয়াম দেখাচ্ছি। মাছ কম রয়েছে দেখে মনে পড়ল কিছু মাছ জয়দাকে দেব বলে ব্যাগে নিয়েছিলাম। ব্যাগটা খুলে দেখি মাছগুলো বেঁচে আছে এখনও। সেগুলোকে তাড়াতাড়ি অ্যাকোরিয়ামের জলে ছেড়ে দিলাম।

—সাগর ব্যানার্জী
বোলপুর

ব্যাখ্যা— জাম্বুনী— সহস্রার। জওহরলাল—প্রথম প্রধানমন্ত্রী—প্রথম ঈশ্বরত্ব প্রাপ্ত ব্যক্তি— শ্রীজীবনকৃষ্ণ। মিউজিয়াম—ব্যষ্টির সাধনের বিভিন্ন পর্যায়গুলি। নিজের ব্যাগ রেখে ওদের ব্যাগ নিয়ে ঢোকা—নিজের ঈশ্বরীয় ভাবনা সরিয়ে রেখে মানুষ স্বরূপত ভগবান —এই জ্ঞান নিয়ে ঢোকা। দুটি ATM কার্ড—ব্যষ্টি ও বিশ্বব্যাপীত্বের জ্ঞানলাভের উৎসমুখ (ধর্ম ও অনুভতির ১ম ও ২য় ভাগ, এবং তৃতীয় ভাগ)। জয়ের পাঠ শোনার আগেmuseum-এ ঢোকা— সমষ্টির সাধনতত্ত্ব বোঝার আগে ব্যষ্টির সাধন ও বিশ্বব্যাপীত্ব সম্বন্ধে ধারনা লাভ প্রয়োজন। মাছ গুলো অ্যাকোরিয়ামের জলে ছেড়ে দিতে হবে— একজ্ঞানের চেতনার নিরিখে নিজের দর্শন অনুভূতির মননে একত্বের উপলব্ধি তথা সমষ্টির ধর্ম বোঝা হয়।

পাখির মাথায় সাপ

● দেখছি (16. 04. 2023)—আমি আমার তিনজন ছেলেবন্ধু মিলে একজন বয়স্ক স্যারের কাছে গেছি। উনি আমার গলায় হাত দিয়ে কিছু বোঝাচ্ছেন। এই আচরণ (গলায় হাত দেওয়া) আমার ভাল লাগল না। আমি ওনাকে মেরেই ফেললাম। এর কিছুদিন পর ভাবলাম ওনাকে যে মেরে ফেলেছি এটা আমার তিন বন্ধু ছাড়া তো কেউ জানে না। প্রমান লোপাট করতে হবে। তাই স্যারকে যেখানে মেরেছি সেখানে গেলাম। ওখানে একটা ন্যাকড়া ও এক কৌটা চিনির গুঁড়ো ছিল। সেগুলি সরিয়ে ফেললাম। তারপর একটা আশ্রমে গেছি। সেখানে আমার ঐ তিন বন্ধু সন্ন্যাসী হয়ে আছে। আমি সাধারণ মানুষ হয়েই আছি। ওরা আমার খুনের সঙ্গে যুক্ত নয়। তা সত্ত্বেও আমার সমস্যা বোঝার চেষ্টা করছে। একটা বাড়ির দোতলায় গেলাম। পাশে জঙ্গল। সেখানে একটা কালো বিষাক্ত সাপ নজরে পড়ল। সন্ন্যাসী বন্ধুরা সাপটাকে দেখতে পাচ্ছে না। সাপটা একটা কালো পাখীর মাথার সাথে মিশে আছে। সেটা বন্ধুরা কিছুতেই বুঝতে পারছে না। পরে সাপটা লাফ মেরে একটু দূরে অন্য একটা পাখীর মাথায় গিয়ে মিশে থাকলো। আমি বেশ দেখতে ও বুঝতে পারছি, কিন্তু বন্ধুরা তা দেখতে পাচ্ছে না বলছে।....

—সোমা পাল বসাক

আমতলা, দ. ২৪ পরগনা

ব্যাখ্যা—বয়স্ক স্যার—পূর্ববর্তী আচার্যদের সংস্কার। গলায় হাত দিচ্ছেন— এই সংস্কার সত্য বলতে বাধা দেয়, গলা চেপে ধরে। মেরে ফেললাম—ঐ সংস্কার মাথা থেকে ঝেড়ে ফেললাম। তিন বন্ধু এখন সন্ন্যাসী ও আশ্রমবাসী— দ্রষ্টার মধ্যে আগে যে ভক্তির সত্ত্বঃ রজঃ ও তমো ছিল তাদের পরিবর্তন ঘটেছে। তারা আমার সমস্যা বোঝার চেষ্টা করছে—যোগীর দৃষ্টিতে প্রকৃত রজ, সত্ত্ব ও তমোগুণের ক্রিয়ায় দ্রষ্টা সংস্কার মুক্তির স্থায়ী অবস্থার দিকে এগোচ্ছে।

পাখীর মাথায় বিষাক্ত সাপ—আত্মিক কথার (পাখীর) মধ্যে লুকিয়ে থাকা ভুল ও এক জ্ঞান বিরোধী সংস্কার (বিষাক্ত সাপ) দ্রষ্টা চিহ্নিত করতে পারছেন। কারণ তার যোগদৃষ্টি জেগেছে।।

ন্যাকড়া = সংস্কারের সঙ্গে যোগ, লিঙ্ক। চিনির কৌটা = এক শ্রেণীর দর্শন-অনূভূতি যা সংস্কারকে সত্য বলে প্রতিপন্ন করে বলে মনে হয়।

স্বার্থপর

● দেখছি (6. 12. 2022)—চার পাঁচজন মিলে অন্ধকারে হাঁটছি। হঠাৎ করে মাঝ আকাশে সূর্য দেখা গেল। ঝলমলে আলো। স্নিগ্ধ কিরণ—সূর্যের মাঝখানে চোখ মুখ নাক দেখা যাচ্ছে। আমি বললাম, সূর্য এত স্বার্থপর কেন? একবার আলো দিচ্ছে আবার অন্ধকার হয়ে যাচ্ছে। যখন যা খুশী তাই। তখন উনি মিটমিট করে হাসছেন আর বলে উঠলেন, হ্যাঁ তাই।... ঘুম ভাঙলো।

—স্বপন ভট্টচার্য্য
বাগুইআটি

ব্যাখ্যা—

স্বার্থপর= যে নিজের স্বার্থে কাজ করে। ঈশ্বরকে আপাত দৃষ্টিতে স্বার্থপর বলে মন হয়। কেননা তিনি মানুষের পার্থিব কামনা পূরণ করেন না। তিনি চান মানুষ তাকে নিয়ে থাকুক, তাকে ভালোবাসুক, তার সাথে এক হোক তথা তার স্বরূপকে জানুক, তাই কখনো কখনো আঘাত দিয়েও (অসুখ দিয়ে, বিষয় সুখে বঞ্চিত করে,) মানুষকে নিজের দিকে টানেন অর্থাৎ অন্ধকার দিয়ে পরে তার আলোর মহিমা জানান।

● দেখছি (6. 02. 23)—একটি দোতলা বাড়ির দোতলায় আছি। হঠাৎ চোখে পড়ল ছাদে যাবার একটি দরজা। ছুটে গিয়ে দরজায় ধাক্কা মারলাম। দরজা খুলে গেল। ছাদে উঠলাম। তীব্র আনন্দ হতে লাগল। হঠাৎ মুখ থেকে বেরিয়ে এল—আয়রে আমার হরিয়ানা, আয়রে আমার জার্সি। অমনি সিঁড়ি বেয়ে গট্‌গট্‌ করে দুটি হরিয়ানা ও দুটি জার্সি গরু উঠে এল ছাদে। আমার আনন্দ আর ধরে না। গরুগুলোকে বললাম, তোদের জন্য মশারী খাটিয়ে দেব। ...ঘুম ভাঙল।

— স্নেহময় গাঙ্গুলী
চারুপল্লী

ব্যাখ্যা—দোতলা থেকে ছাদে—''তমসো মা জ্যোতির্গময়'' থেকে ''মৃত্যোর্মা অমৃতংগময়'' হ'ল। সব ধরণের ঈশ্বর অনুরাগী মানুষের ব্রেন পাওয়ার বাড়ছে সমষ্টির সাধনে (অধিক দুগ্ধবতী গাভী হরিয়ানা ও জার্সী)। তাদের সাথে সম্মিলিত অনুশীলনে সূক্ষ্মমন স্থায়ী হবে, নিজেকে ঘেরা টোপে রাখা যাবে যাতে আমি অনুশীলন করছি— এই অহং মাত্রাজ্ঞান না ছাড়ায় (মশারী টাঙাবো)

একত্বের সাধন

● গত ১১.০১.২০২৩, ভোরে স্বপ্ন দেখছি—মা কে বোঝাচ্ছি জয়ের দেহে একত্বের সাধন কিভাবে হচ্ছে। বোঝাতে বোঝাতে তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে গেছি। দেখছি—আমার মাথার উপর বিশাল খোলা নীল আকাশ। সেখানে বিভিন্ন হিংস্র পাখি যেমন চিল, শকুনি, কাক ইত্যাদি ইতস্তত বিক্ষিপ্ত অবস্থায় ঘুরে বেড়াচ্ছে এবং একে অপরকে আক্রমন করছে। একটু পরে দেখছি একদল বড় বড় সাইজের রাজহাঁস এসে অন্য পাখীগুলোকে তাড়িয়ে দিল এবং নির্মল আকাশে সারিবদ্ধ হয়ে ঘুরে বেড়াতে লাগলো। এরপর খেয়াল হ'ল আকাশের আরও উপরের একটি পৃথক স্তরে যেন ভীষন বজ্রপাত ও বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে—ঘন কালো হয়ে রয়েছে। ঐ স্তরে কী হচ্ছে বোঝার উপায় নেই।

তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থা কাটলে বুঝতে পারলাম এইভাবে জয়ের দেহে বস্তুতত্ত্বে একত্বের সাধন হচ্ছে।...ঘুম ভাঙলো।

—তন্ময় নাথ
শীলপাড়া, বেহালা

ব্যাখ্যা—মা — দেহ। মা কে বোঝাচ্ছি—দেহ দিয়ে বুঝছি। পাণ্ডিত্য দিয়ে (চিল, শকুনি...) বুঝতে গেলে বাহ্যিক দ্বন্দ্ব প্রকট হয়। অনুভূতির মাধ্যমে সার ও অসার বোঝা যায়—রাজহাঁসের গুণ লাভ হয়। তখন সমষ্টিগত অনুশীলনের স্বচ্ছ চেতনায় (নির্মল আকাশে) থাকা যায়। এই স্তরে থেকে নির্গুণের ক্রিয়াশীলতা বোধে আসতে শুরু করে। তার অভ্যন্তরে কী হচ্ছে বোঝা যায় না (ঘন কালো) কিন্তু effect বোঝা যায়।

● স্বপ্নে দেখছি (30.09.2022)—জয় শূন্যের মধ্যে চেয়ারে বসে চুরুট খাচ্ছে ও পাঠ করছে। পাঠের সবার পেটে ঢুকে যাচ্ছে ঐ ধোঁয়া—খুব মিষ্টি গন্ধের ও স্বাদের। আমার মনে হচ্ছে প্রত্যেক শনিবারের পাঠে আমরা ঐ ধোঁয়া খাই। ... ঘুম ভাঙলো।

—সবিতা ঘোষ
চারুপল্লী

নতুন ধর্ম ও অনুভূতি

● দেখছি (12.04.23)—গ্রাণ্ড হোটেলের মতো এক স্থানে খাওয়া দাওয়া হচ্ছে। বরুণ মামা দেখাশোনা করছেন। স্নেহময় মামা, অমরেশ মামাও আছে। খাওয়ার পর একটা বড় হল ঘরে পাঠ হবে। সেখানে ঢোকার গেটপাশ হ'ল নতুন ধর্ম ও অনুভূতি। ঐ বই কাছে থাকলে তবে পাঠে যোগ দিতে পারবে। বইটার মলাট কালো রঙের আর লেখাটা সাদা রঙের।...

—প্রার্থিতা ঘোষ
বেলঘড়িয়া

ব্যাখ্যা—নতুন দৃষ্টিভঙ্গিতে ধর্ম ও অনুভূতির ব্যাখ্যা হচ্ছে—ধর্ম ও অনুভূতি নতুন হয়ে উঠছে। এই নতুন ব্যাখ্যা জানলে এখনকার নতুন ধারার পাঠ উপভোগ করা যাবে। একজ্ঞানের চেতনা লাভ হবে।

শরণাপন্ন

● দেখছি (26.02.2023) —আমাদের বোলপুরের বাড়ির সামনে অনেক ফাঁকা জায়গা। ওখানে একটা ঘর আছে। অনেকদিন যেন কেউ যায়নি। আমার কাকু কাকীমা আছেন ঐ ঘরে। ওনাদের ভয় লাগছে। আমি ঘরটা পরিষ্কার করছি। আমার ভয় লাগছে না। হঠাৎ আমি চার পাঁচজন মহিলাকে দেখছি। সবাইকে জিজ্ঞেস করছি ওদেরকে দেখতে পাচ্ছে কি না। ওরা কেউ দেখতে পাচ্ছে না বলল। তখন আমারও ভয় লাগছে। ওরা কী একটা খেতে দিল। আমি প্রসাদ ভেবে খেলাম না। খুব অস্বস্তি হতে লাগলো। আমি তখন ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম। জীবনকৃষ্ণকে খুব ডাকছি আর বলছি, তুমি আমার একী করলে, এমন কেন হল? তখন দেখছি একটা বড় ডাম্পারের মতো গাড়ী থেকে একজন মুখ বাড়িয়ে বলল, জয়ের শরণাপন্ন হও, জীবনকৃষ্ণকে বলে কিছু হবে না।...ঘুম ভাঙলো।

—মন্দ্রিতা চ্যাটার্জ্জী
ইলামবাজার

ব্যাখ্যা—ভক্তিতে কিছু সংস্কার যেতে পারে কিন্তু তা অতিক্রম করে আপন সত্তা বোধ হতে হলে জ্ঞানে উত্তীর্ণ হতে হবে। শরণাপন্ন মানে স্বস্বরূপে বোধের

লয়। তখনই ভয় যাবে।। একজন—অনুচৈতন্য। ডাম্পারে—পাকা ইমারত তথা স্থায়ী পরিবর্তন ঘটানোর ক্রিয়া করছেন।

● স্বপ্ন দেখছি (24.03.2023)—একটা ঘর। সেখানে দীপদা আধশোয়া হয়ে পা দোলাচ্ছে এবং বেশ রেগে আছে মনে হচ্ছে। তারপর দেখি সিঁড়ি দিয়ে লিওনদা ও বৌদি উঠে আসছে। কিন্তু কাছে আসতে দেখি আমি যাকে লিওনদা ভেবেছিলাম সে লিওনদা নয়। ও বলল, আমি নারদ। ... ঘুম ভাঙল।

—**শুক্লা লাহা**

বোলপুর

ব্যাখ্যা— দীপ—জ্ঞানদীপ—যে মেধা (intellect) দ্বারা বিচারাত্মক ব্রহ্ম জ্ঞান লাভ করা যায়। পা দোলাচ্ছে এবং বেশ রেগে আছে— মেধা দ্বারা ব্রহ্ম জ্ঞান লাভ করলে তা শুষ্ক ও উগ্র হয়। কারণ তাতে অহং থাকে—তাই ভক্তি লাভ করে তাকে অতিক্রম করে ধাপে ধাপে জ্ঞানে (একজ্ঞানে) উত্তীর্ণ হতে হয়। নারদ—দ্বৈতবাদী ভক্ত।

নবীনা

ধ্রুবতারা দর্শন

● গত ১৯.১১.২০২২ এ শনিবারে পাঠ চলছে। জয় দা ব্যক্তি ও নৈর্ব্যক্তিক প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করছে। সেই সময় trance-এ দেখছি—জয়দা অনর্গল পাঠের কথা বলছে। জয়দার বাঁ কাঁধের দিকে জলছবির মতো ঐ একই রকম আর একটা জয়দা একই কথা বলছে। দুজনের মুখ হাত সব একই রকম ভাবে নড়ছে। ...খুব অবাক হলাম। ঘুম ভাঙলো।

—অর্ণব পাল

জিনাইপুর, বীরভূম

ব্যাখ্যা—ব্যক্তি জয়দা ও নৈর্ব্যক্তিক নির্গুনের ঘনমূর্তি জয়দা এক হয়ে যাচ্ছে বিশেষত আধ্যাত্মিক বিষয়ে আলোচনার সময়।

● গত ৭-২-২০২৩-এ স্বপ্নে দেখছি—জয় একজন রাজা। বিয়ের পর প্রথম প্রজাদের সামনে এসেছে। অনেক মহিলা ভিড় করে এসেছে, আমি আর নিভা গেছি দেখতে। আমি জয়কে হাত তুলে ঈশারা করলাম। জয় মুচকি হাসলো। জয়ের পোষাক খুব সুন্দর। রাজস্থানের রাজাদের মতো। অনেক বাচ্চার সাথে নিভা রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে আছে। একজন মহিলা বলছেন আগে রাজস্থানে প্রথমেই মিষ্টি দেওয়া হোত, এখন পরে দেওয়া হয়। আর দেখছি বিয়ের সময় ধ্রুবতারা দেখানোর ঐ দৃশ্যটি ব্যানার করে উঁচুতে টাঙানো—সেখানে জয় আঙুল দেখিয়ে বহু মানুষের দিকে দেখাচ্ছে যার মধ্যে জীবনকৃষ্ণও বসে আছেন। আর মানুষগুলি জয়ের দিকে তাকিয়ে আছে। আমার মনে হচ্ছে স্নেহময়দা দারুণ কর্মী, এত তাড়াতাড়ি এরকম ব্যানার বানিয়ে সাজিয়েছে!

—অভিজিৎ রায়

ইলামবাজার

ব্যাখ্যা—নিজে অপরিবর্তনীয় এক (ধ্রুবতারা) হয়ে, জগতের মানুষকে জীবনকৃষ্ণ তথা একত্ব দান করে বুঝিয়ে দিচ্ছেন—তাদের অন্তরের ধন এই ধ্রুবতারা।।

হাত লম্বা হ'ল

● দেখছি (14.01.2023)—আমার বাড়িতে কলিং বেল টিপে জয় ঢুকলো। যদিও বাড়িটা একটু অন্যরকম দেখলাম। বললাম, এসো, এসো, বসো। ও বলল, দিদি তুমি গানটা করো তো শুনব। বললাম, কোন গানটা? বলল, তুমি যে কোন একটা গান করো। বললাম ঠিক আছে করছি। ও দেখছি আমার মেয়ের জন্য অনেকগুলো ক্যাডবেরী চকলেট এনেছে। ওগুলো দিয়ে বলল, তোমার মেয়ে খাবে। তারপর হারমোনিয়াম নিয়ে বসলাম। কিন্তু কী আশ্চর্য বেলোটাতে হাত পৌঁছাচ্ছে না। তখন জয় একটা হাত দিল। সেই নকল হাতটা আমার বাঁ হাতে লাগালাম। ওটা আমার হাতে জোড়া লেগে গেল, মনে হচ্ছে original হাতটা যেন একটু লম্বা হয়ে গেছে। এবার বেলো টানতে পারছি। মনে হচ্ছে এবার সব কাজই সহজে করতে পারবো। তাই আনন্দ হচ্ছে। আর জয় আমার ঘরে এসেছে বলে বেশি আনন্দ হচ্ছে।

—সঞ্চিতা চ্যাটার্জ্জী
বোলপুর

ব্যাখ্যা—কলিং বেল টিপলো—দ্রষ্টাকে বোঝালো তুমি গৃহকর্ত্রী, তোমাকে মনন করতে হবে।

ক্যাডবেরী দিল—দ্রষ্টার চেতনা বৃদ্ধির খোরাক দিল। ওর দেওয়া হাত আমার বাঁহাতে লাগল—সমষ্টি চৈতন্যের বিক্ষেপিত চেতনা দ্বারা দ্রষ্টার আত্মিক চেতনা প্রতিস্থাপিত হল। হাতটা লম্বা হল, মনে হচ্ছে সব কাজ সহজে করতে পারবো—অন্তর্মুখী মনের সক্ষমতা, মনন ক্ষমতা দ্বিগুণ হল অর্থাৎ 16 আনা মন বা সূক্ষ্মমন গঠিত হ'ল। সূক্ষমন স্থূলমনকে নিয়ন্ত্রণে রাখে ফলে নিরাসক্ত ও নির্লিপ্ত হয়ে সংসারের (বহির্জগতের) কাজ করার ক্ষমতাও বাড়লো।।

● দেখছি (6.12.2022)—একটা বিরাট বড়ো সাদা হাতি। তার পেটে ছোট্ট একটি বাচ্চা হাতি। তার ভিতর জীবনকৃষ্ণ সমাধিতে আছেন। বাচ্চাটা প্রসব হওয়ার পর আমি ওকে গিলে খেয়ে নিলাম। তখন জীবনকৃষ্ণ ভিতর থেকে বললেন, তোর আত্মিক সত্তা জাগ্রত হ'ল।

ব্যাখ্যা—বড় হাতি—অখণ্ড মন—সমষ্টিচৈতন্য। বাচ্চা হাতি—দ্রষ্টার সূক্ষ্ম মন বা অনুচৈতন্য। এই সূক্ষ্ম মন জাগলে, আত্মিক চৈতন্য জাগ্রত হয়।।

—শ্রাবন্তী (নিভা) রায়
(ইলামবাজার)

সবাই এক স্তরে

● গতরাত্রে (12.02.2023) দেখছি—আমি আর সমীরদা শান্তিনিকেতন আশ্রম মাঠের পাশ দিয়ে হাঁটছি। ভিতরে খুব আনন্দ হচ্ছে। হাঁটতে হাঁটতে যখন গৌর প্রাঙ্গনে পৌঁছলাম তখন পাঠভবনের অধ্যক্ষের সাথে দেখা হলো। উনি আমাকে বললেন, এতদিনে আমি উত্তরশিক্ষা (এটা উচ্চ মাধ্যমিকের আলাদা বিভাগ ছিল) বন্ধ করে পাঠভবনেই (যা মাধ্যমিক বিভাগ ছিল) সবাইকে আনতে পেরেছি। পজিটিভ হবে না নেগেটিভ হবে জানি না। আমি অবাক হয়ে শুনছি। হঠাৎ আমার সাইকেলের কথা মনে পড়ে গেল। সমীরদাকে বললাম, আমার সাইকেলটা কৈ? সমীরদা বলল, ওটা তো আশ্রম মাঠের উল্টো দিকে রেখে এসেছি। মনে হ'ল, তাহলে আমি বাড়ি যাব কী করে? ...

—অমরেশ চ্যাটার্জী
ইলামবাজার

ব্যাখ্যা—অধ্যক্ষ—সমষ্টিচৈতন্য।

সকলকেই পাঠভবনে আনতে পেরেছি---ধর্মজগতে জগৎচৈতন্য ও সমষ্টিচৈতন্যের ক্রিয়া সম্পূর্ণ পৃথক ভাবে পর্যবেক্ষণ না করে সবটা এক অখণ্ডচৈতন্যের ক্রিয়া হিসাবে দেখিয়েছি যার প্রথমাংশে ব্যষ্টিচৈতন্য ও জগৎচৈতন্যের ক্রিয়া এবং শেষাংশে (সমষ্টির ধর্মে) সমষ্টিচৈতন্যের ক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়।

পজিটিভ না নেগেটিভ হবে জানি না—বিষয়টি সাধারণ মানুষের বোঝার ক্ষেত্রে সহজ হবে নাকি অসুবিধা হবে এই মুহূর্তে তা জানি না। অর্থাৎ জগৎচৈতন্য ও সমষ্টিচৈতন্যের ক্রিয়া নিয়ে ধন্দ কাটাতে সুবিধা হবে কি'না জানি না।

সমীরদা—দ্রষ্টার প্রাণশক্তি। তার পরিবর্তন হয়ে গেছে। বাড়ি যেতে চাইছেন, (ব্যষ্টির সাধনতত্ত্বের চর্চায়), কিন্তু তা সম্ভব নয়। অনুশীলনে থাকতে থাকতে এই আকর্ষণ কেটে যাবে।

● দেখছি (30.11.2022)—আমার বুকের মধ্যে জয় ও স্নেহময়দা বসে আছে। জয় ধুতি পরে খালি গায়ে বসে ব্রহ্মানন্দ কী তা ব্যাখ্যা করছে। শুনে

স্নেহময়দা জোরে ‘‘বাঃ’’ বলে আনন্দ প্রকাশ করল। অমনি শরীরে ঝাঁকুনী অনুভব হল আমার। ...

—বিশাখা চ্যাটার্জী
জামবুনি

ব্যাখ্যা—সমষ্টিচৈতন্যের ক্রিয়ায় ভিতরের জগৎচৈতন্য তথা তার concept জীবন্ত হয়ে উঠছে। আমরা তাকে বুঝতে পারছি। ভেতরে ধারনা করতে পারছি।

ব্রেনে চিপ ঢোকাচ্ছেন

● স্বপ্ন দেখছি (23.11.2022)—শ্রীজীবনকৃষ্ণ ও আমি একটা বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলছি। কথা বলতে বলতে বাড়ির উঠোন পেরিয়ে সামনের দিকের ঘরে প্রবেশ করলাম। ঘরটি অন্ধকার। দরজা দিয়ে যতটুকু আলো আসে ততটুকুই। আমি শ্রীজীবনকৃষ্ণকে বললাম, আপনি এত কঠিন কঠিন কথা বলছেন যে কিছুই বুঝতে পারি না। এই ব্যাপারে একটা ব্যবস্থা নিন যাতে করে আপনার কথাগুলো বুঝতে পারি। উনি আমার দিকে তাকিয়ে হাসলেন। বললেন, আয় বোস। বলে বসবার টুল এগিয়ে দিলেন। আর উনি আমার মুখোমুখি একটা চেয়ারে বসলেন। উনি দরজার দিকে মুখ করে আর আমি দরজার দিকে পিছন ফিরে বসলাম। এরপর উনি ওনার দু’হাত দিয়ে আমার মাথার উপরের অংশটা খুলে ফেললেন। মাথার ভিতরের সমস্ত দেখা যাচ্ছে। আমিও যেন দেখতে পাচ্ছি। তারপর উনি একটা চিপ (chip) আমার মাথার ভিতর ঢুকিয়ে দিলেন। তারপর মাথার উপরের অংশটা আবার লাগিয়ে দিলেন। ঠিক মতো সেট (set) করে দিলেন এবং বললেন, ‘‘যা এবার থেকে বুঝতে পারবি।’’ আমি বললাম, চিপ টা কি অ্যাকটিভেট (activate) করতে হবে? উনি বললেন, ‘‘আপনা থেকেই activate হবে। যত চর্চা করবি, মনন করবি তত বেশি activate হবে।’’ এইবার আমি যেই পিছন ঘুরে তাকিয়েছি, দেখছি পাঠের সবাই রয়েছে ঐ ঘরটার বাইরে। উনি বললেন, সবাইকে চিপ লাগিয়ে দেব। শুনে খুব আনন্দ হ’ল। ...ঘুম ভাঙলো।

—পার্থসারথী ঘোষ
বেলঘড়িয়া, কলকাতা

ব্যাখ্যা—স্বপ্নে দেখা জীবনকৃষ্ণ—সমষ্টিচৈতন্য। কথা কঠিন লাগছে—সমষ্টির কথা সম্পূর্ণ নতুন তাই কঠিন লাগছে। ব্রেনে চিপ (chip) লাগানো—ওনার ব্রহ্ম চেতনা আমাদের মধ্যে প্রতিস্থাপন করে ব্রেণ পাওয়ার বা ক্যাপাসিটি (capacity) বাড়াচ্ছেন যাতে সর্বসাধারণ ঈশ্বরতত্ত্ব ধারণা করতে পারে।।

রূপকথার চুপদিদি

● দেখছি (11.01.2023)—বন্ধু জিতেন বলল, কী সব হিসাবপত্তর করছো? আমি বললাম, PF (ভবিষ্যনিধি)-এর। ও বলল, ওসব ছাড়ো। চল বেড়াতে যাই। অমনি খাতা কলম রেখে বেরিয়ে পড়লাম। পাহাড়ী অঞ্চলে গেছি। দেখছি আকাশে ঢলে পড়েছে সূর্য। তার কিছু কিছু অংশ ঢেকে দিয়েছে কালো মেঘ। মাঝের কিছু কিছু অংশ দেখা যাচ্ছে। সেখান থেকে অতি উজ্জ্বল আলো বেরোচ্ছে। রামদা একটা টিলার উপর দাঁড়িয়ে একজনকে সূর্যের দিকে আঙুল দেখিয়ে সূর্য সম্বন্ধে নতুন কথা বলছে। আমি তাই দেখে চিৎকার করে বললাম ও রামদা, what's new in the sun আমায় বলবে না? রামদা আমায় দেখে এক গাল হেসে টিলা থেকে এক লাফে নীচে নেমে আমার কাছে এল। তখন বললাম, জানো সেই দিদিটা কাল এসেছিল, সেই চুপ দিদি। রামদা বলল, কোন দিদি? বললাম, সেই যে গো রূপকথার চুপদিদি! জানো তার সঙ্গে সারাক্ষণ আমার তোমাকে নিয়েই কথা হয়েছে! শুনে রামদা হেসে আমাকে জড়িয়ে ধরলো।...

—স্নেহময় গাঙ্গুলী
চারুপল্লী

ব্যাখ্যা—ভবিষ্যনিধির হিসাব ছাড়ো—ভবিষ্যৎ নয়, চিরন্তন বর্তমানকে বোঝ। চিরকালীন সম্পদকে পেয়েছো, তাকে নিয়ে ভাবো। সূর্য সম্বন্ধে নতুন কথা বলছে রামদা—সমষ্টিচৈতন্য ধরিয়ে দিচ্ছে জগৎ চৈতন্যের নতুন দিক। রূপকথার চুপদিদি—কল্পনার জগতের স্রষ্টা মায়া। এখানে বিদ্যামায়া তিনি চঞ্চল করেন আবার প্রসন্ন হয়ে রামের অর্থাৎ একের কথা জানালে মানুষ শান্ত হয়, ঈশ্বর চিন্তায় ডুবে যায়—বহির্জগতের বিষয়ে চুপ হয়ে যায়।। ঈশ্বরীয় কথাই বলে।

● দেখছি (26.4.23)—স্নেহময়দা ও মা বসে আছে। আমি গিয়ে বললাম, জীবনকৃষ্ণ আমায় বলেছেন, "স্নেহময়কে গিয়ে বলিস, পাঠে এখন যে নতুন

নতুন কথা হচ্ছে সেগুলো সব ঠিক ঠিক। পুরোন কথাও ঠিক তবে নতুন কথাগুলো একদম ঠিক ঠিক।।”

—তনুশ্রী চ্যাটার্জী
শীলপাড়া

মন নেই

● দেখছি (27.03.2023)—জয় এসে আমাকে বলছে, রাজীবদা চলো বেরিয়ে আসি। আমি বললাম, কোথায়? জয় বললো চলো দেখবে। আমি একটু কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, সেখানে গিয়ে কী করবো? ও বলল, মনকে আবিষ্কার করবো। আমি তখন ভাবলাম, এর আগে এক স্বপ্নে মন তোলা দেখিয়েছিল। তাহলে তো মন আবিষ্কার হয়েই গেছিল। যাইহোক আমি আর কিছু না বলে ওর সাথে চুপচাপ হাঁটতে শুরু করলাম। কিছুটা যাওয়ার পর দেখছি পাঠের অনেকে আমাদের সঙ্গে চলেছে। যেমন অমরেশদা, তরুনদা, কৃষ্ণদা, স্নেহময়দা ও পাঠের ছোট বড় অনেকেই চলেছে।

কিছুদূর যাওয়ার পর একটা বিরাট পাহাড়ের তলায় এসে আমরা দাঁড়ালাম। জয় আমার বাঁ হাত ধরে পাহাড়ের উপরে নিয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে পাঠের সকলেই চলেছে। চলতে চলতে একেবারে চূড়ায় চলে এলাম। এবার জয় বললো, কী গো রাজীবদা এবার মনকে আবিষ্কার করলে? আমি তো অবাক। আমি তো সব শূন্য দেখছি। ওকে বললাম, কই কিছুই তো দেখছি না—সব শূন্য। ও তখন হাসতে হাসতে বলল, আসলে ব্যাপার কি জানো? আমাদের মন-ই নেই। জগতে একটাই মন আছে আর তা হলো জগৎচৈতন্য জীবনকৃষ্ণ। আমি শুনে হতভম্ব হয়ে গেলাম। ...ঘুম ভাঙলো।

—রাজীব রায়চৌধুরী
সখেরবাজার

ব্যাখ্যা—“শুদ্ধ মনও যা, শুদ্ধ বুদ্ধিও তা, শুদ্ধ আত্মাও তা।” শুদ্ধ আত্মা মানে পরমাত্মা। এই পরমাত্মা এক। তাই একটিই অখণ্ড মন আছে। এটি উপলব্ধি হয় সমষ্টি চৈতন্যের টানে চেতনার উচ্চতম স্থানে পৌঁছে অর্থাৎ একত্ব লাভ হলে। যোগবাশিষ্ঠ রামায়নেও বলা হয়েছে—স্বপ্রকাশ চৈতন্যস্বরূপ আত্মাই যখন মনন শক্তি ধারণ করে তখন মন বলে অভিহিত হয়।—যোগবাশিষ্ঠ, উৎপত্তিপ্রকরণ-১০০/১৪

খোলস ছাড়া

● দেখছি (May,2023)—হাওড়া কদমতলার যে ঘরে জীবনকৃষ্ণ থাকতেন সেই ঘরে গেছি। ঘরটার পরিবর্তন হয়ে গেছে। ওটা একটা ল' (law) কলেজ হয়েছে। ঐ কলেজের reception বিভাগে যে বসেছিল তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, এখানে admission নেওয়া যাবে? উনি বললেন, হ্যাঁ। আপনার নাম বলুন। আমার নামটা বললাম। নামটা টাইপ করে computer দেখে বললেন, আপনার নাম তো registration হয়ে আছে। আপনি যে কোন দিন থেকে ক্লাস শুরু করতে পারেন। ...

—সুস্মিতা সিন্‌হা
নিউ আলীপুর

ব্যাখ্যা—জীবনকৃষ্ণ যখন বিশ্বব্যাপীত্ব লাভ করলেন তখন তাঁর principle অর্থাৎ একজ্ঞান নিয়ে ব্যক্তিগত ভাবে চলা শেষ হল—তিনি cosmic law হয়ে গেলেন। তাঁর মধ্যে মূর্ত একজ্ঞান সকলের জন্য প্রযোজ্য ও ক্রিয়াশীল হ'ল। এযুগে সেই একজ্ঞান তথা কদমতলা ঘরের আলোচনা বোধে বোধ করার সঠিক অনুশীলনের ব্যবস্থা হয়েছে সমষ্টিচৈতন্য রূপী জীবনকৃষ্ণকে ধরে। সেখানে সকলেই যোগ দিতে পারেন বিশেষত যাদের অনুচৈতন্য লাভ হয়েছে, নাম registration হয়েছে।

● দেখছি (15.01.2023) —বিরাট ডাঙায় আছি। একটা বেশ বড়ো সাপ, দেখছি। আমার সঙ্গে আরও দু'জন ছিল। সাপটা নিজের খোলস ছিঁড়ে ফেলল। তারপর একটা খড়ের টুকরো ছুঁড়ে মারল আমাকে। পরে মানুষের গলায় আমাকে সবিতাদি বলে ডাকলো। আমি ভয়ে ছুটতে লাগলাম। কিন্তু পড়ে গেলাম। সাপটা আমায় ধরে ফেলল। আমাকে জড়িয়ে ধরে চুম্বন করতে লাগলো। তখন দেখি মুখটা সাপের মতো নয়। মানুষের মতো। আমি গড়াচ্ছি, সাথে উনিও গড়াচ্ছেন। আমি মুখে ‘‘জয় জগন্নাথ,’’ ‘‘জয় জগন্নাথ’’ বলছি।...

—সবিতা পাল
ইলামবাজার

ব্যাখ্যা —সমষ্টিচৈতন্য জগৎচৈতন্যের খোলস ছেড়ে বেরিয়ে এসে মানুষকে তার আপন সত্তা বোধ দান করছেন।

দ্রষ্টা নিজেকে খড়কুটো বোধ করতেন, তুচ্ছজ্ঞান করতেন। তাই ছুটে পালাচ্ছিলেন। এই ভ্রম দূর করে নিজের সাথে এক করে নিয়ে তিনি (জগৎচৈতন্য) যে আপন সত্তা তা জানালেন।

ব্রহ্মকীট

● দেখছি (24.12.2022) —আমার মাথা ভার হয়ে রয়েছে সব সময়। ছেলেকে বললাম। ও ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেল। মাথা স্ক্যান করে ডাক্তার বাবু বলল, মাথায় একটা পোকা আছে। সেই পোকাটার নাম জয়। তার আটটা পা। গায়ের রঙ নীল। দুটো শুঁড় আছে। সে আটটা পা দিয়ে চেপে বসে আছে। তাই মাথা ভার হয়ে আছে। অপারেশন করে পোকাটাকে বের করে দিতে হবে। কিন্তু খুব রিস্ক আছে। পোকাটাকে বের করলে ওনার দেহ চলে যেতে পারে। তখন ছেলে বলল, তবে থাক, মা বেঁচে থাকুক। অপারেশন করতে হবে না।...

—রেণু মুখার্জী

সখের বাজার

ব্যাখ্যা—পোকা—ব্রহ্মকীট। ঊর্ণনাভের ন্যায়, তাই ৮ টি পা। ৮ পায়ের তাৎপর্য হ'ল—পঞ্চভূত, মহাকাশ, দৃষ্টি ও বানীর মাধ্যমে তার বিকাশ ঘটে। পোকাটাকে বের করলে মা মারা যাবে—ব্রহ্মচেতনা তাকে গ্রাস করে নতুন করে সৃষ্টি করেছে (recreated), তাই এখন এই চেতনা বাদ দিয়ে বাঁচা সম্ভব নয়।

● দেখছি (16.04.2023) —আমাদের ঘরের ঠিক সিঁড়ির নিচটায় একটা হনুমান চেন দিয়ে বাঁধা। আমি আমার স্বামীকে বলছি, হনুমানটা এখানে কেন? বাইরে কোথাও বেঁধে রাখো। ও তখন বাইরে নিয়ে গেল হনুমানটাকে। সেই সময় দেখছি হনুমানের জায়গাতে জয় বসে আছে। সাদা পোষাক পরে। আমি অবাক। আমার হাতে একটা সাদা পাত্র। জয় বলল, "আত্মিক সহায়তা।"...ঘুম ভাঙলো।

—সুমিত্রা দাস

আন্দুল, হাওড়া

ব্যাখ্যা—চেন দিয়ে বাঁধা হনুমান—জীবনকৃষ্ণকে দেখে যে একত্বের চেতনা লাভ হয়েছিল তা ছিল সীমাবদ্ধ, ক্রিয়াশীলতা কম। কারণ তখন দ্বৈতবোধ প্রবল ছিল। সমষ্টিচৈতন্য হতে adjusted form-এ যে একত্ব (জয়) লাভ হয় সেই চেতনার ক্রমবিকাশ (সিঁড়ি) ঘটে। ভক্তিচেতনা প্রতিস্থাপিত হয় একত্বের চেতনা দ্বারা। হাতে সাদা পাত্র—দ্রষ্টাকে একত্বের মনন করতে বলছে।

আকাশের তারা

● দেখছি (1.05.2023) —একটা কালো ঘন জঙ্গলে আছি। শুধু আকাশ আর জঙ্গল identify করা যাচ্ছে, এত কম আলো। আমি হাঁটছি। হঠাৎ দেখি এক মহিলা আকৃতির ছায়ামূর্তি যেন আমার দিকে তাকিয়ে আছে। আমাকে ভয় দেখাচ্ছে। আমি ভাবলাম জীবনকৃষ্ণই সত্য, ভুত প্রেতের কথা ভেবে লাভ নেই। তখন জীবনকৃষ্ণের ফটো সামনে ফুটে উঠলো। অমনি মেয়েটি অর্থাৎ ছায়ামূর্তি বলে উঠলো—আমি জীবনকৃষ্ণ টীবনকৃষ্ণ কাউকে ভয় পাই না। আমি তারও ঊর্ধ্বে। অমনি জীবনকৃষ্ণের ফটোটা হাওয়া হয়ে গেল। তখন একটু ভয় হ'ল। সেই সময় কেউ একজন বলল, তুই youtube-এ যে প্রেতকথা পড়ছিলি, অন্ধকার আকাশের একটি তারা, তখন সামনে youtube-এর home page-এ ঐ দৃশ্যটা দেখছি—ঘন জঙ্গল, সামনে ঐ মহিলার ছায়ামূর্তি—heading লেখা অন্ধকার আকাশের একটি তারা—ভাবছি আমি তো বাস্তবে এটা পড়িনি! কেউ যেন ঐ ছায়ামূর্তিকে দেখিয়ে বলল, অন্ধকার আকাশের একটি তারা আর আমাকে আকাশের দিকে তাকাতে নির্দেশ করলো। সাথে সাথে আমিও আকাশের দিকে আঙুল দেখিয়ে বলে উঠলাম এটাই হলো অন্ধকার আকাশের একটি তারা। সঙ্গে সঙ্গে আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখি মেয়েটির মাথার উপর কালো আকাশের মাঝে একটি তারা জ্বলজ্বল করছে। ওটাই যেন ঐ মেয়েটি।...খুব অবাক হলাম।

—অর্পিতা সাহা
সখেরবাজার

ব্যাখ্যা—মহিলা আকৃতির ছায়ামূর্তি—নির্গুণের ঘনমূর্তি—সমষ্টিচৈতন্য। জীবনকৃষ্ণের ফটো মিলিয়ে গেল—জগৎচৈতন্য সম্বন্ধে ধারনা বদলে গেল। অন্ধকার আকাশের একটি তারা—বলা হয়, মানুষ মারা গেলে তারা হয়ে যায়—অর্থাৎ ব্রহ্মলীন হয়—ইনি সেই ব্রহ্ম—মানুষের পরম আশ্রয়। জঙ্গলে ছায়ামূর্তি—সংসার অরণ্যে দিকদর্শী এক আদর্শ জীবন যাকে সম্পূর্ণ রূপে ধারনা করা যায় না।

পাঠপ্রসঙ্গে

পাঠপ্রসঙ্গে

পাঠ ও আলোচনা প্রসঙ্গে উঠে আসা নতুন কিছু কথা এই অধ্যায়ে তুলে ধরা হলঃ

(১) প্রসঙ্গঃ নিরাকার।

ধর্মজগতে অতীত আচার্যদের মতানুযায়ী নিরাকার বলতে যার রূপ নাই তাকে বোঝায়। তারা আসলে জ্যোতিকেই বুঝিয়েছেন। অন্য অর্থে নিরাকার হল পরমব্রহ্ম। যার সম্বন্ধে ধারনা (concept) ক্রমাগত বদলে যায়। অতীতের কোন আচার্য এমনকি শ্রীরামকৃষ্ণ পর্যন্ত নিরাকারের কোন স্পষ্ট ধারনা দিতে পারেন নি।

একমাত্র শ্রীজীবনকৃষ্ণের দেহে self evolution হল আর এই evolution ধরেই নিরাকার ব্রহ্ম সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা পাওয়া গেল। তাই জীবনকৃষ্ণ বলছেন, কেউ-ই নিরাকার কী তা জানে না, একমাত্র এই দেহ ছাড়া। এই দেহ ধরে বোঝা যায় অর্থাৎ তাঁর চিন্ময় রূপ দর্শনে বোঝা যায় পরম ব্রহ্মের বিকাশের সুনির্দিষ্ট আকার সম্বন্ধে বিভিন্ন ধাপে (পরমব্রহ্মের বিকাশের অবস্থা নিয়ে) ধারনার যে পরিবর্তন তাই-ই হল নিরাকার সম্বন্ধে ধারণা।

প্রথম ধাপে ব্যষ্টির সাধনের matured condition-এ অর্থাৎ স্থিত সমাধির পর তার ঈশ্বরত্ব লাভ হলো। 'আমি একাই আছি আর কেউ নেই'-ব্রহ্ম সম্বন্ধে তিনি প্রথম এই ধারনা লাভ করলেন। কিন্তু এটি ব্রহ্ম সম্বন্ধে তার বিচারাত্মক অবস্থা। পরবর্তীকালে তার ভুল ভাঙে এবং তিনি বোঝেন যে বাইরে বহু আছে আত্মিক জগতে 'আমি একাই আছি।' এই আত্মিক জগৎ আমারই বিক্ষেপিত অবস্থা। তাহলে অন্যেরা তাদের ভিতরে আত্মিক জগতে আমাকে দেখবে এবং সেকথা ঘোষনা করবে। অর্থাৎ অন্যদের ভিতর তাঁর নিজেকেই দেখার একটি ইচ্ছা জাগে। যেমন কেউ আয়না পরিষ্কার করছে, আয়নায় তার মুখটা দেখার ইচ্ছা করে। তখন ব্রহ্মের বিকাশের দ্বিতীয় ধাপে তাঁর জগৎব্যাপী অবস্থা প্রত্যক্ষ হয়। অসংখ্য মানুষ তাঁকে অন্তরে দেখে ঘোষণা করতে লাগলো যে আত্মিক জগতে তিনি একাই আছেন। জগৎব্যাপীত্বে অসংখ্য মানুষ যে আপনা থেকে তাঁকে দেখবে, স্থিত সমাধির পর আপনা থেকে ব্রহ্মের বিকাশ যে এই আকার

নেবে তা তাঁর ধারণায় ছিল না। এখন নতুন একটি ধারণা লাভ হ'ল।

তারপর তিনি তাঁর বিক্ষেপিত জগৎ গুটিয়ে নিয়ে অপরিবর্তনীয় পরম এক সত্তা হয়ে উঠলেন। তিনি বুঝলেন যে এবার ব্রহ্মের বিকাশের তৃতীয় ধাপে প্রবেশ করলেন, যে অবস্থায় তিনি নিজে অপরিবর্তিত থেকে জগৎ পরিবর্তন করবেন। জগৎ নিয়ন্ত্রক হয়ে উঠবেন। তাঁরই চেতনা দ্বারা পরিচালিত হবে সমগ্র আত্মিক জগৎ। তখন তার ভিতরের এই evolution cosmic law হয়ে উঠলো। এর ফল হলো আত্মিক জগতে মানুষকে অন্তরে তাঁকে দেখতেই হবে। তাঁর আত্মিক দেহ Cosmic body (বৈশ্বিক দেহ) হয়ে গেল যা নির্দিষ্ট দেহসীমায় আবদ্ধ নয়, অসীমে পরিব্যাপ্ত। তাই তাঁর এই cosmic দেহটাই হল নিরাকার। আর সেই দেহের রূপই হলো নিরাকার ব্রহ্মের রূপ।

ব্রহ্ম চৈতন্যের এই প্রবহমান ধারা যখন সাধারণ মানুষের মধ্যে ক্রিয়াশীল হয় তখন তাকে সমষ্টিচৈতন্য বলে। সমষ্টি চৈতন্যের সঞ্চালন সাধারণ মানুষের Brain power বাড়িয়ে তোলে। তারা আত্মিক জগতের কিছু অজানা (Unexplored) বিষয় জানতে পারে। এখানে ব্রহ্মের বিকাশের আর একটি অবস্থা সম্বন্ধে ধারণা লাভ হয়। যেমন তরল পদার্থের কোন নির্দিষ্ট আকার নেই। যে পাত্রে রাখা হবে সেই পাত্রের আকার নেবে, সেইরূপ ব্রহ্মচৈতন্য তাদের দেহে প্রকাশিত হয়ে ধারণারূপ পাত্রের আকার নেবে যা ক্রমাগত পরিবর্তিত হয়ে থাকে, তাই এই চৈতন্যও নিরাকার। সুতরাং এইভাবে একজন মানুষের দেহ থেকে বহু মানুষের দেহে চৈতন্যের আপনা হতে হয়ে চলা প্রবাহ হল নিরাকার সাধন ও তার বিকশিত অবস্থা হল নিরাকার ব্রহ্ম। তখন তাঁর রূপ যে ক্রমাগত পরিবর্তনশীল ধারনার রূপ তথা নিরাকারের রূপ তা উপলব্ধি হয়।

(২) প্রসঙ্গঃ সন্ন্যাসীর ধর্ম আর সংসারীর ধর্ম এবং অপরিগ্রহ।

স্বামী বিবেকানন্দ এ বিষয়ে এক আলোচনায় গল্প করে বলেছেন, এক সন্ন্যাসীকে দেশের রাজা তার মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দিতে চাইল। সন্ন্যাসী ভেবে দেখার জন্য একদিন সময় নিয়ে জঙ্গলে গেল। সেখান থেকে সে পালালো। সন্ন্যাসী সংসার বন্ধনে আবদ্ধ হবে না, বিষয় চিন্তা ছেড়ে ঈশ্বর চিন্তায় মগ্ন হবে। পরে তার ঈশ্বর উপলব্ধির কথা সংসারীদের বলবে। জঙ্গলে গিয়ে অর্থাৎ অন্তর্মুখী হয়ে নিজের মুক্তি নিয়ে সন্তুষ্ট না থেকে বহু মানুষকে মুক্তি দেবে।

আবার সংসারীদের ধর্মের কথা বোঝাতে দ্বিতীয় একটি গল্পের অবতারণা

করেছেন। এক সন্ন্যাসী গাছতলায় ধূনি জ্বালিয়ে যা হোক কিছু পুড়িয়ে খাবার ব্যবস্থা করেছে। রাত হয়ে গেছে। ঐ গাছে দুটি পাখি ছিল। একটি পাখি বলল, ঐ জ্বলন্ত কুণ্ডে আমি ঝাঁপ দিই তাহলে সন্ন্যাসীর কিছু ক্ষুন্নিবৃত্তি হবে। স্ত্রী পাখিটি বলল, তোমার এইটুকু দেহ, ঐ সামান্য মাংসে কী হবে? আমিও কুণ্ডে ঝাঁপ দিই তাহলে সন্ন্যাসীর ক্ষিধে মিটবে। অর্থাৎ সংসারীরা নিজেদের সর্বস্ব দিয়ে সন্ন্যাসীদের খাওয়াবে, তাতেই তাদের ধর্ম হবে।

স্বামীজী ধর্ম বলতে বাহ্য আচরণের কথা বলে জানালেন সন্ন্যাসীর ধর্ম ও সংসারীর ধর্ম আলাদা। সন্ন্যাসী বিষয় আশয়ে বদ্ধ থাকবেনা, বিয়ে করবে না। সর্বদা ঈশ্বরচিন্তা করবে। অপরদিকে সংসারীরা নিজেদের সর্বস্ব দিয়ে সন্ন্যাসীদের খাওয়াবে, তাতেই তাদের ধর্ম হবে।

প্রকৃত ধর্ম এক অখণ্ড চৈতন্যের উপলব্ধি, তথা একজ্ঞান লাভ। সন্ন্যাসী ও সংসারীর ধর্ম আলাদা নয়। তবে ধর্মলাভের পথ আলাদা, কিন্তু ফল এক। দুজনেই একজ্ঞান লাভ করবে। এ যেন দুজনের দুই ভিন্ন পথে দিল্লী পৌঁছানো। একজন যাবে সোজাসুজি অপরজন একটু ঘুরে ঘুরে।

সন্ন্যাসীর ধর্ম হল (১) ধর্ম কথা বলা এবং (২) অন্যের অন্তরে চিন্ময় রূপে ফুটে উঠে ঈশ্বরতত্ত্ব জানানো ও তাকে আত্মিকে তার সঙ্গে এক করে নেওয়া।

আর সংসারীর ধর্ম হল (১) সন্ন্যাসীর কাছে ধর্ম কথা শোনা ও নিজের দর্শনের ভিত্তিতে তা উপলব্ধি করা এবং (২) সন্ন্যাসীর সঙ্গে একত্ব লাভের জন্য সদা আগ্রহী থাকা। সংসারে থেকেও যারা দ্বিতীয় স্তরে সন্ন্যাসী হয়েছে তাদের অনুসরণ করা, তাদের কাছে জ্ঞানচর্চা করা।

সন্ন্যাসী সংসার থেকে পালিয়ে যাবে না। পালিয়ে গেলে সে কাকে ধর্ম কথা বলবে? আর কেই বা তাকে জানাবে তার ধর্মলাভের তথা যোগের বিচিত্র মহিমা। তবে সন্ন্যাসী হয়ে ওঠার পর্বে তাকে খুব সবধানে থাকতে হয়। অন্যথায় সংসারে থেকে ভোগগ্রহণ হয়ে যাবে, অপরিগ্রহ বজায় থাকবে না। কিন্তু সন্ন্যাস অবস্থা লাভ হলে সংসারে থাকলেও কোন অসুবিধা হয় না। তাই দেখি শ্রীরামকৃষ্ণ ভগবান দর্শনের পর বিয়ে করলেন, আত্মিকে কোন ক্ষতি হল না। তিনি স্ত্রীকে জগজ্জননী রূপে দেখলেন।

অপরিগ্রহ না থাকলে সন্ন্যাসী হওয়া যায় না। সত্য ধারণ করা ও সত্য দান করা যায় না। স্বামীজি ধর্মকথা বলার জন্য ৫০ ডলার ফি নিলেন। তিনি সত্যকার সন্ন্যাসী হলে তা নিতে পারতেন না।

শ্রীজীবনকৃষ্ণ বলেছেন, স্বামীজী বলতে পারতেন, আমাকে তোমরা খেতে দাও ও থাকার জায়গা দাও, আমি তোমাদের ধর্মকথা বলবো। তবে সেই থাকা খাওয়ার জন্যও স্বামীজির টাকা দেওয়া উচিৎ। এটা স্পষ্ট না বললেও তার কথার মধ্যে সে ইঙ্গিত ছিল।

কেউ নিজে পাখার বাতাস খেতে খেতে যদি কায়দা করে জীবনকৃষ্ণকে বাতাস করার চেষ্টা করত উনি বলতেন, ওতে আমার কষ্ট হয় বাবা, নিজে হাওয়া খাও। কারণ তার শরীর অন্যের সেবা গ্রহণ করতে পারত না, reject করত। অন্যের সেবা নিলে তার পৃথক identity আছে, এই বোধ জাগে। ফলে একজ্ঞান থেকে বিচ্যূতি ঘটে। উনি মানিকবাবুর বাড়িতে থাকতেন, একবেলা খেতেন। তার জন্য টাকা দিতেন। কিন্তু ধর্মকথা বলার জন্য কোন টাকা নিতেন না।

সন্ন্যাসী অন্যের দান গ্রহন করলে গৃহীত বস্তুর বা ধারণার দ্বারা পরিচালিত হয়ে যাবেন। তাই তার অপরিগ্রহ ভিতরে ও বাইরে, আত্মিকে ও ব্যবহারিকে বস্তুগত ভাবে।

সংসারী মানুষদের, যাদের ২য় স্তরে অনুভূতি তাদের অপরিগ্রহ হয় না। কারণ আমরা মনে মনে গ্রহণ করে ফেলি। বাইরে নেব না বলি। তবে আমরা প্রয়োজনের ঊর্ধ্বে নেব না। এ-বিষয়ে আমাদের সচেতন হতে হবে। অন্যের কাছ থেকে কিছু মাত্র গ্রহণ না করলে আত্মিকে অনেক এগিয়ে যাব এমনটা নয়। আমাদের মনের গ্রহণ ক্ষমতার তারতম্য থাকে। দামী বস্তু হলে একরকম আবার কমদামী হলে আর একরকম। আমাদের আত্মিক বিকাশ অন্যের আত্মিক অবস্থার উপর নির্ভর করে না।

কাজের অর্থাৎ ধর্মকথা বলার বিনিময়ে সন্ন্যাসীকে কেউ সেবা করলে, দান করলে সন্ন্যাসী যে তার কাছে ঋণী হয়ে যাবেন। তাহলে তার Brain -এ একটা চাপ থেকে যাবে। যেমন উনি বলেছেন পরাধীন দেশের মানুষের মাথায় একটা চাপ থেকে যায়। মনের কোন অংশে সেবা গ্রহনের ক্ষমতা তথা দূর্বলতা থাকলে পূর্ণ সংস্কারমুক্ত হওয়া যায় না।

শ্রীজীবনকৃষ্ণকে ছোটবেলায় কাপড় পরে স্কুলে যেতে হত। কাপড় খুলে গেলে বন্ধুদের কাউকে তা পরিয়ে দিতে বলতেন। তাকে সেদিনের টিফিনের পয়সাটা দিয়ে দিতেন। তিনি যে জন্ম সন্ন্যাসী।

শেষ বয়সে একদিন আনন্দবাবুকে বললেন, ‘‘তোর সাবানটা একটু আমার

পিঠে মাখিয়ে দে তো'' পরে নিজেই হাসতে হাসতে বললেন, ''ঠাকুর বলেছেন, অবতারের দেহ থাকতে থাকতে তার সেবা করে নিতে হয়।'' প্রশ্ন উঠবে তাহলে কী তিনি সেবা নিলেন? না, কারণ তিনি তখন 'একা আমিই আছি' বোধে আছেন। আমিই আমাকে সাবান মাখাচ্ছি। সেবার প্রশ্ন ওঠে না। ডান হাত দিয়ে নিজে পাখা করছিলাম এখন বাঁ হাত দিয়ে করছি।

আবার যখন বলছেন, জিতু বল্, ধীরেন বল্, আমি ধরিয়ে দিচ্ছি, আমি push করছি, তখন এক সত্তা হলেও তার বিক্ষেপিত জগতে ওদের পৃথক অস্তিত্ব রয়েছে বলে বোধ হচ্ছে। তিনিই তাদের মুখ দিয়ে বলাচ্ছেন। তবু তাদের পৃথক অস্তিত্ব থাকায় তাদের সেবা নিতে পারছেন না। এটি আসলে সমষ্টির সাধনে দেবলীলা, নিজে অন্য বহুমানুষকে দেবতা বানিয়ে তাদের দিয়ে নিজের এক স্বরূপত্ব ঘোষণা করছেন ও তাদের একজ্ঞানে অভিষিক্ত করছেন।

যেমন, রামায়ণে রামই লক্ষণ হয়েছে, রামই ভরত হয়েছে, রামই শত্রুঘ্ন হয়েছে। রামভক্ত ভরত রামেরই ভক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করছে, রামে পরিবর্তিত হয়ে। যদিও এই পরিবর্তন স্থায়ী নয়।

একই বহু হয়েছে—সেই মুহুর্তে বহুর অস্তিত্ব রয়েছে। তখন সেবা নিতে পারছেন না। বহু নয় এক—আমিই আছি-এই বোধে থাকার সময় সেবার প্রশ্নই ওঠে না।

সন্ন্যাসীর ধর্ম ও সংসারীর ধর্ম আলাদা নয়। ধর্ম একটাই। তা হল, মনুষ্যজাতির আত্মিক সত্তা এক- এটি উপলব্ধি। সন্ন্যাসী সেই অখণ্ড চৈতন্য সত্তাকে ধারণ করে ধর্মের মূর্ত রূপ হয়ে ওঠেন, মহাসন্ন্যাসী হয়ে ওঠেন। অপর মানুষের অন্তরে ফুটে উঠে তাদের ২য় স্তরে সন্ন্যাসী করে তুলে ধর্মের স্বরূপ জানান। একজ্ঞান দান করেন। ঠিক যেন শিক্ষক ''ব্রহ্মজ্ঞান'' দেন ছাত্রদের। ছাত্ররাও শিক্ষকের প্রাপ্ত জ্ঞান লাভ করে, একই ধর্ম হয় তাদের। তবে ছাত্ররা শিক্ষক হয়ে যান না, মাঝে মধ্যে সমতা বোধ হয়। কারণ শিক্ষকের জ্ঞান যে শেষ হয় না। তিনি জ্ঞান সূর্য—জমাট বাঁধা জ্ঞান, যেন একটা বিশাল লাইব্রেরী। ছাত্ররা ঐ লাইব্রেরীর বই একটা একটা করে পড়ে জ্ঞান লাভ করে কিন্তু শেষ হয় না। সূর্যের আলো পেয়ে পৃথিবীতে প্রানের বিচিত্র প্রকাশ ঘটে, অফুরন্ত ভঙ্গীমায় সেই প্রকাশ চলতেই থাকে অনন্ত কাল ধরে।

(৩) প্রসঙ্গঃ ঈশ্বর সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় করছেন-কথামৃত।

এক কথায় সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়কে গতি বলে। একটা নিরবচ্ছিন্ন গতি। জগতে এই গতির দর্শনকে দুটি দৃষ্টিভঙ্গীতে দেখা হয়েছে। (১) বাইরের জগতে (২) অন্তর্জগতে। বাইরের জগৎ বলতে জৈবী জীবনে একজনের জন্ম হ'ল, তারপর তার বয়স হল, শৈশব, যৌবন, তারপর বার্ধক্য, শেষে মৃত্যু—এ যেন একটা নিরবচ্ছিন্ন গতি।

ব্রাহ্মন্য ধর্মের সঙ্গে দ্বন্দ্বের ফলে বুদ্ধদেব ঈশ্বরকেই অস্বীকার করেছিলেন। তাই বাইরের দিক থেকে এই জরা, ব্যাধি, মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে বহমান গতির কথা বললেন। পরবর্তীকালে তাদের এই গতির ভাবনায় পুনর্জন্মবাদ যুক্ত হয়েছে। বলতে চাওয়া হয়েছে এক জন্মের মৃত্যুতে এই গতি থেমে যায় না।

বেদান্তবাদীরা বললেন, জন্ম মৃত্যু ছাড়াও আর এক জিনিস আছে—আত্মা যার জন্ম নেই—অজ—মৃত্যুর প্রশ্নই ওঠে না। তবে বেদান্তবাদীদের এই আত্মার ধারনা অস্পষ্ট এবং বিক্ষিপ্ত। কারণ চৈতন্যের পূর্ণসংকলন না হলে আত্মার পূর্ণ ও স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায় না।

এযুগে ষোল আনা বস্তুতত্ত্বে সাধন হওয়ায় আত্মা স্পষ্ট রূপ ধারণ করলো শ্রীজীবনকৃষ্ণের মধ্যে। জীবনকৃষ্ণ বললেন যে ব্যষ্টির সাধনে সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় হলো যথাক্রমে আত্মা সাক্ষাৎকার, আত্মার মধ্যে জগৎ দর্শন ও স্থিত সমাধি। এই গতির ফল স্বরূপ আত্মা তার দেহের চিন্ময়রূপ ধারণ করে সুস্পষ্ট রূপ পেল। আর তা যে সর্বজনীন ও সর্বকালীন তার প্রমাণ দিল জাতি ধর্মবর্ণ নির্বিশেষে জগতের অসংখ্য মানুষ তাকে তাদের অন্তরে দর্শন করে। তাই তিনি বললেন, ঈশ্বর হ'ল All the forces minus death.এখানে All the forces বলতে অখণ্ড চৈতন্যের বা সমষ্টি চৈতন্যের গতির কথা বলা হয়েছে। Minus death মানে যে গতি কখনো থামে না। অর্থাৎ এই ঊর্দ্ধমুখী চেতনার নিরবচ্ছিন্ন স্বতঃস্ফূর্ত গতি থাকবে। এই গতি থামবে না। ক্রমান্বয়ে বিক্ষেপ ও গুটিয়ে নেওয়া আবার পুনর্বিক্ষেপ চলতেই থাকবে। এখানেই হেগেলের দর্শন এসে পড়ে।

বিক্ষেপ পুনর্বিক্ষেপের স্বতঃ স্ফূর্ততার কথা হেগেল বলতে চেয়েছেন। যদিও তার মধ্যে আত্মিক জগতের সুস্পষ্ট ধারনা পাওয়া যায় না। তাঁর philosophy of mind, philosophy of spirit ও philosophy of state -এর সংক্ষিপ্ত রূপরেখা হচ্ছে এরকম—

১) •philosophy of mind- বাস্তব জগৎ হিসাবে যা দেখি তা মনেরই (dialectic thought of mind- এর) স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিফলন। ক্রমাগত introspect করে নিজেকে সংশোধন করে চিন্তার রাজ্যে এগোনো।

২) এই মনে যখন universality-র (univesal consciousness) প্রতিফলন হয় তখন মানুষটা ethical হয়। একে philosophy of spirit বলেছেন।

৩) Ethical বা মর‍্যাল যখন কেউ state-এর সদস্য হয় তখন state বা রাষ্ট্রও ethical হয়। এটাই philosophy of state এসবই ঘটে স্বতঃস্ফূর্ত বিক্ষেপের ফলে। তবে হেগেল যা বলেছেন সে সমস্তই স্থূল মনের বিষয়।

জীবনকৃষ্ণের ঊর্দ্ধমুখী চেতনার গতি দান করল complete philosphy of world বা আত্মিক জগতের এক সম্পূর্ণ দর্শন। আত্মিক জগতের চিরন্তন প্রশ্ন—আমি কে? আর আমার সঙ্গে জগতের মানুষের সম্পর্ক কী? এই প্রশ্নের উত্তর বাইরে খুঁজতে গিয়ে নানান দর্শনের জন্ম হয়েছে।

জীবনকৃষ্ণের ঊর্দ্ধমুখী চেতনার গতি জগতে one and oneness-এর বাস্তবরূপ প্রকাশ করেছে যা হ'ল complete philopsohy of world। জীবনকৃষ্ণের দেহে বস্তুতত্ত্বে latent capacity-র manifestation হল। তার মধ্যে ঊর্ধ্বমুখী চেতনা জগৎচৈতন্য বা পরম এক (Absolute one)-এ পরিবর্তিত হলো। তারপর তিনি তার আত্মিক জগৎ বা একত্ব সমগ্র মনুষ্যজগতে বিক্ষেপ করলেন। তিনি বুঝলেন যে আত্মিক জগতে এক ও তার একত্বই আছে। কিন্তু মনুষ্যজাতির তা বোঝা হ'ল না। তাদের মধ্যে এই embeded capacity latent হয়ে থাকলো। অর্থাৎ চেতনার স্তরের ক্রম পরিবর্তনে এক ও একত্বের উপলব্ধির সামর্থ্য প্রচ্ছন্ন থাকলো।

তাই জীবনকৃষ্ণের দেহাবসানের পরবর্তীকালে নির্গুণের আরও বিকাশ হয়ে modified-নির্গুণ বা সমষ্টি চৈতন্যের প্রকাশ হলো। সমষ্টি চৈতন্য অনেক চৈতন্যের সমষ্টি নয়। বিক্ষেপিত জগৎচৈতন্যকে মনুষ্যজাতি যাতে উপলব্ধি করতে পারে তার জন্য যে এক ঊর্ধ্বমুখী চেতনা গতিমান বা ক্রিয়াশীল তাকেই সমষ্টিচৈতন্য বলে।

সমষ্টি চৈতন্যকে model বা আদর্শ বলা যায় যার সঞ্চালনে সাধারণ মানুষ জগৎব্যাপ্ত এক অখণ্ড চৈতন্যকে বুঝতে পারবে। ব্যষ্টির সাধন ছাড়াই যে এই উপলব্ধি হতে পারে—তারই আদর্শরূপে সমষ্টিচৈতন্যকে পেয়ে সাধারণ মানুষ উদ্বুদ্ধ হবে। জগৎচৈতন্য যখন প্রথম বিক্ষেপিত হয় তখন সাধারণ মানুষের চেতনার পরিবর্তন হয়নি। এটা কালের বাধা।

রামায়ণে রামের শম্বুক বধের কাহিনীর মধ্যে এই কালের বাধার কথা বলা হয়েছে। চতুর্বর্ণের এক এক বর্ণের তপস্যার জন্য এক একটা যুগ নির্দিষ্ট করা ছিল। সত্যযুগে ব্রাহ্মণ ত্রেতাযুগে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়, দ্বাপর যুগে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য আর কলিযুগে শূদ্ররাও ঈশ্বর আরাধনা করবে। কিন্তু ত্রেতাযুগে শম্বুক নামে এক শূদ্র তপস্যারত থাকায় সমাজে অনাচার সৃষ্টি হয়। তাই রাম তাকে বধ করে। সময় না হলে সাধারণ মানুষের ঊর্ধ্বমুখী চেতনার বিকাশ হবে না। অন্যথায় সঠিক জ্ঞানের বা ধারণার অভাবে নানা সংকীর্ণ মতবাদ ও সাম্প্রদায়িকতার সৃষ্টি হবে, অনাচার হবে, একথাই যেন কাহিনীতে বলা হ'ল।

এখন সমষ্টিচৈতন্যের প্রকাশে সেই শুভ সময় সমাগত যখন সাধারণ মানুষের মধ্যে সমষ্টি চৈতন্যের সঞ্চালনে অনুচৈতন্যের সৃষ্টি হচ্ছে। তাদের মধ্যে embeded চৈতন্য ক্রিয়াশীল হয়ে উঠছে। Embeded (অন্তর্নিহিত) latent capacity (প্রচ্ছন্ন সামর্থ্য) প্রকাশ হতে শুরু করেছে। এই হ'ল সমষ্টির সাধনে সৃষ্টি—ঈশ্বরমুখী বা ঊর্ধ্বমুখী চৈতন্যের গতির সূচনা। এ যেন ঠিক প্রদীপে তেল আছে, সলতে আছে, জ্বালাবার ব্যবস্থা আছে, অনুকূল পরিস্থিতিতে তা জ্বলে উঠছে। চেতনার বীজ আপ্রাণ চেষ্টা করছে মাটি ফুঁড়ে বেরোবার এবং আপনা থেকে ফুঁড়ে উঠছেও কিন্তু তার বিকাশের গতি বজায় রাখতে হলে একটা প্রাণোচ্ছ্বল ইচ্ছার, ভিতরের তাগিদ (urge) দরকার। অর্থাৎ ঈশ্বরের প্রতি নিবিড় প্রেম দরকার। তবেই চেতনার ঊর্ধ্বমুখী গতি বজায় থাকবে।

এটাই যেন spontenuous বা স্বতঃস্ফূর্ত বিক্ষেপ। চেতনার বিকাশের প্রথম ধাপ (1st stage of manifestation) হলো সমষ্টি চৈতন্যের সঞ্চালনে অনুচৈতন্য লাভ, চিন্তনের ঈশ্বরমুখী গতিলাভ হয়, তাকে ভগবান, ব্রহ্ম, পরম ব্রহ্ম রূপে জেনে শেষে আপন বৃহৎ সত্তা বলে উপলব্ধি হয়। চেতনার গঠন, পুনর্গঠন spontaneously চলতে থাকে।

দ্বন্দ্বমূলক অধ্যাত্মচর্চা ও পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে ব্রেণ পাওয়ার বাড়তে থাকে। দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন হয় শেষে স্বস্বরূপ দর্শন হয়। এটিই manifestion-এর দ্বিতীয় ধাপ। স্থিতির পর্যায় শুরু। এই দর্শন থেকে আবার একত্ব উপলব্ধির দিকে ঈশ্বরীয় চিন্তা গতিমান হয়। এইভাবে manifestation step wise চলতে থাকে। এরপর একত্ব বোধের সম্পূর্ণতা লাভই প্রলয়, উপলব্ধি হয় আমরা সত্তাহীন অস্তিত্ব মাত্র—বোধ মাত্র। এক অখণ্ড চৈতন্য সত্তাই আছে, এই উপলব্ধিতে আমরা পৌঁছে যাই। তবে এই অবস্থা স্থায়ী হয় না। এই গতি বজায়

রাখতে হলে, বোধ স্থায়ী হতে হলে নিরবচ্ছিন্ন ঈশ্বরীয় চর্চা ও অনুশীলনের বিকল্প নেই। তবেই সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের মধ্যে দিয়ে ঈশ্বর যে এক অবিনাশী বহমান চৈতন্যসত্তা তা আমাদের বোধগম্য হবে।

(৪) প্রসঙ্গ ঃ ব্যষ্টির সাধন কী?

সাধন মানে পরিবর্তন, যে পরিবর্তনে একজন ব্যক্তির প্রাণশক্তির স্তরভিত্তিক ক্রমবিকাশের ফলে বস্তুগতভাবে ভগবান দর্শন ও বস্তুগতভাবে ভগবান লাভ হয় সেই পরিবর্তন হলো ব্যষ্টির সাধন।

ব্যষ্টির সাধনে দুটি বিষয় লক্ষ্য করা যায়।

(১) স্তরভিত্তিক প্রাণশক্তির পরিবর্তন সাধন ঘটে। দেহ ও আত্মা পৃথক হয়। কোন রূপ জৈবী সত্তা থাকে না। সাধক বস্তুগতভাবে ভগবানে পরিবর্তিত হয়ে যায়। যেমন কারখানায় কোন একটি কাপ তৈরী যখন হয় তখন কতকগুলি স্তর পেরিয়ে তবে সম্পূর্ণ একটি কাপ পাওয়া যায়। সেই রকম সাধকেরও প্রাণশক্তি স্তরভিত্তিক পরিবর্তনের মাধ্যমে পূর্ণরূপে ভগবানে পরিবর্তিত হয়।

(২) স্তর ভিত্তিক সাধন চলাকালীন একটি বিচারাত্মক অবস্থা হয়। অনেক কিছু বিচার্য বিষয় থাকে। সাধক তা যাচাই করেন। তাই ঠাকুর বলছেন, আমাকে তোমার কী বোধ হয়? কোন একটি সময় সাধকের কোন অনুভূতির সাথে তার মন সম্পূর্ণ একাকার থাকলে তখনকার সেই ভাবনা তার পূর্ণরূপে সত্য বলে মনে হয়। পরে তার reflection এলে বোঝেন তার আগের ভাবনা পূর্ণ রূপে সঠিক ছিল না।

বেদান্ত সাধনকালে জীবনকৃষ্ণ স্বপ্নে যা দেখতেন তা পরে মিলে যেত। প্রায় একবছর ধরে এরকম ঘটতে থাকে। তখন তার মনে হল জগৎ স্বপ্নবৎ। পরে একসময় বুঝতে পারলেন যে বাইরের স্থূল জগৎ রূঢ় বাস্তব, স্বপ্নবৎ নয়। তার আত্মিক জগৎ স্বপ্নবৎ অর্থাৎ অতিসূক্ষ্ম অবস্থায় রয়েছে।

আবার স্থিতসমাধিতে ''আমি একাই আছি''—বোধ জন্মায়। ব্যষ্টির সাধনের এই স্থিতসমাধি অবস্থায় ''এক বোধ'' এত গাঢ় হয় যে বাইরেও দ্বিতীয় কেউ নেই মনে হয়। তিনি অভয়কে ক্রমাগত চারমাস ধরে দর্শন করলেন। তারপর একদিন ''অভয়ং বৈ জনকঃ প্রাপ্তোসি''—কথাটার এক ব্যাখ্যায় পড়লেন জনক তুমি অভয়পদ প্রাপ্ত হয়েছে। মানুষটা অভয় হয় যখন সে জগতে একাই থাকে। দুই থাকলেই ভয়। কিন্তু এটা মনের বিচার। যেমন দুটি ট্রেন একই গতিতে একই দিকে ছুটলে ট্রেনের ভিতর বসে মনে হয় ট্রেন দুটি স্থির হয়ে আছে।

তাঁর একদিন ভয় হ'ল কে চা দেবে রে বাবা! কিন্তু সকালে যখন তার ভাইঝি তাকে চা দিতে এলো তখন তিনি বুঝলেন, বহু তো আছে! তাঁর অভয় দর্শনের মাধ্যমে তিনি বুঝলেন, এ হচ্ছে ব্যষ্টির সাধনের একটা অবস্থা—বিচারাত্মক, এ ঠিক নয়। সত্য হ'ল আত্মিকে আমি একাই আছি কিন্তু বাইরে বহু আছে।

ব্যষ্টির সাধন পূর্ণতা লাভ করলে তার effect পড়ে মনুষ্যজাতির মধ্যে। শ্রীরামকৃষ্ণের ক্ষেত্রে ব্যষ্টির সাধন হয়েছিল কিন্তু আংশিক। তার বস্তুতত্ত্বের সাধন হয়ে ভগবান দর্শন হয়েছিল কিন্তু ভগবান লাভ হয়নি। স্তরভিত্তিক সাধন হলেও তা ধারাবাহিক সাধনক্রম অনুযায়ী এবং পূর্ণমাত্রায় (sequential and synchronised) হয়নি। কারণ তার কিছু সংস্কার ছিল যদিও তার শিকড় গভীরে প্রোথিত (deep rooted) ও বিস্তৃত ছিল না। বস্তুতত্ত্বের সাধনের নিরিখে মহাপ্রভু বা মহম্মদের অনুভূতিও ছিল দ্বিতীয় স্তরের। একমাত্র জীবনকৃষ্ণের মধ্যে স্তরভিত্তিক সাধনক্রম অনুসারে ও পূর্ণমাত্রায় হয়েছিল। তাই তার সাধন ক্রিয়াশীল হল, তিনি ভগবানে পরিবর্তিত হলেন এবং মনুষ্যজাতির মধ্যে তার চিন্ময়রূপ ফুটে উঠতে লাগল। তিনি বুঝলেন যে বস্তুতত্ত্বে ব্যষ্টির সাধন সবার হবে না কারণ সব মানুষ সংস্কারে জর্জরিত। তাছাড়া একজনের দেহে ব্যষ্টির সাধন হয়ে ষোলআনা আত্মা সংকলিত হলে আর কারোর ব্যষ্টির সাধন হয় না। কারণ আত্মা এক। তাই তার ব্যষ্টির সাধন সত্য হলেও যা সকলের হয় না তাকে তিনি গ্রহণ না করে ত্যাগ করলেন। এই ত্যাগের দুটি দিক (Aspect) রয়েছে। (১) বর্জন (discard) ও (২) বিলিয়ে দেওয়া (distribute)

বর্জন ঃ (ক) তার ব্যষ্টির সাধনের বিচারাত্মক অবস্থাটা বর্জন করলেন। পুরো ব্যষ্টির সাধনটা নয়। (খ) তার ব্যষ্টির সাধনের ফল স্বরূপ অন্য অনেকের মধ্যে ব্যষ্টির সাধনের কিছু prototype অনুভূতি হতে লাগল। এতে মানুষের অহংকার জাগলো। নিজেকে অন্যদের চেয়ে বড় ভাবতে লাগলো। তাই তিনি তার সাধনের ফল স্বরূপ অন্যদের মধ্যে এরূপ স্তরভিত্তিক ব্যষ্টির সাধনের বিষয়টি বর্জন করলেন। শ্রীজীবনকৃষ্ণকে সচ্চিদানন্দ গুরু রূপে পেয়ে সাধারণ মানুষেরও ব্যষ্টির সাধন হবে এই সম্ভাবনা ও ভাবনা নাকচ করে দিলেন।

তাদের আভাসে কুণ্ডলিনী জাগরণ ও অন্যান্য যোগজ লক্ষণকে আত্ম-সম্মোহন (self hypnotism) বলে অভিহিত করলেন। বস্তুত এগুলিও প্রোটোটাইপ—দর্শনগুলি বস্তুতত্ত্বে ব্যষ্টির সাধনের সমর্থন সূচক। এতে ব্যষ্টির সাধন কী তা

সাধারণ মানুষ বুঝবে ও স্বঘোষিত ভগবানদের ভণ্ডামি ধরতে পারবে। তবে এ সকল প্রোটোটাইপ দর্শনে প্রাণশক্তির কোন পরিবর্তন ঘটে না, চেতনার উত্তরণ ঘটে না।

ত্যাগের ২য় দিক —বিলিয়ে দেওয়া—নিজের সাধনের ফল মনুষ্যজাতির মধ্যে বিলিয়ে দেওয়া স্বতস্ফূর্ত বিক্ষেপের মাধ্যমে। এর ফলে মানুষ তাকে ভগবান রূপে, পরম ব্রহ্মরূপে দর্শন করছে। মনুষ্যজাতির ভগবান দর্শনের আশা পূরণ হচ্ছে। শুধু তাই নয়, সমষ্টিচৈতন্যের প্রকাশে বিক্ষেপের ২য় পর্যায়ে মানুষ তার রূপে স্বস্বরূপ দর্শন করছে, তবে adjusted form-এ যা ক্রিয়াশীল হয়ে মানুষের ব্রেণ পাওয়ার বাড়াচ্ছে, তাদের analytical brain হচ্ছে। ফলে সাধারণ মানুষও ২য় স্তরে ভগবান হচ্ছে, ধর্মকথার মর্মার্থ অনুধাবনে সমর্থ হচ্ছে।

(৫) প্রসঙ্গ ঃ কারণ ও মহাকারণ।

কারণ ও মহাকারণ নিয়ে আলোচনা সুদূর অতীত কাল থেকে চলে আসছে। আলোচনার ধারা যেভাবেই হোক না কেন এটা মূলত সৃষ্টির সঙ্গে সর্ম্পক যুক্ত। তন্ত্র সাধনার মূল কথাই হলো সৃষ্টির কারণ খোঁজা। আগমতন্ত্রে (শৈব তন্ত্রে) দেহ ভাণ্ড ও ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির কারণ মূলত এক বলা হয়েছে। তাদের ধারণা ছিল দেহের মধ্যেই সবকিছু। কিন্তু সেটা নিয়ে বেশিদূর এগোতে পারেনি। ফলে তারা সৃষ্টি বলতে মূলত বাইরের সৃষ্টিতেই তাদের ভাবনা আবদ্ধ রেখেছে। শাক্ত তন্ত্র তো বাইরের সৃষ্টির কথাই বলেছে। আসলে তন্ত্র একটা পদ্ধতি বিশেষ যে পদ্ধতি থেকে জানা যায় সৃষ্টির কারণ কী বা কে। তাদের দেহতত্ত্ব রক্তমাংসের দেহের ধারণায় পর্যবসিত হওয়ায় তারা ব্যক্তি মানুষের মধ্যে আত্মিক জগৎ বা আত্মিক চৈতন্য সৃষ্টির কারণ তথা মহাকারণ সম্বন্ধে কোন স্পষ্ট ধারনা দিতে পারেনি।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন যে মহাকারণে গেলে লয় হয়ে যায়। তিনি এখানে স্থূলদেহের লয় অর্থাৎ মরে যাওয়ার কথা বলতে চেয়েছেন যা নিছক কল্পনা। কারণ মরে গিয়ে কারণ বা মহাকারণ হয়ে ওঠা হয় না।

শ্রীজীবনকৃষ্ণ বললেন, মহাকারণ হচ্ছে সেই মানুষের চিন্ময় রূপ যার জীবদ্দশাতেই তাঁর চৈতন্যসত্তা জগৎচৈতন্যে পরিবর্তিত হয়েছে। তাই পদ্ধতিটা হচ্ছে আত্মিক সত্তার evolution, বিবর্তন। ব্যষ্টিতে সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের মাধ্যমে অর্থাৎ আত্মা সাক্ষাৎকার, আত্মার সাধন ও স্থিত সমাধি হয়ে ব্যষ্টিচৈতন্য এক অখণ্ড জগৎচৈতন্যে পরিবর্তিত হয়। সাধনতত্ত্বে এই অবস্থাটাই মহাকারণ হয়ে

ওঠা। এই রকম একজন জ্যান্ত মানুষের চৈতন্য মনুষ্যজাতির মধ্যে বিক্ষেপিত হয় এবং অন্য বহু মানুষের আত্মিক চৈতন্য সৃষ্টির কারণ হয়ে ওঠেন তিনি।

আসলে প্রতিটি মানুষের মধ্যে জগৎচৈতন্য অবিকশিত (unmanifested) অবস্থায় থাকে, জীবনকৃষ্ণের ভাষায় জগৎচৈতন্যের ছাঁচ থাকে। যিনি জগৎ-চৈতন্যের ধারক ও বাহক তার চৈতন্যের ক্রিয়াশীলতায় অপর বহু মানুষের ভিতরে তার চিন্ময় রূপ ফুটে ওঠে। তাদের প্রাণশক্তির পরিবর্তন হতে থাকে ও তারা ধীরে ধীরে তাকে স্বস্বরূপ বলে উপলব্ধি করে। অর্থাৎ জগৎ চৈতন্য ও তাদের ভিতরের প্রাণশক্তি যে এক তা উপলব্ধি করে। সুতরাং একজন মানুষ জীবদ্দশাতেই মহাকারণ হয়ে ওঠেন।

এই পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় শ্রীরামকৃষ্ণ বা পূর্ববর্তী কোন আচার্যই কারণ হয়ে উঠতে পারেন নি। শ্রীজীবনকৃষ্ণ মহাকারণ হয়ে উঠেছেন। আর যে সকল দেহে তার চিন্ময় রূপ প্রকাশ পাচ্ছে সেখানে তিনি কারণ রূপে ও স্ব-স্বরূপ রূপে প্রকাশ হচ্ছেন। যেমন সিনেমার ফিল্মের (film) মধ্যে দিয়ে Adjusted form-এ আলো গিয়ে পর্দায় ছবি তৈরী করে। এখানে আলো হচ্ছে কারণ, ফিল্ম হচ্ছে জগৎচৈতন্যকে বোঝার ব্যবস্থাপনা তথা তার ছাঁচ আর পর্দা হচ্ছে সূক্ষ্ম মন বা কারণ শরীর। যিনি মহাকারণ হয়েছেন তার ভিতরের বস্তুগত জগৎচৈতন্যের ক্রিয়াশীলতায় (আলোয়) সাধারণ মানুষের ভিতরের un manifested জগৎ চৈতন্য (film) ক্রিয়াশীল হয় ও তাদের কারণ শরীরের (পর্দার) গঠনের পরিবর্তন ঘটিয়ে স্ব-স্বরূপ রূপে মহাকারণ হয়ে যাওয়া মানুষের চিন্ময় রূপ প্রকাশ পায়।

এখানে সৃষ্টি হল স্বস্বরূপ আর তার সৃষ্টিশীলতা হল আলোর কারসাজি তথা adjusted form-এ সমষ্টি চৈতন্যের ক্রিয়া। আমাদের ভিতরের জগৎচৈতন্যকে সমষ্টি চৈতন্য সক্রিয় (active) করেন, আমাদের চেতনা দ্বারা তা নিয়ন্ত্রিত নয়।

বাহ্যিক চেতনা আমাদের মনকে নিয়ন্ত্রণ করে কিন্তু ভিতরে শিবচৈতন্য বা জগৎ চৈতন্য জাগ্রত হলে তা আমাদের মনে সঞ্চালিত হয় অর্থাৎ আমাদের মনকে control করবে। ধীরে ধীরে আমাদের সূক্ষ্ম মনের গঠনের স্থায়ী পরিবর্তন হবে। এইভাবে আমরা সত্তাহীন অস্তিত্ব হয়ে উঠবো। এই অস্তিত্ব নিয়ে আমরা বুঝতে পারবো যে দেহভাণ্ড ও ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির কারণ মূলত এক অর্থাৎ কারণ ও মহাকারণ রূপে এক অখণ্ড মানব-চৈতন্যকে বোধে বোধ করবো।

(৬) প্রসঙ্গ ঃ অখণ্ড মহাযোগ—শূন্যম্।

অখণ্ড মহাযোগ নিয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে জীবনকৃষ্ণ বলেছেন, অখণ্ড মানে শূন্য। শ্রীরামকৃষ্ণ যখন স্বামীজী সম্বন্ধে বলছেন, ওর অখণ্ডের ঘর, সেখানে অখণ্ড মানে শূণ্য বলতে মনের লয় হয়ে যাওয়ার কথা বলা হয়েছে।

এখানে কিন্তু শূন্যম হল অখণ্ড এক চৈতন্য সত্তা যা একজ্ঞান রূপে প্রকাশিত। এই শূন্যম অবস্থা দু'দিক থেকে আলোচনা করা যায়।

(১) একজন মানুষের চৈতন্য সত্তা নির্গুণে লীন হয়ে অখণ্ডে পরিবর্তিত হয় এবং অন্য অনেক সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রকাশ পেয়ে তাদের পরিবর্তন ঘটিয়ে আত্মিকে তাদের প্রকৃত স্বরূপ বা real identity দান করে। শূণ্যের যেমন একটা additive identity আছে সেই রকম অখণ্ড চৈতন্য সাধারণ মানুষের মধ্যে আত্মিকে additive identity (যোগজ পরিচিতি) রূপে আত্মপ্রকাশ করে। গণিতের ক্ষেত্রে যে কোন রাশির সঙ্গে শূণ্য যোগ করলে ফলাফল হিসাবে সেই রাশিটির প্রকৃত মান পাওয়া যায়। তাই শূণ্যকে বলে additive identity. একটু গভীরে ভাবলে বোঝা যায় যে শূণ্য যোগ করার আগের রাশিটি ও শূণ্য যোগ করার পরে ঐ রাশিটির মধ্যে বাহ্যিক কোন পার্থক্য না থাকলেও পরের রাশিটির ভিতরে একটি পরিবর্তন সংঘটিত হয়। শূণ্যকে ভিতরে ধারণ করে সে শূণ্যের যোগজ পরিচিতি বহন করে। x এবং x এর সঙ্গে 0 যোগ করে যে নতুন x হয় ($x+0=x$), এই দুই x-এর মধ্যে বিস্তর পার্থক্য ঘটে যায়। দ্বিতীয় x-এর ভিতর শূণ্য আছে কিন্তু বাহ্যত সে x। এই উপমাটিকে আত্মিকে আলোচনা করলে অখণ্ড চৈতন্য ও শূণ্যম যে সদৃশ তা বোঝা যায়।

প্রথম x রাশিটিকে জৈবীসত্তাযুক্ত সাধারণ মানুষ ধরা হচ্ছে যাদের মধ্যে অখণ্ডের সত্তা সুপ্ত কিন্তু $x+0$ করে যে x পাওয়া যায় তা সেই সব সাধারণ মানুষকে বোঝায় যাদের মধ্যে এক অখণ্ডের প্রকাশ ঘটে তাদের কারণশরীরে গঠন মূলক পরিবর্তন ঘটায়। ধীরে ধীরে তাদের জৈবীসত্তা সম্পূর্ণ প্রতিস্থাপিত হয় সেই অখণ্ড চৈতন্য সত্তার দ্বারা। এই সত্তা তাদের মধ্যে একটি রূপ পায়। এই সত্তাকে সে আপন সত্তা বলে বোধে বোধ করে। এই সত্তাই আত্মিকে মানুষটির পরিচিতি বহন করে। ইনিই তার স্ব স্বরূপ (Real self)। x-এর সঙ্গে 0 যোগ করে যে নতুন x পাওয়া যায় তা বাহ্যিকে যেমন x-ই থাকে তেমনি সাধারণ মানুষের মধ্যে শূণ্যমের প্রকাশ ঘটলেও বাহ্যিকে মানুষটির রূপের কোন পরিবর্তন হয় না। কিন্তু আত্মিকে আমূল বদলে গিয়ে প্রকৃত স্বরূপে অবস্থান

করে। তাই অখণ্ড চৈতন্য ও শূণ্যম্—একই অবস্থার কথা বলা হয়েছে।

(২) শূণ্যম অবস্থার দ্বিতীয় দিকটি হ'ল—যে অবস্থায় পৌঁছালে আর কিছু জানার থাকে না অর্থাৎ একজ্ঞানে পৌঁছায়। স্থিত সমাধিতে একজ্ঞানে পৌঁছালে সাধক বোধাতীত হন। সমস্ত বোধের অতীত হন মানে আর কিছু জানার বাকী থাকে না। এই অবস্থাটাই শূন্যম্। আমি একাই আছি —এই একজ্ঞান শূণ্যের মতই অপরিবর্তনীয়। যে কোন আত্মিক জ্ঞানের সাথে এই একজ্ঞান যুক্ত হলে তা নিজে অপরিবর্তিত থাকে কিন্তু যার সাথে যুক্ত হল সেই খণ্ড জ্ঞানের পরিবর্তন ঘটায়, একজ্ঞানে পরিবর্তিত করে নেয়।

আগের উপমা থেকে বলা যায় যে, যে কোন রাশির সঙ্গে যুক্ত হওয়া রাশিটি কেবলমাত্র শূণ্য হলেই additive identity হিসাবে তা অপরিবর্তিত থাকে ও রাশিটির অপরিবর্তনীয় মানকে প্রকাশ করে। Additive identity হিসাবে যেমন শূণ্য ছাড়া অন্য কোন অপরিবর্তনীয় সংখ্যা হতে পারে না, সেই রকম অন্য সাধারণ মানুষের যে সমস্ত খণ্ড জ্ঞান থাকে (ভক্তি বা জ্ঞানের বিষয়) তার সাথে একজ্ঞান যুক্ত হলে একজ্ঞানের কোন পরিবর্তন হয় না। বরং খণ্ডজ্ঞান গুলো একজ্ঞানে পরিবর্তিত হয়। যেমন ইষ্ট সম্বন্ধে তার ধারণা বা ভক্তি সম্বন্ধে তার জ্ঞানের সঙ্গে যখন একজ্ঞান যুক্ত হয় তখন খণ্ডজ্ঞান গুলি চলে গিয়ে একজ্ঞানে পরিবর্তিত হয়। একজ্ঞানের নিরিখে সবটা দেখার দৃষ্টি জাগে। এই একজ্ঞান চূড়ান্ত অপরিবর্তনীয়। আর এই এক জ্ঞান লাভ হলে আর কিছু জানার বাকী থাকে না। এই অখণ্ড চৈতন্যের সঙ্গে একত্বলাভই সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে একজ্ঞান হওয়া। তাহলে তার সাথে এক হয়ে সত্তাহীন অস্তিত্ব মাত্র হয়ে একজ্ঞানে স্থিতিলাভ করে থাকাটাই শূণ্যম্ অবস্থা। সুতরাং এই দুদিক থেকেই বলা যায় যে আত্মিকে অখণ্ড ও শূণ্যম্ একই অবস্থাকে বোঝায়।

(৭) প্রসঙ্গ ঃ অহং ব্রহ্মাস্মি।

১৯৫৯ সালের কোন একদিন সকালে শ্রীজীবনকৃষ্ণের ঘুম ভাঙলো ''অহং ব্রহ্মাস্মি'' বলতে বলতে। ঘুম সম্পূর্ণ ভাঙার আগে তিনি নিজেই বলছেন, কে একথা বলেছে? ঘুম ভাঙার পর ভাবলেন, একথা তো ঋষি বলে গেছে। কিন্তু ব্রহ্ম যে কী তা বলেন নি। অথাতো ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা রয়েই গেছে। বেদ বলছে, ব্রহ্ম একা ছিলেন, নিজের রস নিজে আস্বাদন করার জন্য বহু হলেন। ওদের ব্রহ্ম যেন physically সৃষ্টি করছে। না, তা নয়। physically সৃষ্টি হলে

একজনের রূপ সকলের হতো। আসলে যিনি ব্রহ্ম হয়ে ওঠেন তিনি সকলকে নিজেতে পরিবর্তিত করে নেন।

physically সৃষ্টি বলতে বাস্তব রক্ত মাংসের দেহ নিয়ে রূপ সৃষ্টির কথা বোঝানো হয়। এখানে তা প্রযোজ্য নয়। কারণ মানুষ তো আগেও ছিল। একজন মানুষ ব্রহ্ম হল আর তার থেকে বহু মানুষ সৃষ্টি হল-এমনটা নয়। এক ব্রহ্মের বহু হওয়ার কথা রামায়নেও পাওয়া যায়। বিষ্ণুই রাম, লক্ষ্মন, ভরত, শত্রুঘ্ন সবই হয়েছে। কিন্তু বাহ্যিক দেহগত রূপ ও গুণ তো সকলের এক করেনি। ভরতকে দেখলেই রামকে দেখা হয়ে যায় এমন কথাও বলেনি। কিন্তু তারা আত্মিক জগতে যে সৃষ্টির কথা বলেছে তা বস্তুত Physical (স্থূল) সৃষ্টিই। তবে এই Physical সৃষ্টি মানে ভৌত পরিবর্তন।

এই ভৌত পরিবর্তনের তিনটি দিক আছে।

(১) এই পরিবর্তন অস্থায়ী, আবার পুরোন জায়গায় (অবস্থায়) ফিরে আসে। (২) একজনই বহু হয়েছেন বলে মনে হয়। (৩) এই পরিবর্তন ইন্দ্রিয়গোচর। বৈদিক যুগ থেকে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ পর্যন্ত আত্মিক জগতের পরিবর্তন মূলত ভৌত পরিবর্তনই হয়ে এসেছে। প্রথমত এই পরিবর্তন আত্মিক জগতের হলেও তা স্থায়ী নয়। শ্রীরামকৃষ্ণের ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাই যে তার প্রাণশক্তির পরিবর্তন চতুর্থভূমি পর্যন্ত স্থায়ীত্ব লাভ করেছিল। তিনি নিজেই বলছেন, "মা, আমার মন নীচে নামিয়ে রেখেছে।" তাই তার ভিতরের পরিবর্তন ভৌত পরিবর্তনের মধ্যে পড়ে।

দ্বিতীয়ত একজনের রূপ সকলের বলে ভাবনা। যেমন ছাঁচে ফেলে সন্দেশ তৈরী করলে দেখা যায় যে সব সন্দেশের অবস্থা একই রকম। সকলের গুনও একই রকম। যেন একজনের রূপ সকলের হয়ে যাচ্ছে। অর্থাৎ এক ব্রহ্ম যেন টুকরো টুকরো হয়ে বহু হয়েছেন। এখানে রূপ বলতে রক্তমাংসের দেহগত রূপের কথা বলা হয়নি। ব্রহ্ম স্বরূপের কথা বলা হয়েছে। তাহলে ভরত বা শত্রুঘ্ন, বা লক্ষ্মণ যে কাউকে দেখলেই রাম বা ব্রহ্মকে দেখা হয়। অর্থাৎ আত্মিকে সকলেই ব্রহ্ম হয়ে যায়। ব্রহ্ম সম্পর্কে এইরূপ একটি concept যা আসলে কল্পনা যেন রূপ ধারণ করে। এই ভাবনাকেই Physically সৃষ্টি বলে। বেদের "তত্ত্বমসি" কথার মধ্যেও একই বক্তব্য নিহিত আছে। রামকৃষ্ণের চিন্তাতেও এর প্রভাব লক্ষ্য করা যায় যখন তিনি বলছেন, তোমরা সব বসে আছো, আমি দেখছি এক রাম-ই সব হয়েছে।

তৃতীয়ত এই পরিবর্তন ইন্দ্রিয়গোচর। অর্থাৎ বাহ্য অবস্থা দেখে বিচার করা হয়। যেমন জল বরফ হলে বাহ্যিক অবস্থা দেখেই বলা হয় যে তরল থেকে কঠিন হলো। সেই রকম রামকৃষ্ণের ভক্তেরা তার পরিবর্তনকে বাহ্যিক দিক থেকে বিচার করছে। বাহ্যিক কিছু আচরণ দেখে তাকে অবতার বলে ঘোষণা করেছে। তাদের চিন্তা ভাবনা ব্রহ্মের জগতে থাকে নি। কিন্তু ব্রহ্মের বহু হওয়া আসলে আত্মিক জগতে evolution বা বিবর্তনের বিষয়। প্রথমত একজন মানুষের মধ্যে self evolution হয় অর্থাৎ তার প্রাণশক্তি রাজযোগের মাধ্যমে যেন রাসায়নিক পরিবর্তন (chemical change) হয়ে এক অপরিবর্তনীয় অবস্থায় পৌঁছায়। এ যেন কয়লার রাসায়নিক পরিবর্তনে হীরক হয়ে ওঠা। তারপর হীরকের জ্যোতির মতো তিনি নিজেকে বহু মানুষের মধ্যে বিক্ষেপিত করেন। মানুষের প্রাণশক্তির গঠনমূলক পরিবর্তন ঘটান। তারা তাদের স্বস্বরূপ দর্শন করে ও তাতে পরিবর্তিত হয়। তারা একত্ব লাভ করে। বলা যায় ব্রহ্মই বহু হয়ে নিজের ব্রহ্মত্ব বা একত্বের রস পান করেন।

এই রকম self evolution হয়ে পরমব্রহ্ম হয়ে ওঠার বিষয়টি ঘটল শ্রীজীবনকৃষ্ণের মধ্যে। তার মধ্যে স্থায়ী পরিবর্তন ঘটল। আত্মিকে রাসায়নিক পরিবর্তনের মাপকাঠি হলেন তিনি। নিজে ব্রহ্ম হয়ে ব্রহ্ম যে একজন জীবন্ত মানুষ (ক্রিয়াশীল জগৎচৈতন্য) তা বুঝে তিনি বলতে পারলেন—"অহং ব্রহ্মাস্মি।" তাঁর ১৯৫৯ সালের এই অনুভূতিটাই বোঝায় যে তিনি ব্রহ্মের আঙিনাতেই ছিলেন। কোন সময়েই এমনকি ঘুমের মধ্যেও ঐ চিন্তন থেকে বিচ্যুত নন। অর্থাৎ স্থায়ী-ভাবে অতিসূক্ষ্ম মনে বিরাজ করতেন।

অসংখ্য মানুষ তাকে অন্তরে দর্শন করে ঘোষনা করে যে তিনি এক আবার বহু। বাইরে থেকে বিচার করে নয়, অন্তরে পরিবর্তিত হয়ে সত্তাহীন অবস্থায় পৌঁছে যায়। কিন্তু তাদের অস্তিত্ব থাকে। এই পরিবর্তন আত্মিকে রাসায়নিক পরিবর্তন। সকলকে আত্মিকে নিজেতে পরিবর্তিত করেন। সাধারণ মানুষের জৈবী সত্তা প্রতিস্থাপিত হয় তাঁর ব্রহ্মসত্তায়। তখন তাদের যে সত্তাহীন অস্তিত্ব থাকে তা Physical সৃষ্টি নয়। কারণ আগে জৈবী সত্তা নিয়ে তার অস্তিত্ব ছিল। সুতরাং জীবনকৃষ্ণের পরমব্রহ্ম সত্তা ক্রিয়াশীল হয়ে যখন বহু মানুষের মধ্যে তার অনুসত্তা সৃষ্টি করছেন তা স্থায়ী পরিবর্তন। সকলে ব্রহ্ম হয়ে ওঠে না কিন্তু সকলে এক ব্রহ্ম সত্তায় সত্তাবান—এই বোধ করার লক্ষ্যে এগিয়ে যায়।

তবে সাধারণ মানুষের বোধের পরিবর্তন এখনও যুগপৎ ভৌত ও রাসায়নিক অর্থাৎ তাদের সূক্ষ্ম মনের গঠনের পরিবর্তন স্থায়ী হয়নি। এক ব্রহ্মের আঙিনায় সর্বদা থাকতে পারে না। মাঝে মধ্যে ঐ চিন্তায় থাকলেও আবার দ্বৈতচিন্তায় মন নেমে আসে। যেমন একটা মোমবাতি জ্বললে তার কিছুটা পুড়ে নিঃশেষ হয় আর কিছুটা গলিত মোম থেকে যায়। সেই রকম আমাদের বোধরূপ মোমবাতির পরিবর্তন কিছুটা Physical আর কিছুটা chemical যুগপৎ চলতে থাকে। তবে এটা শুধু মাত্র বোধের দিক থেকে। ব্রহ্ম কোন সময় Physically সৃষ্টি করেন না। তিনি নিজের সত্তায় পরিবর্তিত করে নিয়ে নিজের রস নিজে আস্বাদন করেন।

(৮) প্রসঙ্গ ঃ তদাকারকারিত ও তা হবার উপায়।

এই তদাকারকারিত মানে কী? তদাকারকারিত হওয়ার উপায়ই বা কী? বেদ উপনিষদ ইত্যাদি হিন্দুশাস্ত্রে তদ্ বলতে ব্রহ্মকে বুঝিয়েছে আর ব্রহ্মের সাথে মিলনকে তদাকারকারিত বলেছে। কিন্তু তদ্-এর আকার অর্থাৎ ব্রহ্মের রূপ সম্বন্ধে পরিষ্কার করে কিছু বলতে পারেনি। যদিও একটা ধারনা বা concept-এর কথা বলতে চেয়েছে তবুও এর concrete form বা বাস্তব রূপ সম্বন্ধে মানুষ অন্ধকারেই থেকে গেছে। এমনকি ঠাকুর রামকৃষ্ণও এই তদ্‌টি যে কে তা বলতে পারেন নি। ''নুনের পুতুল সমুদ্র মাপতে গিয়ে গলে গেল।'' এই ধরণের উপমা দেওয়াতে ''তদাকারকারিত'' কথার কথা হয়েই রয়ে গেল। আসলে একজন মানুষের এই অবস্থা হয় অর্থাৎ একজন মানুষ ব্রহ্ম হয়ে ওঠেন। একজন মানুষের ব্যক্তিচেতনা জগৎচেতনায় পরিবর্তিত হয়। সেই মানুষের রূপটাই ব্রহ্মের রূপ হয়ে যায়।

বস্তুতত্ত্বে একজন মানুষের স্থিতসমাধি হলে তদাকারকারিত হওয়া সম্ভব যা আমরা জীবনকৃষ্ণের মধ্যে দেখতে পাই। তাই তিনি বলছেন, তদ্ মানে আমার রূপ। আমার রূপ অর্থাৎ ব্রহ্মের রূপ। এই রূপ বলতে রক্ত মাংসের দেহের রূপের কথা নয়। ব্রহ্মের এরকম কোন রূপ হয় না।

এই রূপের দুটি দিক আছে। (১) অবয়ব—বাহ্যিক রূপ—তাঁর জৈবী দেহের চিন্ময় রূপ। (২) রূপের ধারনাগত দিক—ব্রহ্মের বিভিন্ন দিক জেনে ব্রহ্ম সম্বন্ধে একটি concrete concept বা বাস্তব ধারনা—যা ব্রহ্মেরই রূপ। এই দুই ভাবেই যিনি ব্রহ্মের ধারক ও বাহক হয়ে উঠলেন, তাকে জেনে ব্রহ্মকে জানা যায়। তিনি ধীরে ধীরে তার সাথে এক করে নেন। এইভাবে সাধারণ মানুষ একত্বলাভ

করে। এই একত্বলাভ-ই আমাদের দিক থেকে তদাকারকারিত বা ব্রহ্মের রূপে রূপায়িত হওয়া বা ব্রহ্মচৈতন্যে চৈতন্যময় হয়ে থাকা। তখন আমি সত্তাহীন অস্তিত্বমাত্র উপলব্ধি হয়।

এবার এই একত্ব লাভের কতকগুলি উপায় সম্বন্ধে আলোচনা করা যাক।

প্রথমত অবয়ব—ব্রহ্মের ধারক ও বাহক মানুষটির বাহ্যিক রূপ বা তাঁর স্থূল দেহের চিন্ময় রূপ। এই রূপে তার প্রকাশে সাধারণ মানুষের মধ্যে সুপ্ত ব্রহ্মচৈতন্য জাগ্রত হয়।

দ্বিতীয়ত রূপের ধারনাগত দিক—এক্ষেত্রে তার অবয়ব না দেখেও সাধারণ মানুষের সুপ্ত ব্রহ্মচৈতন্য জাগ্রত হয়। তার অবয়ব দর্শন ছাড়াও বিভিন্ন দর্শনে (স্বপ্ন ইত্যাদি) আমাদের চিন্তাশক্তির পরিবর্তন ঘটে। এই চিন্তাশক্তির পরিবর্তন হতে পারে তিনভাবে। (১) ভক্তিলাভ করে (২) সমষ্টি চৈতন্যের চেতন কণা পেয়ে মননে Brain Power বাড়ায়। (৩) প্রাণশক্তির গঠনমূলক পরিবর্তনে।

ভক্তি হলো চেতনার উপরিস্তর। এটি ব্রহ্মত্বলাভের ধারণাগত দিকের সূচনা। এই স্তরে অনেক সময় সাধক আট্‌কে যায় কিন্তু অনুশীলন বজায় থাকলে পরবর্তী প্রক্রিয়াটি শুরু হয়। ব্রহ্ম সম্বন্ধে মনন তার ব্রেণ পাওয়ার বাড়িয়ে দেয়। তার ভিতর চেতন কণা ক্রিয়াশীল হয়। ধীরে ধীরে প্রাণশক্তির গঠনের পরিবর্তন হয়। চেতনার পরিবর্তন হলেও যদি প্রাণশক্তির গঠনমূলক পরিবর্তন না হয় তাহলে বোধ স্থায়ী হয় না। ব্রহ্মচৈতন্যে চৈতন্যময় হয়ে তদাকারকারিত অবস্থা স্থায়ীত্বলাভ করে না।

তবে প্রথম উপায়টি অর্থাৎ ব্রহ্মের ধারক ও বাহক মানুষটির রূপ দেখে আত্মিক জগতে প্রবেশ একটি সহজতম উপায়। আমাদের স্বস্বরূপ সম্বন্ধে খুব সহজে ধারণা হয়। একজন ঐতিহাসিক মানুষের রূপ দিয়ে শুরু হলে ব্রহ্ম সম্বন্ধে নানান কাল্পনিক ধারনা মুছে ফেলতে সুবিধা হয়।

আসলে একত্বলাভের উপরিউক্ত চারটি উপায়, যথা (১) ব্রহ্মত্বলাভকারী মানুষটির চিন্ময়রূপ তথা অবয়ব দর্শন। (২) কোন দর্শনে ঈশ্বরে ভক্তিলাভ (৩) অনুচৈতন্যলাভ ও মননে ব্রেণ পাওয়ার বৃদ্ধি ও (৪) প্রাণশক্তির গঠনমূলক পরিবর্তন, পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন কোন উপায় নয়।

যে কোন একটি দিয়ে শুরু হয়ে বাকী প্রক্রিয়াগুলির ভিতর দিয়ে যায়। হয়তো কারুর ভক্তি দিয়ে শুরু হ'ল। পরে সে রূপ দেখলো কিম্বা হয়তো হঠাৎ কোন দর্শনে কারুর ব্রেণে মনন প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গেল, পরে ভক্তি জাগলো। এইভাবে

ঐ চার প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সাধারণ মানুষ একত্বলাভ করে। ব্রহ্মের রূপের ধারণাগত দিক বোধগম্য হয় এবং ব্রহ্মচৈতন্যে চৈতন্যময় থাকে অর্থাৎ তদাকারকারিত হয়। যেমন, দিনের বেলা সূর্যের আলোয় কোন কাজ করা, বা পথ দেখে অভীষ্টলক্ষ্যে পৌঁছানো যায়। সূর্যকে দেখাটা আবশ্যিক নয়। তেমনি জগৎচৈতন্যের ধারক বাহক যিনি তার বাহ্যরূপটি অন্তরে না দেখলেও একত্বের দিকে কোন মানুষ অগ্রসর হতে পারে, তার তেজ লাভ করে, তবে এই যাত্রাপথে কোন এক সময় অবশ্য ঐ রূপটি ফুটে উঠবে।

(৯) প্রসঙ্গ ঃ সকল চেতনার উৎস—জগৎ চৈতন্য।

অন্তর্চৈতন্য বা বাহ্যচৈতন্য যাই হোক না কেন উভয়েরই উৎস এক অখণ্ড চৈতন্য—জগৎ চৈতন্য। বস্তুতত্ত্বে জগৎচৈতন্যের ধারক ও বাহক হয়ে উঠেছেন শ্রীজীবনকৃষ্ণ। তাই তিনি বলেছেন, "I am the universe অর্থাৎ আমিই আত্মিক জগৎ। তোদের আত্মিকটুকু আমি, বাকীটুকু নয়।" বাকীটুকু নয় মানে বাকী কিছু নেই। এই বাকীটা অর্থাৎ ব্যবহারিক জগতের বাহ্যচৈতন্যের উৎসও যে আত্মিক চৈতন্য। বাইরের স্থূল মনও আত্মিকের সূক্ষ্ম মনের বিক্ষিপ্ত অবস্থার রিফ্লেকশন। তাই আত্মিকে মন কেন্দ্রিভূত হলে মনের বাইরের অংশও শান্ত হয়। বাইরের জগতে নানা activity আছে (Political, econmical, social ইত্যাদি) সেখানে মনের বিক্ষিপ্ত অবস্থার বহিঃপ্রকাশ ঘটে। রাম জগৎ সৃষ্টি করেছেন। তারই অযোধ্যা, তিনিই বহু হয়েছেন, অযোধ্যার সব মানুষজন হয়েছেন, দেবতা সকলও হয়েছেন এমনকি সুগ্রীবাদি বানরগণও হয়েছেন অর্থাৎ বাহ্যচৈতন্যও রামেরই। আবার তিনি আত্মিকে সকলকে তার সঙ্গে এক করে নিয়ে বুঝিয়ে দেন যে সকল চৈতন্যের উৎস তিনিই, তিনি অখণ্ড চৈতন্য।

এই অখণ্ডচৈতন্য বা জগৎচৈতন্য থেকেই আত্মিক চৈতন্য ও বাহ্যচৈতন্য, উভয়েরই সৃষ্টি। কিন্তু বাহ্যচৈতন্য যখন তাঁরই সৃষ্ট মায়ার প্রভাবে অহংযুক্ত হয় ও তার দ্বারা চালিত হয়ে মানুষ নানান আসক্তিতে জড়িয়ে পড়ে, ক্ষতিকর কাজ করে তখন বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়। তখন মনে হয় এই বাহ্যচৈতন্যের উৎস কি জগৎ চৈতন্য হতে পারে? তা যে হতে পারে একটি উপমা নিলে বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যাবে। তেজস্ক্রিয় পদার্থ (যেমন ইউরেনিয়াম-২৩৫) থেকে যে শক্তি পাওয়া যায় তার দুটি দিকই থাকে—শুভ ও অশুভ দিক। তা থেকে যেমন পারমানবিক বিদ্যুৎ তৈরী হয়, তেমনি পারমানবিক বোমাও তৈরী হয়। তাহলে এক্ষেত্রে শুভ ও অশুভ শক্তি উভয়েরই উৎস হল এক তেজস্ক্রিয় শক্তি।

সেইরকম কল্যাণকারী শুভশক্তি অন্তর্চৈতন্য ও ক্ষতিকর অশুভশক্তি অহংযুক্ত বাহ্যচৈতন্য উভয়েরই উৎস এক জগৎচৈতন্য। অন্তর্চৈতন্যের যত বিকাশ ঘটতে থাকবে তত ব্যবহারিক জগতে বাহ্যচৈতন্যও অহংশূন্য হবে, মায়ার প্রভাবমুক্ত হবে ও স্থূল মন সূক্ষ্ম মনে পরিবর্তিত হতে থাকবে। তাই জগৎচৈতন্য কর্তৃক আত্মিক নিয়ন্ত্রণ ও একত্বের চেতনা দান-ই মানব কল্যাণের একমাত্র পথ।

(১০) প্রসঙ্গ ঃ জন্ম মৃত্যুর রহস্যভেদ।

আদিকাল থেকেই মানুষ জন্মমৃত্যুর রহস্য নিয়ে চিন্তা করে এসেছে। তারা ভেবে এসেছে মানুষের রক্তমাংসের দেহ নিয়ে স্থূল জন্ম ও স্থূল মৃত্যুর কথাই। এই স্থূল দেহের জন্ম কিভাবে হয় আর মৃত্যুই বা কী সে রহস্য ভেদ্ করেছে বিজ্ঞান। কিন্তু আত্মিক জগতে জন্ম-মৃত্যুর রহস্য, রহস্যই থেকে গিয়েছিল। বর্তমানে তা অনেকটা পরিষ্কার হয়েছে।

যখন আত্মিক জগতে কোন দর্শন হয় অর্থাৎ আত্মিক চৈতন্যের স্ফুরণ ঘটে এবং মন অন্তর্মুখী হয়ে ঈশ্বরচিন্তায় লীন হয়, যখন অন্তরে ঈশ্বরকে অনুভব করে তখনই একটা মানুষের প্রকৃত জন্ম হয়। ব্রহ্মচৈতন্য থেকে সৃষ্ট চৈতন্য একটি মানুষের মধ্যে দ্বিবিধ চেতনার জন্ম দেয়—অন্তর্চৈতন্য ও বাহ্যচৈতন্য। কিন্তু এই বাহ্যচৈতন্য অহংযুক্ত হয়ে বিকারগ্রস্ত হয়ে ওঠে। নানান কুসংস্কার, আসক্তি, লোভ হিংসা ইত্যাদি তার বাহ্যচেতনাকে নিয়ন্ত্রণ করে। ফলে সে নেতিবাচক কাজ করতে শুরু করে। যেমন ঘি মানুষের খাবার কিন্তু বলা হয় কুকুরের পেটে ঘি সহ্য হয় না। ঘি খেলে লোম উঠে যায় অর্থাৎ নেতিবাচক প্রভাব পড়ে।

সেইরূপ ব্রহ্মচৈতন্যেরই বহিঃপ্রকাশ যখন বিকারগ্রস্ত হয়ে পড়ে তখন জীবসত্তা প্রকট হয়। তখনই নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। তাকে তার স্বরূপ ভুলিয়ে দেয়। এ অবশ্য ব্রহ্মসৃষ্ট মায়ার ক্রিয়া। মানুষের মন যখন এই মায়ায় আচ্ছন্ন হয়ে থাকে তখনই তার চেতনার মৃত্যু হয়। এ হলো আত্মিক মৃত্যু। চৈতন্যময় হয়ে থাকাই জীবন আর মায়াবদ্ধ হয়ে থাকাই মৃত্যু। এই জন্মমৃত্যুর পূর্ণ রহস্যভেদ হয় একজ্ঞানে অধিষ্ঠিত হলে। তখন মানুষ বোঝে যে, এক ব্রহ্মচৈতন্যই আছে আর সেখান থেকেই মায়ার দ্বারা বহু চেতনার সৃষ্টি হয়েছে।

স্মৃতিচারণ

স্মৃতিচারণ

শ্রীজীবনকৃষ্ণের পুণ্যসঙ্গলাভে ধন্য কিছু মানুষের টুকরো কিছু স্মৃতিচারণা লিপিবদ্ধ করা হল এই অধ্যায়ে।

নারায়ণ নন্দী—

১৯৫৭ সালের জুন মাসের একদিনের কথা মনে পড়ছে। আমি তখন কয়েকমাস হ'ল জীবনকৃষ্ণের ঘরে যাতায়াত করছি। তাকে নিয়ে অদ্ভুত সব দর্শনের কথা শুনে অবাক হতাম। কিন্তু সেদিন যে দর্শনের কথাটি শুনেছিলাম তার ঘোর কাটতে সময় লেগেছিল বেশ কিছুদিন। ভক্তেরা অনেকেই এসেছেন। উপেনবাবু সেদিন একটু সকাল সকাল এসেছেন। এরপর আমিও গিয়ে হাজির হলাম। সন্ধ্যা প্রায় ছ'টা বেজে গেছে। রামকৃষ্ণ সৌরেনদা, আনন্দদা, ভোলাদা, হীরুদা ও আরও অনেকে এলেন। জীবনকৃষ্ণ কথা প্রসঙ্গে বললেন, দেখ একদিন এই উপেন এসে আমায় বললে, ''আমি (উপেন) একদিন কলকাতায় দিনের বেলায় বাসে করে যাচ্ছিলাম। সঙ্গে এক বন্ধু ছিল। আমার সামনে আপনি দাঁড়িয়ে অনেক কথা বললেন। আর বললেন, তুই গায়ত্রী জপ করিস, তা ভালো। আমার আঙুলে একটা পলার আংটি ছিল। আংটিটা ধরে বললেন, পলার আংটি পরে কী হবে? তারপর আপনাকে আমি আর দেখতে পেলাম না। আমার বন্ধু জিজ্ঞাসা করলো, উনি কে? আমি বললুম, আমি তো এঁকে জানি না।'' জীবনকৃষ্ণ পুনরায় বললেন, ''আমি তো তার কথা শুনে অবাক। আবার কী আশ্চর্য আমাকে তো বাসের ভাড়াও দিতে হয়েছিল।'' উপেনবাবুর এই দর্শনের কথা শুনে শুধু আমি নই ঘরের সকলেই সেদিন যার পর নাই বিস্মিত হয়েছিলেন।।

মনীন্দ্রনাথ দে—

৯ই ফাল্গুন, ১৩৬৭, আমার জীবনে এক স্মরণীয় দিন। সন্ধ্যের সময় ঘরভর্তি ভক্তগন বসে আছেন। আমিও ঘরের মাঝামাঝি বসে আছি। মনে একটা নিদারূণ শোক। ঠিক তার আগের সন্ধ্যেয় আমার মা আমাদের ছেড়ে চিরতরে চলে যান। অবশ্য আমার শরীরে কোনরূপ অশৌচের চিহ্ন ছিল না। কেননা আমি অশৌচ পালন করিনি। সাধারণ জামা কাপড় পরা অবস্থায় ভীড়ের মাঝে বসে

ছিলাম। তাই অন্যেরা কেউ আমার গুরুজনের বিয়োগ ব্যাথা কিছু টের পায়নি। বসে আবিষ্ট মনে কথামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা শুনছি। হঠাৎ আমার দিকে চেয়ে উনি বললেন, হ্যাঁরে মনি তোর খবর কী রে? আমি অবাক ও হতভম্ব হয়ে ভাবতে লাগলাম, কী আশ্চর্য! কোনদিন তো আমাকে মাঝপথে, পাঠ চলাকালীন অবস্থায় এমন মধুমাখা ডাকে সম্বোধন করে কোন কিছু জিজ্ঞেস করেন নি। আজ ঐভাবে হঠাৎ জিজ্ঞেস করাতে চকিতেই মনের নিদারুণ বিষন্নতা ও শোকাশ্রু দূরীভূত হয়ে সঙ্গে সঙ্গে তা আনন্দাশ্রুতে রূপান্তরিত হয়েছিল। আজও সেকথা ভুলবার নয়।

জবাব দিয়েছিলাম, আমার মা কাল সন্ধ্যায় মারা গেছেন। তখন পাশে ছিলেন চারুবাবু, তিনি আমার পিঠে হাত বুলিয়ে সান্ত্বনা দিয়েছিলেন। শ্রীজীবনকৃষ্ণও সব ঘটনা জিজ্ঞেস করে শুনে নিলেন এবং ঐদিন কি স্বপ্ন দেখেছি তাও জিজ্ঞেস করে ক্ষিতিশবাবুকে স্বপ্নের ব্যাখ্যা বলতে বলেছিলেন।

(২) আর একটা দিনের ঘটনাও জীবনে কখনও ভোলা যাবে না। সেটা দুর্গাপূজার অষ্টমীর দিন। সকালে মনে উদয় হল যে এতখানি বয়স হ'ল কখনও তো মা দুর্গার কাছে অঞ্জলি দেওয়া হয়নি, সেই স্কুলে সরস্বতী পূজা ছাড়া। সকলে অঞ্জলি দেয়, তাই আমার মনে হল অঞ্জলি না দিয়ে বোধ হয় ভুল করছি। এই ভেবে ঐদিন সকালেই স্নান সেরে নিলাম মা দুর্গার কাছে আজ অঞ্জলি দেব। তৈরী হয়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়লাম। প্রথমে পাড়ার পূজা মণ্ডপে দাঁড়ালাম অঞ্জলি দেবার আশায়। সেখানকার দৃশ্যাবলী দেখে মনে কী একটা খট্‌কা লাগাতে ওখান থেকে পালালাম। খানিক এগিয়ে আবার এক পূজা মণ্ডপে এলাম। সেখানেও ঐ ভাব জাগলো, পালালাম। এইরকম আরও তিন চারটি প্যাণ্ডেল ঘুরে শেষে কদমতলার মোড়ে পূজামণ্ডপে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে ভাবছি যে কী করবো। সময় চলে যাচ্ছে। মনে তখনও কী একটা খটকা রয়ে গেল। কোথাও কোন পূজার স্থানে এতটুকু ভক্তি এসে সাড়া দিল না প্রাণে। সব জায়গা থেকে সরে যেন দৈবচালিত হয়ে অজ্ঞাতসারে চলেছি শ্রীজীবনকৃষ্ণের ঘরের দিকে। আমার বাড়ি ও তাঁর ঘরের দূরত্ব প্রায় আধঘণ্টার। আমি কিন্তু তাঁর কাছে যাব বলে ঐ দিন পথে বার হইনি। তাছাড়া সেই সময় আমি ওর কাছে বেশির ভাগ বিকেলের দিকে যেতাম। ক্বচিৎ কখনও সকালে যেতাম। সেদিন সকালে গিয়ে পড়তেই শ্রীজীবনকৃষ্ণ বলে উঠলেন, আয় বাবা আয়, কেমন আছিস? বস্। উনি তখন মেঝেতে খাটের পায়ার কাছে বসে। এবার আমি

ঘরের মাঝখানে বসলাম্। পাশে আর দু'একজন কারা যেন এসে বসলেন, তা আজ আমার মনে নেই। দেখলাম অনেকেই বাইরের রক থেকে ওঁকে প্রণাম করে চলে যাচ্ছেন। উনি প্রতি নমস্কার করে মাঝে মাঝে হাতটা কপালে ঠেকাচ্ছেন। এর ফাঁকে আমি কখন ধ্যানস্থ হয়ে গেছি। পিঠ থেকে কী একটা সুড়সুড় করে মাথার মধ্যে এলো অনুভব করলাম। অমনি উনি আমার মাথার মধ্যে একটু বাম দিকে সর্ম্পূণ ফুটে উঠলেন বাবু হয়ে বসা অবস্থায়। যেই ওকে মাথার মধ্যে বসা অবস্থায় দেখতে পেলাম ঠিক সেই সময় দেখছি—মস্ত বড়ো একটা সাদা পদ্ম ফুল নিয়ে ওঁর পায়ে অঞ্জলি দিচ্ছি। ফুলটি ওঁর পায়ে দেওয়ার সাথে সাথেই ঢুলে পড়ে চমকে চোখ চেয়ে দেখি উনি আমার দিকে চেয়ে মৃদু হাসছেন। সঙ্গে সঙ্গে জিজ্ঞাসা করলেন, কী রে, কী দেখলি? ঘটনাসহ সবই বললাম।

দেখলাম স্মিত হাসি ওর মুখে। আমার দেহে ও মনে তখন অভূতপূর্ব অনাবিল আনন্দ। সঙ্গে সঙ্গে প্রাণভরা আশা মিটল অঞ্জলি দেওয়ার। আর সেই দিন থেকে বাইরে যতকিছু বৈধী পূজাপার্বন আছে সমস্ত মন থেকে একেবারে সরে গেল এক নিমেষে।

শৈলেন দে —

জীবনকৃষ্ণ কিভাবে যে মনের কথা জেনে যেতেন ভেবে অবাক হই। তখন তিনি কালী ব্যানার্জী লেনে থাকতেন। ওনার কাছে গিয়ে একদিন ওর দিকে চেয়ে চেয়ে ভাবছি যে এই রকম গুরু যদি পাই বেশ হয়। এই হ'ল ঠিক ঠিক উপযুক্ত গুরু। ঠিক সেই সময় উনি হেঁট হয়ে ওঁর কপালটা আমার কপালে ঠেকিয়ে মৃদু চাপ দিয়ে ও ঘষে বলে উঠলেন—বাবা মানুষ কখনও গুরু হতে পারে না, এক সচ্চিদানন্দই গুরু। তিনবার কথাগুলো বলে কপাল থেকে মাথা উঠিয়ে নিলেন। আনন্দে আর বিস্ময়ে স্থির হয়ে বসে রইলাম।

ক্ষিতিশচন্দ্র রায়চৌধুরী

(১) বেনারসে জীবনকৃষ্ণ শ্রীনাথ ভবনে প্রায় মাসাধিক কাল ছিলেন। আমি সেইসময়ে দিন কয়েক তার সঙ্গে কাটাবার ও অহোরাত্র সঙ্গ করবার সুযোগ পেয়েছিলাম। সেই সময় একদিন প্রত্যুষে আমি তাকে আত্মা সাক্ষাৎকার প্রসঙ্গে প্রশ্ন করেছিলাম। আচ্ছা, এই দর্শনটা আপনার কোন অবস্থায় হয়েছিল, ধ্যানে,

স্বপ্নে না জাগ্রত অবস্থায়? উত্তরে জীবনকৃষ্ণ আমার দিকে চোখে চোখ রেখে বলতে লাগলেন, বাবা, কথাটা বার করে নিলি! আজ পর্যন্ত কাউকেই আমি এ কথাটা বলিনি। কেউ প্রশ্নও করেনি। এই দর্শনটি হয় জাগ্রতে, সম্পূর্ণ শায়িত অবস্থায় যখন শরীরটা থাকে কমপ্লিটলি অ্যাট রেস্ট। তন্ত্রকার যেটা প্রতীকে দেখিয়েছে, শিব শব হয়ে পড়ে রয়েছেন। কালী অর্থাৎ আদ্যাশক্তি তাঁর উপর দাঁড়িয়ে ঠিক ''স্ব শরীরাৎ সমুত্থায়''। জ্ঞান যখন ফিরে এলো দেখি আমি শুয়ে আছি। কতক্ষণ এই অবস্থায় ছিলাম তা মনে নেই। জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দর্শনটি নিয়ে তাঁর এই স্মৃতিচারণ বেশ উপভোগ করেছিলাম।

(২) কদমতলার ঘরের আর একটি অভিজ্ঞতার কথা মনে পড়ছে। একদিন সন্ধ্যার সময় স্বল্প বিরতিতে বাইরে গেছিলাম। তারপর আবার ঘরে ঢুকতে গিয়ে দেখি রোয়াকে একটা দশ টাকার নতুন নোটের তারা ভাঁজ করে পড়ে আছে। মনে হ'ল কারুর বুক পকেট থেকে পড়ে গিয়ে থাকতে পারে। আমি সেটা তাড়াতাড়ি কুড়িয়ে নিয়ে ঘরে ঢুকেই চেঁচিয়ে বলে উঠলাম, দেখুন চেক করে কার পকেট থেকে এক তাড়া নোট পড়ে গেছে। কে একজন বলে উঠলেন, ও, ওটা আমার-ই। আমি তাকে দিয়ে দিলাম। যে যার জায়গায় বসার পর জীবনকৃষ্ণ আমার দিকে চেয়ে গম্ভীর মুখে বললেন, তুই কুড়িয়ে পেয়েছিস? বললাম, হ্যাঁ। উনি বললেন, আর কখনও কোন কিছু এরকম পেলে কুড়িয়ে নিবি না। কোনও কিছু কুড়িয়ে পেলে মালিককে সেটা ফেরৎ দেওয়ার কথা ভেবেছি কিন্তু এতটা নির্লিপ্ত হয়ে থাকার কথা আগে ভাবতে পারিনি।

(৩) একদিন কদমতলার ঘরে বলেছিলেন, কথামৃতে বর্ণিত ঈশ্বরের জগৎ নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে অবশ্য আমাকেই লক্ষ্য করে; ক্ষিতিশ, জগৎ নিয়ন্ত্রণ নিয়ে আমাদের মাথা ব্যথার দরকার নেই। কারণ আমরা জগৎকে নিজের দেহের ভিতর পেয়েছি। আত্মার মধ্যে জগতের পূর্ণানুভূতি একমাত্র তাঁরই হয়েছিল। কিন্তু এই টুক করে কথাটি আমাকে উদ্দেশ্য করেই বললেন এবং ঘর শুদ্ধ লোকই শুনলো। আমি এতো বড়ো ব্যাপারটা যেন এক মুহূর্তেই বুঝে গেলাম। কিন্তু বোধগম্য হয়নি। হয়তো সেদিন পরিবেশ এমনই অনুকূল ছিল। জগৎ নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে জীবনকৃষ্ণ আর একদিন বলেছিলেন, আমরা প্রত্যেকেই নিজের নিজের জগৎ নিয়ন্ত্রণ করছি নিজের কর্ম দ্বারা। সামনের বাড়ির দেওয়াল দেখিয়ে বললেন, ওই যে ঘুঁটে দিচ্ছে যে মেয়েটা আর দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে সে ঐ দুর্গন্ধ জগতে ছড়িয়েই জগৎ কণ্ট্রোল করছে।

অনাথ নাথ মণ্ডল—

জীবনকৃষ্ণের শরীর খুব অসুস্থ থাকায় ২০ শে জুন ১৯৬৭ থেকে ঘরে পাঠ একেবারেই বন্ধ ছিল। সেই সময় দু'একজন ওনার ঘরে গেলে উনি অল্প কিছু কথাবার্তা বলতেন। তখন আমাদের মধ্যে অনেকেই বিভিন্ন জায়গায় পাঠ করতেন। পাড়ার চৌধুরী বাবু যেখানে পাঠ করতেন সেই পাঠে একটি ঘটনা ঘটেছিল। আমাদের পাড়ার এক ভদ্রলোক, নাম অজিত বাবু, পেশা স্কুল মাস্টারি; পাঠে গিয়ে দেখেন—চৌধুরীবাবুর মুখ যেন জীবনকৃষ্ণের মুখ হয়ে গেছে। আরও আশ্চর্যের এই যে উনি নিজের মুখে হাত বুলিয়ে দেখছেন যেন দাড়ি হয়েছে ঠিক জীবনকৃষ্ণের মতো।

তাই শুনে জীবনকৃষ্ণ বললেন, স্বামীজি বলেছেন, God is beyond sense. আর এখানে কী দেখাচ্ছে? ভগবান অতীন্দ্রিয় বস্তু নয়, ডাহা ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য। একেই বলে ব্রহ্মজ্ঞান —'ত্বং জাতো ভবসি বিশ্বতোমুখ।' এখন বুঝিয়ে দিচ্ছে এই ঘরে আর পাঠের দরকার নেই। বাইরের পাঠচক্রে সব হবে। দেখাচ্ছে —যেখানে পাঠ হয় সেখানে পাঠকও আমি, শ্রোতাও আমি। হয়তবা সেইজন্যই এই অসুখ করিয়ে আমার ঘর বন্ধ করিয়েছে।।

মানিক (৮০ সংখ্যা)

ভূমিকা

শ্রীজীবনকৃষ্ণের দর্শন হয়েছিল, 'সামনে মুখ আছে—পিছন দিকে মুখ হয়ে গেছে, পিঠ দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। তখন আদ্যাশক্তি বালিকা মূর্তিতে এসে বলতে থাকেন, 'মুখ বাঁকিয়ে দে মা' ...জগৎ থেকে দৃষ্টি কুড়িয়ে অন্তরে ভগবানে নিবদ্ধ করো। বস্তুতত্ত্বে ব্যষ্টির সাধনে রাজযোগ হলে মন পূর্ণরূপে অন্তর্মুখী হয় ও তার প্রমাণ স্বরূপ এরূপ দর্শন হয়। মায়া মনকে বহির্মুখী করে। কিন্তু এই সাধকের ক্ষেত্রে সেই ভ্রমাত্মক মায়া সরে গিয়ে রহস্যময়ী মায়ার কৃপায় ভগবান দর্শন হয় ও পরে সাধক নিজেই ভগবান হয়ে ওঠেন। এর প্রমাণ স্বরূপ তিনি অসংখ্য মানুষের অন্তরে চিন্ময়রূপে ফুটে ওঠেন। তখন তিনি মুখ বাঁকিয়ে দেওয়ার নতুন তাৎপর্য খুঁজে পান। উপলব্ধি করেন জগতে প্রচলিত ধর্ম সমূহ ব্যষ্টিতে আবদ্ধ। মজেস থেকে আরম্ভ করে স্বামী বিবেকানন্দ পর্যন্ত সমস্ত আচার্য, অবতার, পরমহংস —ইত্যাদি সকলেই Thomas Carlyle-এর "Hero Worship" এর Hero, যেন মনুষ্যজাতি জগতে এসেছে শুধু তাদের পুজো করতে।

এই মুখ বাঁকাতে হবে অর্থাৎ প্রচলিত এই ধারা থেকে সরে আসতে হবে। সাধারণ মানুষকে আবহমানকালের এই অভ্যাস থেকে সরিয়ে আনতে হবে।

তিনি সাধারণ মানুষের ভিতরে স্বপ্নে দেখা দিয়ে তাদের মুখ বাঁকাতে শুরু করেন। ধর্ম জগতে সাধারণ মানুষের বহির্মুখী মন অন্তরে নিবদ্ধ হয়। আংশিক চিত্তশুদ্ধি হতে থাকে। মানুষগুরু থেকে মুখে ফিরিয়ে সচ্চিদানন্দগুরুতে দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়। কিন্তু ষোলআনা অন্তর্মুখী না হওয়ায় সূক্ষ্মমন লাভ হয়নি ও আত্মিক দেহের গঠন পুনর্গঠনের বিষয়টি ঠিকমতো অনুধাবন করা যায় নি। ফলে স্বপ্নের ব্যাখ্যা অনেক সময় অদ্বৈতে করা সম্ভব হচ্ছিল না।

এছাড়াও ব্যষ্টির সাধনের যোগৈশ্বর্য ও স্থূল দেহে ফুটে ওঠা লক্ষণসমূহ আবার তাদের বহির্মুখী করে তোলে সূক্ষ্ম ভাবে। তাদের মন স্থূল কুণ্ডলিনী জাগরণ, সমাধি, অষ্ট সাত্ত্বিক লক্ষণ ইত্যাদিতে নিবদ্ধ হয়। অর্থাৎ স্থূল দেহেতেই মন আবদ্ধ হয়। প্রচলিত ধর্ম সমূহের বহির্মুখীনতা থেকে মন সরে এলেও পুরোপুরি অন্তর্মুখী হয় না। ফলে জগৎ চৈতন্য সত্তাকে আপন সত্তা বলে

উপলব্ধি না হওয়ায় জীবনকৃষ্ণের স্থূল রূপটি গুরুত্ব পেয়ে যায়। যেমন বাড়ীতে তাঁর ছবি রেখে মালা দেওয়া, প্রণাম করা অর্থাৎ জীবনকৃষ্ণকে অন্তরে না নিয়ে পরোক্ষে তাকে কেন্দ্র করে সেই Hero Worship-ই চলতে থাকে।

তাই সমষ্টি চৈতন্যের প্রকাশে নির্গুণের ঘনমূর্তিরূপে ফুটে উঠে 'এই মুখ বাঁকাতে হবে' কথাটির প্রকৃত তাৎপর্য ধরিয়ে দিতে লাগলেন। ফলে সাধারণ মানুষের মন স্থূল দেহ থেকে আত্মিক দেহে নিবদ্ধ হতে শুরু করেছে। চেতনার বহির্স্তর থেকে মন এখন অন্তর্চেতন স্তরে প্রবেশ করছে, সূক্ষ্মমন লাভ হচ্ছে। ভ্রমাত্মক মায়া সরে গিয়ে আপন সত্তা উপলব্ধিতে মনন নিবদ্ধ হচ্ছে। জগৎচৈতন্য এখন একজন মানুষের স্থূলরূপে (অবয়বে) আবদ্ধ থাকছে না এবং তার ধারণাগত রূপটি বোধগম্য হচ্ছে। সাধারণ মানুষেরও রাজযোগ হয়ে মন অন্তর্মুখী হচ্ছে—পূর্ণ চিত্তশুদ্ধি হচ্ছে।

বিষয়টি এই পত্রিকায় বর্ণিত স্বপ্নের ব্যাখ্যা ও পাঠ প্রসঙ্গে আলোচনা থেকে কিছুটা বোঝা যাবে। আর যে সমস্ত পাঠক এই পত্রিকা পাঠ করে মননে নিমজ্জিত হবেন তাদেরও মুখ বেঁকে যাবে এই আশা রাখি।

২৬ কার্তিক ১৪৩০

স্বপন মাধুরী

জ্ঞানমূর্তি

● দেখছি (2.05.2023) —শুভাশিস আর আমি স্টেশনে আছি। ও টিকিট কাটতে গেল। এদিকে ট্রেন ঢুকে গেল। ছুটে শুভাশিসকে দেখতে গেলাম। টিকিট কাউন্টারের লাইনে ওকে দেখতে কিন্তু পেলাম না। এদিকে ট্রেন ছেড়ে দিল। হতাশ হলাম। প্লাটফর্মে এসে দাঁড়ালাম। অমনি আর একটা ট্রেন এল। তাতে একটা মাত্র বগি। তার সামনে ইঞ্জিন হিসাবে রয়েছে একটা বিরাট হাতির মাথা। হাতিটা চোখ পিটপিট করছে অর্থাৎ জীবন্ত। ঐ ট্রেনে উঠে পড়লাম শুভাশিসকে ছাড়াই।...ঘুম ভাঙল।

—স্নেহময় গাঙ্গুলী
চারুপল্লী

ব্যাখ্যা—হাতি = মন — অখণ্ড মন (সমষ্টিচৈতন্য)। শুভাশিস =দ্বৈতবোধ, দ্বৈতবোধে থাকলে ভগবানের আশিস প্রার্থনা করা হয়। ট্রেনে উঠলে = মননের মাধ্যমে দ্বৈতবাদ ছেড়ে সমষ্টি চৈতন্যের চেতনার ট্রেনে উঠলে অর্থাৎ তার সাথে একত্ব লাভ হলে এগোন শুরু হয়। হাতি টানছে এক কামরার ট্রেন = সমষ্টি চৈতন্যের চেতনার সঞ্চালনে একজ্ঞান উপলব্ধির পথে সাধারণ মানুষের গতি লাভ।

● দেখছি (6.05.2023) — অভিনেতা তুলসী চক্রবর্তীকে বলছি, তুমি তো পরশপাথর সিনেমা করেছিলে। আমাকে সত্যিকার পরশপাথর দেখাতে পারো? ও বলল, হ্যাঁ, পারি। তবে সে পথে যেতে কষ্ট হবে। বললাম, তোমাকে আমি অনুসরণ করবো। ওর পিছু পিছু গিয়ে অনেক কাঁটাবন পেরিয়ে একটা পাহাড়ের উপর উঠলাম। সেখানে দেখলাম একটা ধ্যানমগ্ন মানুষের আকৃতির বড় পাথর। ওটা দেখিয়ে বলল, এই হলো পরশপাথর। তারপর অদৃশ্য হল। হামাগুড়ি দিয়ে পাথরটার কাছে গিয়ে দেখি ওটা বরফের মূর্তি। মনে হল জ্ঞানের ঘনমূর্তি। একটু অপেক্ষা করতেই বরফ গলে গিয়ে ভিতরের রূপ স্পষ্ট হল—দেখি ও জয়কৃষ্ণ। খুব আনন্দ হল। আর মনে পড়ল, ঐ তো বলেছিল, ভগবান হ'ল জমাট বাঁধা জ্ঞান, একত্বের জ্ঞানের ঘনমূর্তি যার প্রকাশে অহৈতুকী আনন্দ লাভ হয়।।

—রেণু মুখার্জী
সখেরবাজার

ব্যাখ্যা ঃ তুলসী চক্রবর্তী নিয়ে চলেছেন = ভক্তি এগিয়ে নিয়ে চলেছে। কাঁটাবন পেরিয়ে = বহু খণ্ডজ্ঞানের স্তর অতিক্রম করে একজ্ঞান লাভের দিকে এগোনো। হামাগুড়ি = অনুচৈতন্য লাভে জ্ঞানের শিশু অবস্থায় পৌঁছানো—পরে একজ্ঞান লাভ হলে পরিণত অবস্থায় পৌঁছায়।

ভক্তিতে নয়

● দেখছি (18.07.23) — আমরা অনেকে গাড়িতে করে দাদুর বাড়ি যাচ্ছি। রাস্তার একটা গাছের তলায় হঠাৎ একটা হরিণ দেখা গেল। সবাই নেমে দেখি হরিণের শিং থেকে রক্ত বেরোচ্ছে। তাই আমি তাকে আদর করে আবার গাড়িতে উঠে পড়ি। একটু পর হরিণটা আমাদের গাড়ির পিছু পিছু এলেও আর দেখা যায় নি। দাদুর বাড়ি পৌঁছে দেখি ঘরদোর অন্ধকার আর খাটের উপর স্বয়ং জ্যোতিসম জীবনকৃষ্ণ বসে আছেন। উনি আমাকে বললেন, এইখানে বোস।...

চিত্রা দে
সখেরবাজার

ব্যাখ্যা—দাদু— আদিপুরুষ। হরিণ—ভক্ত। ভক্তিতে থাকলে প্রাণশক্তির অপচয় হয় —নির্গুণের ক্রিয়াশীলতায় ভক্তিকে অতিক্রম করে লক্ষ্যে পৌঁছানো যায়, একজ্ঞান হয়।

● দেখছি (21.07.2023) — আমার খুব ঠাণ্ডা লেগেছে, তাই বিষ্ণু কাকুর চেম্বারে গেলাম। উনি হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার। অনেক রুগীর লাইন পড়েছে। তাই বসে আছি। হঠাৎ খেয়াল হল বাঁ চোখের দৃষ্টিশক্তি কমে যাচ্ছে। ফোনে সেলফি নিয়ে দেখি চোখের কালো অংশ অর্থাৎ কর্নিয়া নেমে গেছে। কাকুকে সেটা বললাম। এবার দেখি বাঁ চোখে কর্নিয়া নেই, পুরোটা সাদা হয়ে গেছে। ডান চোখটাও সেরকম হয়ে যাচ্ছে। কাকু দেখে বলল, তোমাকে চোখের ভালো ডাক্তার দেখাতে হবে। আমার দ্বারা হবে না। তখন ভয় হ'ল। কী জানি চোখ ঠিক হবে তো?...ঘুম ভাঙলো।

—শোভন ধীবর
অবিনাশপুর

ব্যাখ্যা —বিষ্ণু কাকুর চেম্বারে —ভক্তির ঘর। বিষ্ণু অংশে জন্মালে ভক্তি হয়—শ্রীরামকৃষ্ণ। আমার দ্বারা হবে না —ভক্তি মানুষকে সঠিক দৃষ্টিভঙ্গী দান করতে অর্থাৎ একজ্ঞানের চেতনায় উত্তীর্ণ করে দিতে পারে না।। সেল্‌ফি তুলে দেখা—নিজে মননের মাধ্যমে নিজের দৃষ্টিভঙ্গির বিকৃতি বা ত্রুটি অনুধাবন করা।

ঋষি

● গত ফেব্রুয়ারী মাসে এক রাত্রে স্বপ্ন দেখছি — আমার মায়ের বয়সী একজন মহিলা আমাকে বলছেন, তোমার একটা বিশেষ গুণ আছে বলে তোমাকে আমার খুব ভালো লেগেছে। আমাকে বলো তো সেই গুণটা কী? তখন আমি বললাম, আমার বিশেষ গুণ হ'ল—আমি হচ্ছি ঋষি।... নিজের উত্তর শুনে নিজেই অবাক হয়ে গেলাম।...স্বপ্ন ভাঙলো।

—সনাতন সাহা

পাটুলী, কাটোয়া

ব্যাখ্যা —জীবনকৃষ্ণ রূপ অখণ্ডচৈতন্যকে অন্তরে পেয়ে মানুষ কুসংস্কার গুলিকে চিনতে পারছে ও তা কাটিয়ে উঠে একজ্ঞানের পথে ক্রমাগত এগোবার শক্তি পাচ্ছে — ঋষিত্ব লাভ করছে—আত্মিক জগতের মানুষের কাছে প্রিয় হয়ে উঠছে।

● আজ (6.9.23) মাঝরাতে একটা অদ্ভুত স্বপ্ন দেখলাম। দেখছি আকাশে সূর্য যেন সমুদ্রের ঢেউয়ে দোল খাচ্ছে। একটু পরে তারই আড়াল থেকে আর একটি সূর্য এসে ভাসতে থাকল। দৃশ্যটা এতো অপূর্ব যে আমি যেন চোখ কচলিয়ে নিয়ে আর একবার দেখতে চাইলাম এবং পেলামও। মোট তিনবার এই দৃশ্যটা আকাশে ভেসে উঠল। কী যে আনন্দ পেলাম কী বলবো!

—গৌতম চ্যাটার্জী

সরশুনা, কলকাতা

ব্যাখ্যা —নিজের চৈতন্যসত্তাকে (সূর্য) জানার জন্য দোদুল্যমানতা তথা conflict জাগছে, প্রশ্ন জাগছে। এই সময় আমরা আয়নার সামনে অর্থাৎ নিজের প্রতিবিম্বিত রূপের সামনে দাঁড়াই। নিজেকে প্রশ্ন করে দ্বন্দ্বমূলক অধ্যাত্মবাদের অনুশীলনের মাধ্যমে নিজের স্বরূপ স্বম্বন্ধে স্পষ্ট ধারনা লাভ করি। অখণ্ডচৈতন্য সত্তাকে আপন সত্তা বলে উপলব্ধি করে আনন্দ সাগরে ভাসি।

রাজযোগ

● স্বপ্নে দেখছি (9.07.2023) — বাদশা, মাধাই, ... এরা বলছে, এত লোককে জীবনকৃষ্ণের কথা বলছি, কেউ নিচ্ছে না। আমরা অল্প কয়েকজন জীবনকৃষ্ণকে নিয়ে আছি। ... যেন খুব হতাশ। আমি বিষয়টা জয়কে বলতে গেলাম। ও বসে ছিল এক জায়গায়। শান্ত কণ্ঠে বলল, সেই সত্যমূর্তি তথা একের কথা কী বলবে বলতো? তাকে কী বোঝানো যায়? বলেই পরপর কতকগুলো বিশেষণ বলল, ‘‘লতিফ, লতফ, স্বামীন, স্বামী...’’ এই রকম প্রায় ১৮/২০ টি শব্দ। আমি আমার মাস কাবারী হিসাবের খাতায় যখন লতিফ লিখেছি শুধু তখন জয় ওর খাতায় ২০ টি শব্দ লিখে ফেলেছে। আমি বললাম আমি পিছিয়ে পড়েছি, সব লিখতে পারিনি, তোমার খাতা দেখে টুকে নেব? তখন দেখি আমার খাতাটা সাদা হয়ে গেল। ওখানে জয়ের হাতে লেখা সব কথাগুলো ফুটে উঠল আর আমার মনে স্ফুরিত হল —‘এই হলো রাজযোগ’।...ঘুম ভাঙলো।

স্নেহময় গাঙ্গুলী
চারুপল্লী, বোলপুর

● দেখছি (23.06.2023) —জয় আমাকে অনেকক্ষণ ধরে পাঠের বিষয়ে অনেক কথা শোনাচ্ছে। আমি সব কথা বুঝতে পারছি, দেহ দিয়ে বুঝছি। দেহের ভিতর ক্রিয়া হচ্ছে, প্রচণ্ড আনন্দ হচ্ছে, ভিতরে আলোড়ন হচ্ছে। ঘুম ভাঙলো। উঠে বসলাম। তখনও শরীর কাঁপছে। ভাবছি স্বপ্ন দেখলাম নাকি জীবন্ত দেখলাম! আবার শুয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম। এবার স্বপ্নের মধ্যে মনে হচ্ছে আজেবাজে চিন্তা করছি। হঠাৎ জয় এসে আমাকে খুব জোরে বকে দিল। অমনি ভয়ে জড়োসড়ো হয়ে গেলাম।...ঘুম ভাঙলো।

—অচিন্ত্য গুপ্ত
বোলপুর

ব্যাখ্যা —দ্বিতীয় স্তরে দেহ দিয়ে বোঝা মানে সূক্ষ্ম দেহ তথা সূক্ষ্ম মন দিয়ে বোঝা।।

ভিতর হতে

● (30.07.2023) এ রাত্রে স্বপ্নে দেখছি—একজন গায়কের গান ভেসে আসছে। ভালোই লাগছে। কিছুটা দূরে দেখি জয় দাদা দাঁড়িয়ে আছে। ঈশারা করে বলল, গানটা মন দিয়ে শোন। আমি মন দিয়ে শুনলাম আর দাদাকেও মুখ নাড়তে দেখলাম। দাদা বলল, আরও মন দিয়ে শোন। আবার ভালো করে শুনলাম। তখন দেখি দাদা ও ঐ গায়ক একই গান গাইছে। কিছু আগে পরে হচ্ছে। ঠিক বুঝতে পারা যাচ্ছে না। অথচ তাল, সুর, ছন্দ সব একই। এবার দাদার দিকে তাকাতেই দাদা বললো, আরও মন দিয়ে শোন। আবার মন দিয়ে শুনতেই দেখি ঐ গায়ক আর দাদার গান এক হয়ে গেল। সিনেমার মতো গানের সাথে মুখের লিপ মিলে যাচ্ছে, ঠিক যেন ঐ গানটা দাদার মুখে আস্তে আস্তে মার্জ করে গেল। বুঝতে পারলাম ঐ গানটাও দাদারই গাওয়া, ভিন্ন বলে মনে হচ্ছে না। ভীষণ অবাক হলাম।...ঘুম ভাঙলো।

—অর্পিতা সাহা

সখেরবাজার

ব্যাখ্যা ঃ সমষ্টিচৈতন্য (জয়) ক্রিয়াশীল হলে মন অন্তর্মুখী হয়। এই অন্তর্মুখীনতার বিভিন্ন স্তর আছে। সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছালে একজ্ঞানের উপলব্ধি হয়। তখন জানা যায় এক অখণ্ড চৈতন্যই ক্রিয়াশীল, সেখানে দু'য়ের স্থান নেই।

● দেখছি (25.07.2023) —শ্রীজীবনকৃষ্ণের ভেতরে আমি যেন রয়েছি। ভেতরে থেকে বাইরের সব দেখতে পাচ্ছি। স্বপ্ন ভাঙল।

—বানী ঘোষ

সখেরবাজার

ব্যাখ্যা—শ্রীজীবনকৃষ্ণ মানে জগৎব্যাপ্ত চৈতন্য। তার মধ্যে থেকেই আমরা বাইরের জগৎকে দেখছি ও বুঝছি। মন অন্তর্মুখী না হলে সেই জগৎচৈতন্যকে জানা যায় না। ঠিক যেমন বায়ুমণ্ডলের ভিতরে থাকলেও বায়ুমণ্ডলকে সবাই জানতে পারে না। বিজ্ঞানীরা জানতে পারেন।

চিন্তন ধারা

● দেখছি (২৬.০৮.২০২৩)—আমি বসে আছি। পাশে জয় বসে আছে। সামনে পুতুল দিদা, অর্পিতা আর অভিলাষা বসে খুব উচ্চস্তরের আলোচনা করছে। কখনও পুতুল দিদা প্রশ্ন করছে আর অর্পিতা ও অভিলাষা উত্তর দিচ্ছে। আবার কখনও অভিলাষা প্রশ্ন করছে আর পুতুল দিদা ও অর্পিতা উত্তর দিচ্ছে। এই আলোচনা শুনে জয় খুব খুশি হয়ে বলল, আমি এই জগৎটাকে চেয়েছিলাম। তখন আমার মনে হচ্ছে এটাই হচ্ছে — Thinking, re-thinking and reverse thinking। ঘুম ভাঙলো।

—রাজীব রায়চৌধুরী
সখেরবাজার

ব্যাখ্যা ঃ জয় পাশে বসে আছে —সমষ্টিচৈতন্যের সত্তা পাওয়া। এই সত্তা পেলে কারণশরীরের গঠনের পরিবর্তন ও মনন সাধন হয়। আমাদের কারণশরীর বা সূক্ষ্মমনের তিনটি অবস্থা লাভ হয়। ১ম পুতুল — দৈবীসত্তা যুক্ত মনের প্রথম অবস্থা যেখানে ঈশ্বরীয় দর্শন লাভে বা অমৃতবানী শ্রবণে বিস্ময়ে বিহ্বল হয় ও ঈশ্বরীয় চিন্তা শুরু হয়। নানা প্রশ্ন জাগে (Thinking)। দ্বিতীয় অবস্থা অর্পিতা — সমর্পিতা ভাব — প্রশ্নের উত্তর নিয়ে পুনর্চিন্তন (Rethinking)। অভিলাষা —ইচ্ছা, Root জানার ইচ্ছা। তখন চিন্তন সম্পূর্ণ অন্তর্মুখী হয় (Reverse Thinking)। এই রকমভাবে আত্মিক জগতে মনন চলে। এই আত্মিক জগৎ-ই সমষ্টিচৈতন্যের ক্রিয়াশীলতায় সৃষ্ট কাঙ্ক্ষিত আত্মিক জগৎ।

● দেখছি (14.05.23) —দুটি সাপের বিয়ে হ'ল বেশ ধুমধাম করে। এরপর পুরুষ সাপটির লেজ খসে গেল। বেশ অবাক হলাম। পরে ছোড়দা (বরুন) বলছে, সেলিমদা যে প্রতিদিন দুধ দেয়, ওকে বলে দে আর দুধ নিবি না।...

—কৃষ্ণা ব্যানার্জী,
বোলপুর

ব্যাখ্যা—দুধ—ভক্তিরস। সেলিমদা দেয়—সেমেটিক কাল্ট থেকে উদ্ভুত। লেজ খসে গেল—পুরোন ধারনার অবসান ঘটাচ্ছেন। ভক্ত ও ভগবানের মিলন নয়, আমরা এযুগে একত্বের সুধারস আস্বাদন করছি।

উলট্ পুরাণ

● দেখছি (23.10.23) —মা দুর্গা এক জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে। মহিষাসুর ছুটতে ছুটতে পায়ের কাছে এসে পড়লো। বলছে, আমায় বধ করো। আমরা বহু মানুষ দূর থেকে এটা দেখছি, আর ভাবছি অসুরকে বধ করার জন্য দুর্গাকে কত কষ্ট করতে হয়েছে, এখন দেখছি অসুর নিজে এসেছে বধ হবার জন্য। এই ভাবতে ভাবতেই ঘুম ভাঙলো।

—কৃষ্ণা ব্যানার্জী
বোলপুর

ব্যাখ্যা—এযুগে নির্গুণের ক্রিয়ায় মানুষের ভিতর ঐকান্তিক ইচ্ছা জাগছে যে তার জীবসত্তা প্রতিস্থাপিত হোক অখণ্ডচৈতন্যের দেবসত্তার দ্বারা। আর এটি হলেই মানুষের সংস্কার ও অহং নাশ সম্ভব হয়।

● গত 14.09.2023 রাত্রে স্বপ্নে দেখলাম— একটা সাদা ধবধবে ইঁদুর। খুব আনন্দ হল দেখে।...

—কৃষ্ণা ভট্টাচার্য্য
সখেরবাজার

ব্যাখ্যা —দ্রষ্টার মন শুদ্ধ হয়েছে। সমষ্টিচৈতন্যকে (গনেশকে) ধারনার উপযোগী হয়ে উঠছে।

● স্বপ্নে দেখছি (24.08.23) —আমি মারা গেছি। বাড়িতে আমার স্মৃতিচারণ অনুষ্ঠান হচ্ছে। স্নেহময় আয়োজন করেছে। বহু মানুষ সমবেত হয়েছে। আমি সবটা দেখতে পাচ্ছি।...

—অরুণ ব্যানার্জী
শিমূরালী, নদীয়া

ব্যাখ্যা—আমি অর্থাৎ 'অহং' নাশ হলে আমার আপন সত্তা অখণ্ডচৈতন্যের সূচনা পর্ব থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত বিকাশ লাভের ধারাটি অনুধাবন করতে পারবো সম্মিলিত আত্মিক অনুশীলনের মাধ্যমে।

নতুন জগৎ

● দেখছি (29.08.23) —আমি সবাইকে বলছি, আমরা এবার একটি নতুন জগতে যাব। সঙ্গে সঙ্গে বাড়ীর সব জিনিসপত্র ক্রমে ছোট হতে হতে বিন্দুর আকার হয়ে যাচ্ছে। তারপর নতুন একটা উজ্জ্বল খুব বড় সূর্য উঠল। তখন ননদকে বললাম, দেখলে, আমি বলেছিলাম না আমরা সবাই নতুন এক জগতে যাব। তাই হ'ল।...

—অর্চনা দাস বৈরাগ্য
ইলামবাজার

ব্যাখ্যা —বাইরের ভোগের জগৎ যখন সাধকের দৃষ্টিতে ক্ষুদ্র, তুচ্ছ হয়ে যায় তখন তার চোখে ধরা পড়ে নতুন আত্মিক জগতে মানুষের উত্তরণের বিষয়টি।

● দেখছি (27.08.23) —তুলসী বলে একজন মরে ভূত হয়েও কাকার পিছনে যাচ্ছে একটা গাড়ীতে করে, কাকার ক্ষতি করতে। ওর সঙ্গে যেন কাকার ঘনিষ্ঠতা ছিল। শ্রীধরবাবু কাকাকে বাঁচাতে তুলসীর গাড়ি একটা লাল গামছা দিয়ে ঢেকে দিল। ও যেন আর ক্ষতি করতে পারবে না।...

—সবিতা ঘোষ (চারুপল্লী)

ব্যাখ্যা —তুলসী —ভক্তি। কাকা —দ্রষ্টার দেবসত্তা। ভক্তি মারা গেছে তবুও তার সংস্কার ক্রিয়া করছে, দ্রষ্টার একজ্ঞান লাভে বাধা দিচ্ছে। শ্রীধর —নির্গুণ ব্রহ্ম, সমষ্টিচৈতন্য সেই ভক্তির সংস্কারকে ছোট করে দিলেন ও প্রেমে (লাল) পরিণত করে দিলেন।।

● দেখছি (25.5.231) —আমরা সবাই জয়দের বাড়ী গেছি। স্নেহময়দা তখন জয়কে খুঁজতে বাইরে গেল। আমি খাটে বসে আছি। যেই পিছন ফিরলাম দেখছি জয় কাছেই বসে আছে। খুব অবাক হলাম। আমি পাপিয়াকে বললাম, ‘‘জয়কে জল দাও।’’...

ব্যাখ্যা ঃ জয়দের বাড়ি —স্বধাম। খুঁজতে গেল — নিজের সত্তাকে জানার আকাঙ্ক্ষা জাগল। পিছন ফিরে অর্থাৎ আরও অন্তর্মুখী হলে ভিতরের সত্তাকে জানা যায়।

—অভিজিৎ রায় (ইলামবাজার)

পাখীর চোখ

● ৩১ শে জুলাই, ২০২৩ স্বপ্নে দেখছি —জানলার সামনে জয়দার মুখ। তার পিছনে শ্রীকৃষ্ণের ১০৮ টি রূপ। আস্তে আস্তে জয়দার মুখ বড় হতে লাগলো এবং ঐ রূপগুলিও বড় হতে লাগলো। ঘুম ভাঙলো। দেখি যে আমার বিছানার পাশে একজন বিবাহিত মেয়ে ছিল। সে উঠে চলে গেল। এবার আমার ঘুম সত্যি সত্যি ভাঙলো।

—পার্থ দাস

কড়িধ্যা, সিউড়ী

ব্যাখ্যা ঃ বিবাহিত মহিলা চলে গেল=দ্বৈতবাদ চলে গিয়ে একের চেতনা লাভ হয়। জয়—সমষ্টিচৈতন্য—একজ্ঞানের ঘনমূর্তি। কৃষ্ণ—নির্গুন ব্রহ্ম। ১০৮ কৃষ্ণমূর্তি—নির্গুণের শক্তির প্রকাশে নানাদিক থেকে একজ্ঞানকে বোঝা চলে।

● ছোটদের পাঠের গ্রুপে ঢুকে ডি.পি.টা দেখে চমকে উঠলাম। ওখানে মানিক পত্রিকায় আঁকা যে পাখিটির ছবি দেওয়া রয়েছে সেই লাল রঙের পাখিটিকে তো আগেই আমি দেখেছি। স্বপ্নে দেখেছিলাম—ঐ পাখিটিকে আমার সামনে। আমি ওর চোখের দিকে তাকিয়ে দেখি চোখের মনিতে শ্রীজীবনকৃষ্ণ বসে রয়েছেন, স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।...

—সুপ্রিয়া সাহা (দমদম)

ব্যাখ্যা—১। পাখীর চোখ অর্থাৎ আমাদের লক্ষ্য হল জীবনকৃষ্ণ রূপ জগৎচৈতন্যকে জানা—তাহলেই আত্মিক জগতের সব জানা হয়ে যাবে। ২) জগৎচৈতন্য আমাদের দেখছেন—আত্মিক বিকাশের চাহিদা মেটাবেন মনকে অন্তর্মুখী করে ও দর্শন অনুভূতির যোগান দিয়ে আর ত্রুটি বিচ্যুতি ধরে দিয়ে।

● দেখছি (20.07.2023) —শরীর খারাপ। খুব জ্বর। হঠাৎ দেখি জীবনকৃষ্ণ এগিয়ে আসছেন আমার কাছে। মাথা ন্যাড়া —যেন জ্যোতি বেরোচ্ছে। কাছে এলে মনে হল আমার স্বামী (জয়কৃষ্ণ)। একটা ওষুধ হাতে দিয়ে বলল, ‘‘এটা খেয়ে নাও, জ্বর ভালো হয়ে যাবে।”...

—ইতিকা ঘোষ (জামবুনি)

ব্যাখ্যা—জগৎস্বামীই আমার স্বামী—অবলম্বন—এই বোধ হলে ভবব্যাধি দূর হয়ে যায়। ওষুধ দিলেন=একত্ব দান করলেন।

নাগরদোলায়

● স্বপ্ন দেখছি (12.06.2023) —আমি আর বুনু মেলাতে নাগরদোলায় চেপেছি। নাগরদোলায় ঘুরতে ঘুরতে যখন একেবারে নিচের দিকে এসেছি তখন বুনুকে বলছি দ্যাখ এইখানে মনে হচ্ছে আমার ওজনটা শূণ্য হয়ে গেছে। এরপর নাগরদোলাটা যখন মাটি থেকে সামান্য উঠে যায় তখন মনে হচ্ছে যে আমার ওজন এতটাই কমে গেছে যে আমার পুরো শরীরটা অদৃশ্য হয়ে গেছে। শুধুমাত্র ডান হাতটা ছাড়া। তখন আমি খুব খুশি হয়ে বুনুকে বলছি যে এটাই হলো Newton's law of gravitation chapter টার real practical.

—মেঘা রায়
ইলামবাজার

ব্যাখ্যা—মেলায় নাগরদোলা চাপা= সমষ্টির সাধনে আত্মিক জগতে প্রবেশ। নীচে নামা=মনন সাধনে উপলব্ধির গভীরে যাওয়া। ওজন শূণ্য=দেহজ্ঞান লোপ পাওয়া। সামান্য উপরে ওঠা=ব্যবহারিকে আবার বোধ ফিরে আসা। ওজন খুব কমে দেহ অদৃশ্য হয়ে যায়=অস্তিত্বটুকু থাকে। ডান হাতটা দেখা যাচ্ছে=ব্যবহারিক জগতে একত্ব বোধ ক্রিয়াশীল হচ্ছে। Newton's law of gravitation-এর real practical = নিউটনের মহাকর্ষ সূত্র থেকে জানা যায় যে অবাধে পতনশীল বস্তু ওজনশূন্য হয়। আত্মিক জগতে মায়ার বাধা বা অজ্ঞানতা চলে গেলে অবাধে পতনশীল বস্তুর মতো সাধক দেহজ্ঞান শূণ্য হয়। তখন একত্ব বোধ দ্বারা জীবন নিয়ন্ত্রিত হয়। অহংমুক্ত হয়ে কাজ করা যায়। কারুর প্রতি বিদ্বেষ, হিংসা থাকে না। এ যেন নিউটনের মহাকর্ষ সূত্রের প্রকৃত প্রায়োগিক দিক।।

● গত শনিবার (6.09.2023) — পাঠের সময় জয়ের কথা শুনতে শুনতে হঠাৎ দর্শন হল, জয় 'ধর্ম ও অনুভূতি' বইটার ভিতর ঢুকে গেল।... অবাক হলাম। মনে হল ও যেন ঐ বইয়ের ভিতরে প্রবেশ করে মর্ম উদ্ধার করে আমাদের বোঝাচ্ছে।

—মীনা মণ্ডল
আন্দুল, হাওড়া

ব্যাখ্যা ঃ দ্রষ্টা সমষ্টিচৈতন্যের সত্তা—অনুচৈতন্য লাভ করায় ধর্ম ও অনুভূতির মর্ম উপলব্ধি করতে পারছেন ঐ সময়।

নবীনা

বহে নিরন্তর

● স্বপ্নে দেখছি (27.09.2023) — কেদারনাথ ঘুরতে গেছি। শিবমূর্তি থেকে শিবের জটায় থাকা যে গঙ্গার জল আসে সেখান থেকে জলের খুব চাপ সহ মূর্তি ফেটে বেরোল— প্রথমে জীবনকৃষ্ণ, তারপর জয়দা। পরে অজস্র জয়দা রূপী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মানুষ জলের সাথে বেরিয়ে মাটিতে পড়ল। মাটিতে মিশে গেল। জলের রঙ হয়ে যাচ্ছিল ধীরে ধীরে মেরুন। আমি মাটিতে শুয়ে চোখ দিয়ে গর্তের মধ্যে দেখার চেষ্টা করছি কোথায় যাচ্ছে জলটা। কে একজন বলল, ভালো করে দেখ। বেশ কিছুক্ষণ লক্ষ্য করার পর দেখতে পেলাম সমস্ত জল একটা ব্ল্যাক হোলে (Black hole-এ) গিয়ে মিলিত হচ্ছে।...

—সায়েরী রাউত

বেহালা, কলকাতা

ব্যাখ্যা ঃ কেদারনাথ— সহস্রার। শিব —এক। জটায় গঙ্গাজল — অপ্রকাশিত অখণ্ডচৈতন্য। এই অখণ্ডচৈতন্যের প্রকাশ ও তার ক্রিয়াশীলতা দেখানো হয়েছে। দুটি ধারায় নতুন প্রকাশ হলো—এক জগৎচৈতন্য (জীবনকৃষ্ণ) ও দুই সমষ্টিচৈতন্য (জয়)। এরপর সমষ্টিচৈতন্যের ক্রিয়াশীলতায় সৃষ্টি হয় অনুচৈতন্য ও তা বিক্ষেপিত হয়। মাটিতে মিশে যায় — বাস্তবায়িত হয় — সাধারণ মানুষের মধ্যে অনুচৈতন্য ক্রিয়াশীল হয়। জলের রঙ মেরুন — গভীর প্রেম, এই প্রেমের দ্বারা এক করে নেন। এই চৈতন্যের গতিধারায় তাকে আবার গুটিয়ে নেন অর্থাৎ নির্গুণের (ব্ল্যাক হোল) সঙ্গে এক করে নেন। এই পুরো বিষয়টি দ্রষ্টার বোধে আসে। এই অখণ্ডচৈতন্য যে শাশ্বত (আদিকাল থেকে বিবর্তিত ও প্রবাহিত হয়ে চলেছে) তা আমরা বুঝতে পারছি। এই স্বপ্নে ২য় স্তরে কালের নাশের অবস্থা বোঝাচ্ছে।

● ২৪.১০.২৩ রাতে স্বপ্নে দেখছি—২৭/১০ এ হরিদ্বার যাচ্ছি গণদেবতা এক্সপ্রেসে। হরিদ্বার পৌঁছলাম, গঙ্গাও দেখলাম। ওটা যেন বোলপুরে শান্তিশ্রী লজে। গঙ্গায় ভালো করে ডুবে স্নান করছি।... ঐ দিন শান্তিশ্রীতে স্নেহময়দার মায়ের স্মৃতিচারণ সভায় গিয়ে স্বপ্নটার অর্থ বুঝলাম।

—অতনু মাইতি

কাষ্ঠডাঙা

আপন সৃষ্টি

● দেখছি (11.05.2023) — অর্পিতা চ্যাটার্জীর যোনি কামড়ে খেয়ে নিচ্ছে Predator-এর মতো বিভৎস দেখতে একটি জীব। পাশে জয়দা দাঁড়িয়ে। বলল, ও এভাবে সকলের জননাঙ্গ খেয়ে ফেলবে, সৃষ্টিশক্তি নাশ করে দেবে। এবার তোর পালা। আমি বললাম, ও তো ভয়ঙ্কর! যদি সৃষ্টিশক্তি নাশ করতে হয় তাহলে তুমি করো, ও কেন? জয়দা আমার কথা শুনে মুচকি মুচকি হাসতে লাগলো।...

—অর্পিতা সাহা
সখেরবাজার

ব্যাখ্যা—সমষ্টিচৈতন্যই সবার ভিতর দিয়ে নিজেকে সৃষ্টি করবে, তাদের নিজেদের সৃষ্টিক্ষমতাকে নাশ করে দিয়ে। তখনই একত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে। বহুত্ব নাশ হবে।

● দেখছি (16.05.2023) — বোলপুরে ৭ই জ্যৈষ্ঠের অনুষ্ঠানে আমি যেতে পারবো না বলে জয় আগের দিন বিকেল বেলা আমাদের বাড়ি এসেছে। আমাকে আর মাসীকে ঠাকুরের কথা শোনাবে বলে। জয় বাড়িতে এসেছে বলে আমি আনন্দে ‘‘ভাই এসেছে, ভাই এসেছে’’ বলে উঠেছি। ও বলল, ‘‘আমাকে ভাই বলে ডাকবে না। অমি কোন সম্পর্কের গন্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে চাই না।’’ আমি তারপর বললাম তোমার মুখ থেকে ঠাকুরের কথা শুনব। ও সারারাত ধরে আমাকে আর মাসীকে ঠাকুরের কথা শোনালো। একটা কথা মনে আছে— বলল, ‘‘মানুষের ভোগ কমাতে হবে।’’...

—সোমা পাল বসাক
আমতলা, দঃ ২৪ পরগনা

● ৬ই জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩০, স্বপ্নে দেখছি—একটা ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে দেখছি ঘরের ভিতরটা অন্ধকার। আর ঐ অন্ধকার ঘর পার হয়ে পাশের ঘরে যেতে হবে—সেখানে জীবনকৃষ্ণ বসে রয়েছেন—ঐ ঘরটি আলোয় আলোকিত।

—ব্রততী দাস (হাওড়া)

ব্যাখ্যা ঃ ‘‘অন্ধকারের পেরিয়ে দুয়ার যাই চলে আলোকে।’’
অন্ধকার ঘর— মারের জগৎ—দ্বৈতবাদের ভাবধারার খণ্ডচেতনার জগৎ।

সাথে আছে

● স্বপ্নে দেখছি (2.06.2023) — আমি বিছানার বিভিন্ন দিকে মাথা করে ঘুমাচ্ছি। একদিকে মাথা করি আর উল্টো দিকে দেখি জয়দা বসে আছে। আবার যেই অন্যদিকে মাথা করি উল্টোদিকে আমার মুখোমুখি বসে জয়দাকে হাসতে দেখছি। আবার দেখছি আমার সামনে অনেক রাস্তা, আমি বুঝতে পারছি না কোন রাস্তায় যাব। তাই আমি দৌড়ে দৌড়ে সব রাস্তাতেই একবার করে যাচ্ছি আর প্রত্যেকটি রাস্তায় দেখতে পাচ্ছি জয়দাকে। তারপর দেখি একটা বড়ো রাস্তায় ঢোকার মুখে আমি দাঁড়িয়ে আছি আর সেই রাস্তাতেই একটু দূরে জয়দা দাঁড়িয়ে আছে আর আমাকে বলছে, "তুই যেখানে যাবি, যা করবি, সেখানেই আমাকে সাথে পাবি।"...

—প্রদীপ্তা মণ্ডল

বেহালা, কলকাতা

ব্যাখ্যা ঃ অনুভূতির মাধ্যমে উপলব্ধি করা যে ভগবান (জয়) আমার সঙ্গেই আছেন আর তিনিই আমার আপন সত্তা।

● গত ৩১.০৫.২০২৩-এ দুপুরে স্নান করে কথামৃত পাঠ করবো ভাবলাম। শরীর খুব ক্লান্ত থাকায় চোখটা লেগে যায়। দর্শন হলো— আমার মাথার প্রত্যেকটা ব্রেন সেলে (cell-এ) ছোট ছোট জয়দা বসে পাঠ করছে এবং পাশে রাখা একটি কম্পিউটারের সামনে বসে একজন জয়দা কাজ করছে। আমি যেন ব্রেন সেলগুলো বড় করে অর্থাৎ ঝুম (Zoom) করে দেখার চেষ্টা করছি। দেখি একটা জয়দার ভিতর আরও অনেক ছোট ছোট জয়দা রয়েছে।...

—সায়েরী রাউত

বেহালা, কলকাতা

ব্যাখ্যা — মাথার প্রত্যেক brain cell এ জয়দা = সমষ্টিচৈতন্য দ্রষ্টার চেতনাকে গ্রাস করেছে। একটা জয়দার ভিতর অনেকগুলো জয়দা= সমষ্টিচৈতন্যের অনুচৈতন্য। পাশে রাখা কম্পিউটারে আর একজন জয়দা কাজ করছে = ইনি সমষ্টিচৈতন্য যিনি তার brain faculty-র দ্বারা তাঁর বিক্ষেপিত জগতের ভাবনা চিন্তা নিয়ন্ত্রণ করেন।।

লিলিপুট

● দেখছি (২৫.০৭.২০২৩)— খুব সুন্দরী, বিবাহিত, গর্ভবতী এক নারী। কিন্তু মুখটা তার হুবহু জয়ের মতো। কোন এক অদৃশ্য টানে আমি যেন তার দিকে এগিয়ে যাচ্ছি। এই সময় নানা রকম চিন্তা হতে লাগলো। ভাবছি এ কী মায়া নাকি বিদ্যামায়া। নানা প্রশ্ন মনের মধ্যে উঠতে শুরু করলো। তার কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। দেখি আমি যেন খুব ছোট হয়ে গেছি। উনি যেন আমাকে আলতো করে তুলে নিয়ে মুখে পুরে গিলে ফেললেন। ঐ সময়, মুখ থেকে গলা বেয়ে পেটে নামার সময়, কালো আকাশের গায়ে নক্ষত্রপুঞ্জের শোভা দেখতে পেলাম। পেটের মধ্যে পৌঁছে দেখতে পাচ্ছি স্নেহময়দা, বরুনদা, অমরেশদা, লিওন এবং পাঠচক্রের আরও অনেকে রয়েছে আমার মতো ছোট লিলিপুট আকৃতির হয়ে।

তখন আমার মনে হলো কারোর দেহে কোন সাড়া নেই, হাত পা কিছুই নড়ছে না। কথা বলার শক্তিটাও নেই। ওনার নড়াচড়ায় আমরা নড়ছি। সামনে দেখছি বাদশাকে। ওকে আমি ঈশারায় জিজ্ঞাসা করলাম, এই মহিলা কে? এ কী জয়? ও বলল, হ্যাঁ। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, ও এই রূপ ধরলো কেন? ও বলল তা বলতে পারবো না। তারপর দেখছি মহিলাটি আমাদেরকে মুখ দিয়ে উগরে বাইরে বের করে দিল। আমরা সবাই আগের মতো হয়ে গেলাম। এবার কথা বলতে পারছি, হাত পা নড়াতে পারছি। সবাই মিলে মহিলাটিকে দেখছি। উনি বহু মানুষকে গিলে ফেলছেন পরে আবার বের করে দিচ্ছেন। তাদেরও আমাদের মতো অভিজ্ঞতা হচ্ছে ওনার ভিতরে গিয়ে।...ঘুম ভাঙলো।

—রাজীব রায় চৌধুরী

সখেরবাজার

ব্যাখ্যা—সমষ্টিচৈতন্যের মধ্যে লীন হলে, একত্ব হলে, অস্তিত্ব মাত্র হয়ে (লিলিপুট) মানুষ উপলব্ধি করে আত্মিক একের চেতনায় সকলে পরিচালিত হয়।

মনের ঘরে

● দেখছি (10.06.2023) —আমাদের ঘরে আমগাছ থেকে অনেক আম পাড়া হয়েছে। একজন জিজ্ঞেস করলো, আমগুলো কোথায় রাখবো? তখন

আমি বললাম, মনের ঘরে রাখো। কিন্তু ওরা আমার কথা বুঝতে পারলো না। তখন বললাম, যে ঘরে মনন হয়, সেই ঘরে রাখো।...

শিখা মুখার্জী

কাগাস, বীরভূম

ব্যাখ্যা ঃ আম — ব্রহ্মত্ব, ঈশ্বরানুভূতি। মননের মাধ্যমে তা আস্বাদন করতে হয়।

● স্বপ্নে দেখছি (10.06.2023) — আমি, শোভন আর জয় আমার বিছানায় বসে আছি। জয় অনেক আধ্যাত্মিক কথা বলল, তারপর ওরা দু'জনে চলে গেল। তখন দেখি আমার হাতে একটা কথামৃত বই। আমি ওটা পড়তে যাওয়ার সময় দেখি আমার চশমা নেই। চশমা খুঁজছি। খুঁজতে গিয়ে দেখি জয় ওর চশমা ফেলে গেছে বা রেখে গেছে। আমি ওর চশমাটা পরে বইটা পড়তে গেলাম। তখন দেখি চশমাটার এত পাওয়ার যে সহ্য করতে পারছি না। তবুও জোর করে চশমাটা পরে বইয়ের দিকে তাকালাম। সমস্ত লেখাগুলো কালো দেখাচ্ছে। আমি তাড়াতাড়ি চশমা খুলে মন্দ্রিতাকে (স্ত্রীকে) বললাম, আমার চশমাটা খুঁজে দাও। তারপরই ঘুম ভাঙলো।

অমরেশ চ্যাটার্জী

ইলামবাজার

ব্যাখ্যা ঃ চশমা — দৃষ্টিভঙ্গী। জয় — সমষ্টিচৈতন্য। স্ত্রী — পাঠচক্রের সদস্যরা সম্মিলিত ভাবে। সমষ্টিচৈতন্য ঈশ্বরীয় কথা মননের একটি নতুন দৃষ্টিভঙ্গী দান করতে চাইছেন। কিন্তু মানুষ সেটি পাঠচক্রে সম্মিলিত অনুশীলনের দ্বারা adjusted form-এ গ্রহণ করতে পারবে।

[''আমি এই প্রকারে আয়াত সকল সেই সব মানুষের জন্য বর্ণনা করিয়া থাকি যাহারা চিন্তা করে, মনন করে। সুরা — ইউনুস। কোরান।]

নতুন করে জানা

● দেখছি (8.6.231) — শ্রীজীবনকৃষ্ণ আমাকে বলছেন, 'আমাকে এতদিন বাইরে থেকে জেনেছিস। এবার ভিতরটা জানাবো।' তারপর অনেক কিছু বোঝালেন। সেগুলো মনে নেই। পরের দৃশ্যে দেখছি শ্রীরামকৃষ্ণের সাথে জীবনকৃষ্ণের সাক্ষাৎ হচ্ছে। সেটা দেখছি সাদা কালো ছবিতে। এটা যেন আমার

ব্রেনের ভিতর হচ্ছে। তখন আমার দেহ বায়বীয়। কে যেন বললো, তুমি এই মুহূর্তে ঋষি। তৃতীয় দৃশ্য— শ্রীরামকৃষ্ণকে বিদেশে Phd ডিগ্রী দিয়েছে এবং ফেলোশিপ দিয়েছে। ওখানে কলেজে রামকৃষ্ণ কথামৃত যেন main paper হিসাবে পড়ানো হয়। আমার বইটা দেখতে খুব ইচ্ছা করছে। তখন দেখলাম 'ধর্ম ও অনুভূতি' বইটা। ওটা মহাশূণ্যে ভাসছে এবং ওর কভারটা নীল রঙের, মাঝে সাদা রঙে লেখা ধর্ম ও অনুভূতি।...

—অতনু মাইতি

কাষ্ঠডাঙা, কলকাতা

ব্যাখ্যা ঃ 'ধর্ম ও অনুভূতি' পড়ে বাইরে থেকে জীবনকৃষ্ণের সাধন জীবন জানা হয়েছে। এবার তার ভিতরের অর্থ জানা যাবে নির্গুণের ক্রিয়ায়, তাই মহাশূন্যে ভাসছে। সাথে সাথে ব্যষ্টির সাধন (প্রতীকে শ্রীরামকৃষ্ণ) সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারনা লাভ করা যাবে। জগৎ এই মহাবেদের যথাযথ গুরুত্ব ও মর্যাদা দেবে।

● দেখছি (7.8.23) — জীবনকৃষ্ণ এসেছেন। আমরা পাঠের সবাই ওনাকে দেখে খুব আনন্দিত। উনি বললেন, তোমরা কী চাও? আমরা সবাই বললাম তোমার মতো জ্ঞানলাভ করতে চাই। উনি বললেন, আচ্ছা, আচ্ছা, তাই হবে। জয় কাকাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কী চাও? জয় কাকা বলল, আমি নিজেকে জানতে চাই। জীবনকৃষ্ণ খুব খুশী হলেন আর বললেন, তুমি আমার চেয়েও বড় হবে।।

—শ্রাবন্তী রায়

ইলামবাজার

ব্যাখ্যা —বড়ো হবে= অখণ্ডচৈতন্য অধিক ক্রিয়াশীল হবে তোমার আধারে।

জয়যাত্রার পথ

● গত ২৯.১০.২৩-এ স্বপ্ন দেখছি— জয়দা, স্নেহময় মামা, বাবা, কল্পনা দিদা, মনিদিদা ও আমি রাস্তা দিয়ে হাঁটছি। দিদিকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। তখন জয়দাদা বলল, ঐ গর্তে তোর দিদি আছে। তখন মামা বলল, অভীপ্সা গর্তের মধ্যে কী করছে? আমি গিয়ে দেখি যে দিদি জীবনকৃষ্ণের মতো সমাধিস্থ হয়ে বসে আছে যেন পাথরের মূর্তি। তখন মনিদিদা ও কল্পনা দিদা দিদিকে গর্ত থেকে তুলে বললো, তুই ওখানে কী করছিস? উত্তরে দিদি বললো যে

জীবনকৃষ্ণ কিভাবে ইন্দ্রকে জয় করেছেন সেই স্বপ্ন দেখছিলাম। তখন মনি দিদা বললো, তুই সমাধিস্থ হয়ে যে স্বপ্ন দেখেছিস তা মামাকে বলবি। তাহলে মামা ব্যাখ্যা দেবে।

—অভিলাষা রায়চৌধুরী
সখেরবাজার

ব্যাখ্যা ঃ গর্তের ভিতর থাকা= অন্তর্মুখ হয়ে থাকা। ইন্দ্র= ব্রহ্ম। ইন্দ্রকে জয় করা= ব্রহ্মত্ব লাভ করা। স্বপ্ন দেখা=ধারনা লাভ করা।

● দেখছি (10.10.23) — জীবনকৃষ্ণ খালি গায়ে, ধুতিটা মালকোঁচা করে পরে উপুড় হয়ে বসে রয়েছেন। আখরোটের মতো শক্ত ফল স্তূপাকার হয়ে রয়েছে ওনার বাঁ দিকে। ডান হাতে করে একটা করে ফল নিচ্ছেন আর জোর করে ফাটাচ্ছেন। ভিতরে লাল মতো কী দেখা যাচ্ছে। তা ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলে দিচ্ছেন। আমি ঘরে ঢুকে ওনাকে জিজ্ঞাসা করলাম, তুমি কী করছো গো? উনি আমার দিকে না তাকিয়ে বললেন, হিজড়ে নিধন করছি। আমার ভীষণ আনন্দ হল ওকথা শুনে।...

—কেতকী পাঠক
সখেরবাজার

ব্যাখ্যা ঃ নারীরা ভক্তের ও পুরুষরা একজ্ঞানে অধিষ্ঠিত মানুষের প্রতীক। যারা অদ্বৈতবাদে ঈশ্বরীয় চর্চা করেন অথচ ভিতরে দ্বৈতবাদ তথা ভক্ত অবস্থা সক্রিয় তারা হিজড়ে। হিজড়ে দশা ঘুচলে একজ্ঞানের চর্চায় একনিষ্ঠ হতে পারেন, অদ্বৈতজ্ঞান বোধে বোধ হয়, পুরুষ হন।।

রূপাতীতের রূপ

● গত ১৩.৮.২০২৩ এ স্বপ্নে দেখছি— স্নেহময়দা, বরুনদা, ছোড়দা (রুদ্রদা) ও জয়কৃষ্ণকে নেমন্তন্ন করেছি আমার বাড়িতে খাওয়ার জন্য। স্নেহময়দা, বরুণদা ও ছোড়দা পাশে কিছু একটা আলোচনা করছে। আমি জয়কে খেতে দিয়ে বললাম, তুমি আজকে যে অন্নময়, প্রাণময়, মনোময় কোষ ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করলে সেটা শুনে এখনকার মতো বুঝলাম। কিন্তু এগুলো ধারনা করতে বা মনে রাখতে পারি না। আবার একত্ব নিয়ে যে আলোচনা এখন

করছো সেটাও ঠিক উপলব্ধি করতে পারছি না। জয় বলল, ‘‘আমাকে দেখলে একত্বের ক্রিয়া শুরু হবে। তখন বুঝতে পারবে। আমি বললাম, তোমাকে এই রূপেই দেখতে হবে নাকি অন্য রূপ দেখলেও হবে? তখন ও বলল, হ্যাঁ, অন্য রূপে হলেও আমাকেই দেখতে হবে।।...ঘুম ভাঙল।

—মিনতী কুণ্ডু
আবাডাঙা

● গত ২১.১০.২৩ শনিবার রাতে স্বপ্নে দেখছি একটি পুলিশ থানার এরিয়ার ভিতরে আমি ঢুকলাম, একজন ফর্সা সুন্দর ইউনিফর্ম পরা বড়োবাবু ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বলল—এসো এই ঘরে এসে বসো। আমি ভিতরে বসলাম, সামনে চেয়ারে মনোজ বসে আছে আর আমাকে বলছে, মা আসছে, মা আসছে। আমি অনুভব করলাম আমার বাঁদিকের হাঁটুতে মা এসে বসলো। অমনি আমার মুখ দিয়ে গলগল করে ঈশ্বরীয় কথা বেরোতে শুরু করল। শেষে বললাম, ঈশ্বরই সত্য আর সব অসত্য, মিথ্যা। এই কথা শুনে মা হাসল। তারপর দেখি মা মেরুন রঙের একটি ঘড়িতে দম দিচ্ছে। আমি মা-কে বললাম আমার বাড়িতে নীল রঙের দম দেওয়া ঘড়ি আছে।...ঘুম ভেঙে গেল।

—অভিজিৎ দাস
হাওড়া

ব্যাখ্যা ঃ পুলিশ থানার ভিতরে—সহস্রারে। বড়োবাবু=নির্গুণের ঘনমূর্তি। মনোজ—সূক্ষ্ম মন। মনের পরিবর্তিত অবস্থা। তখন মা আসে—‘নির্গুণ আমার বাপ, সগুণ আমার মা’—কবীর। মা-কে অর্থাৎ সগুণ ব্রহ্মকে জানা শুরু হয়। তখন জানা ঈশ্বরীয় কথাগুলো বলা যায়। মা মেরুন রঙের ঘড়ি দম দিচ্ছে—সগুণে খণ্ডকালের চেতনার প্রভাব থাকে। নীল রঙের ঘড়ি—শাশ্বত কালের চেতনার উৎস। ঘরে আছে—আমার মধ্যেই আছে—এই বোধ দৃঢ় হয়।

● গতকাল সন্ধ্যায় (1.08.2023) — চোখ বন্ধ করে শুয়েছিলাম। একটা দর্শন হ’ল—একটা বাড়িতে অনুষ্ঠান হচ্ছে। সেখানে পাঠের সবাই আছে। স্নেহময় জেঠু আমাকে দেখতে পেয়ে কাছে এসে কানের বাঁ পাশে চেপে ধরে ‘‘জয়কৃষ্ণ’’ নামটি চারবার বললেন, অমনি ঠিক অপর দিকে ডান কান থেকে সেই শব্দের জোরে নীল রক্ত বেরিয়ে এলো। ব্যাথা হচ্ছে কিন্তু ভিতরে অদ্ভুত

একটা আরাম বোধও হচ্ছে যতবার নামটা বলছে জেঠু আমার কানে। ঐ ঘরের নীচে একটা জানলা রয়েছে। তার নীচ থেকে ওপরের দিকে তাকিয়ে জয়দা জেঠুকে ঈশারা করে বলল, কান থেকে বেরোন রক্ত সংরক্ষণ করে রাখো। পাশ থেকে এক মহিলা বলে উঠলো আগামী প্রবাহের জন্য। অপরদিকে আরেকজন বলল, হ্যাঁ, পাঁচ নম্বরের জন্য।...দর্শন ভেঙে গেল।

—সায়েরী রাউত

বেহালা

ব্যাখ্যা ঃ নাম নামী অভেদ। ব্রহ্মের নাম শ্রবণে দেহের অভ্যন্তরে ভাগবতী তনুর গঠন পুনর্গঠনের ক্রিয়া চলছে—তার পরিণতি হিসাবে বা বহিপ্রকাশ হিসাবে নানা দর্শন সৃষ্টি হচ্ছে যা সকলের শ্রবণযোগ্য ও শিক্ষামূলক যা আগামী দিনেও মানুষকে উদ্বুদ্ধ করবে। তাই প্রবাহে লেখা হবে। চারবার— জীবনের ৪ টি দশাতেই এই চৈতন্যের ক্রিয়াশীলতা অনুভব করলে একত্ব বোধ দৃঢ় হয়।

পাঠ প্রসঙ্গে

পাঠ প্রসঙ্গে

বিগত ছয় মাসে পাঠ ও আলোচনা প্রসঙ্গে উঠে আসা নতুন কথাগুলির কিছু নির্বাচিত অংশ এখানে পরিবেশন করা হল।

● **প্রসঙ্গ ঃ 'সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই।'**

চণ্ডীদাসের এই বিখ্যাত উক্তি বহু চর্চিত বিষয়। অনেকে মনে করেন যে, অন্যান্য জীবের তুলনায় মানুষ শ্রেষ্ঠ, এই অর্থে কথাটি ব্যবহার করা হয়েছে। কিন্তু অন্যান্য জীবের সাথে মানুষের তুলনাই চলে না। চণ্ডীদাসের সময়কালে জাতপাতের বেড়াজালে উচ্চজাতির মানুষ নিম্ন শুদ্র জাতিকে ঘৃণার চোখে দেখতো। সেই অর্থে অনেকে বলতে চেয়েছেন যে জাতপাত ইত্যাদি সমস্ত রকম ভেদাভেদের ঊর্দ্ধে মানুষ, মানুষই সত্য। তবে চণ্ডীদাস ছিলেন সহজিয়া সাধক। তিনি সহজিয়া ভক্তি সাধন ধারায় বুঝেছিলেন যে সকলের মধ্যেই রয়েছে সত্যস্বরূপ ঈশ্বর, কৃষ্ণ। এই কৃষ্ণকে ধরেই বুঝেছিলেন যে মানুষেরই মধ্যে সেই শুদ্ধতম সত্তার সর্বোচ্চ প্রকাশ। 'কৃষ্ণের যতেক লীলা সর্বোত্তম নরলীলা, নরবপু তাহার স্বরূপ।' অন্তরে তাঁর প্রকাশে সমস্ত রকম দোষ ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও মানুষ সত্য হয়ে ওঠে। আবার তাকেই বাউলরা মনের মানুষ বলেছেন। কেউ বা নিরাকার ব্রহ্ম বলেছেন। এই ভাবে বহু চেতনার প্রবাহ ধারায় ওই উক্তি চলে আসে।

কিন্তু জীবনকৃষ্ণ তাঁর ব্যষ্টির সাধনের ধারায় উপলব্ধি করে বলছেন যে এখানে মানুষ বলতে কোন ব্যক্তি মানুষের কথা নয়। অখণ্ড জগৎ চৈতন্য সত্তার তথা প্রত্যেক মানুষের ভিতরে থাকা সর্বজনীন এক বৃহৎ মানুষের কথা বলা হয়েছে। এই সত্তার প্রকাশ সগুন, নির্গুণ ও অবতার তত্ত্বের সাধন ধারায় আপনা থেকেই হয়। আর 'সবার' বলতে অন্যান্য সব সাধন ধারার কথা বলা হয়েছে। যেমন ভক্তিপথে বা জ্ঞান পথে কিংবা যোগসাধনের পথে চেষ্টার দ্বারা এই সত্তার প্রকাশ ঘটে, এইসব ভাবনা প্রচলিত আছে। কিন্তু এইসব সাধনের দ্বারা হয় না, এই সবের উপরে রাজযোগে আপনা থেকেই প্রকাশ হয়। এই আপনা থেকে প্রকাশ হওয়ার উপরে আর কোন পথ নাই।

আর একভাবে বিষয়টি দেখা যেতে পারে। একজন সাধকের মধ্যে এই অখণ্ড

চৈতন্যের প্রকাশ হতে হলে ভগবৎ সত্তা দ্বারা গঠিত এক বিশেষ তনু লাভ করতে হবে। এটি হ'ল ভাগবতী তনু। এই ভাগবতী তনুই আত্মায় পরিবর্তিত হয়। এই ভাগবতী তনু স্বরূপ ভিতরের মানুষই সত্য, যার প্রকৃতরূপ আত্মা। আত্মার প্রকাশ হতে হলে সবার উপরে মানে সবার প্রথমে ভাগবতী তনু লাভ করতে হবে। তার উপরে নাই অর্থাৎ এই তনু লাভ ছাড়া কোনভাবে আত্মালাভ সম্ভব নয়।

সাধারণ মানুষেরও দ্বিতীয় স্তরে ভাগবতী তনু লাভ হয় অন্তরে অখণ্ড জগৎ চৈতন্য রূপী মানবের প্রকাশে। তাঁর সাথে একত্বের উপলব্ধিতে তারা আত্মা তথা আপন সত্তাকে লাভ ক'রে সত্য হয়ে ওঠে। এই একত্বলাভ সবার উপরে, এছাড়া অন্য কোন পথ নাই। সবার উপরে মনুষ্য জীবনের উদ্দেশ্য একত্বলাভ, অন্য কোন উদ্দেশ্য নাই।

● **প্রসঙ্গ ঃ ঈশ্বর প্রেম।**

প্রেমকে বিভিন্ন ভাবে দেখা হয়। প্রথমত, ঈশ্বরকে দেখার বা তাঁর সাথে মিলিত হওয়ার আকাঙ্খাকে প্রেম বলে। ঈশ্বর দর্শনের আগে এক তীব্র অনুরাগ বা ভক্তি জন্মায়, তাঁকে দেখার তীব্র আকাঙ্খা জাগে যেমন মহাপ্রভুর। আগমে মহাবায়ু জাগ্রত হলে এই ধরনের প্রেম লক্ষ করা যায়। তাতে অনেক সময় বাহ্যিক বিষয়ে হুঁশ থাকে না। মনে হয় যেন নিজের দেহ ও জগৎ ভুল হয়ে যায়। কিন্তু তা হয় না কারণ এই অবস্থায় সূক্ষ্ম দেহবোধ জাগ্রত থাকে। এই ধরনের প্রেম সাধককে কল্পনায় বিভোর রাখে। এই প্রেমের তৃপ্তি অস্থায়ী। চিরাচরিত ধারায় মানুষ প্রেম বলতে এই প্রেমকেই বোঝে, এখানে ঈশ্বর বাইরে—এই বোধ থাকে।

দ্বিতীয়ত, ঈশ্বর দর্শনের অর্থাৎ আত্মা সাক্ষাৎকারের পর ঈশ্বরের প্রতি ভালোবাসা জাগে, তীব্র ভক্তি জাগে। ঈশ্বরীয় কথা শুনতে ও বলতে ভালো লাগে। যেমন রামকৃষ্ণের প্রেমাভক্তি। তাই তিনি বলছেন, 'যাকে দেখবিনি তাকে ভালোবাসবি কি করে?' এই প্রেমের তৃপ্তি স্থায়ী হলেও এখানে দাসভাব, বাৎসল্যভাব কিংবা মধুরভাবের কল্পনা থাকে। কারণ সাধক দ্বৈতবোধে থাকেন। অতি সূক্ষ্ম দেহবোধ জাগ্রত থাকে। অন্তর্চৈতন্যের সাথে পূর্ণ একত্ব হয় না। এই অবস্থায় যে সমাধি হয় তাতে God like অবস্থা হয়। পূর্ণ একত্বলাভ না হওয়ায় প্রেম দান করা যায় না। আংশিক বস্তুতত্ত্বের সাধনে এই প্রেম জাগে।

তৃতীয়ত, পূর্ণ বস্তুতত্ত্বের সাধনে অদ্বৈতবোধে কোন প্রেম থাকে না। আত্মা

সাক্ষাৎকারী আত্মায় পরিবর্তিত হয়ে পুরোপুরি একাত্ম হয়ে যান অর্থাৎ পূর্ণাঙ্গ সমাধি হয়। এই অবস্থায় প্রেম হ'ল একত্ব। প্রেম ভগবানকে বাঁধবার রজ্জুস্বরূপ। এই অবস্থা জীবনকৃষ্ণের মধ্যে দেখা যায়। তাঁর ভাগবতী তনু আত্মায় পরিবর্তিত হয়। অর্থাৎ তাঁর ভাগবতী তনু বা সূক্ষ্ম মন যেন রজ্জু স্বরূপ হয়ে ভগবানকে বেঁধে ফেলে। বেঁধে ফেলে মানে পূর্ণ একত্ব উপলব্ধি হয়। প্রকৃত অর্থে পুরুষ অর্থাৎ চৈতন্যস্বরূপে অবস্থান করেন। সাধক হয়ে ওঠেন প্রেমিক। এই অবস্থা দ্বৈতবোধে নয়। প্রেমিক ও প্রেমাস্পদ এক হয়ে যান। এই প্রেমিক 'পুরুষ' বা ঈশ্বরের কথা মনে করলেই তার মহাবায়ু সহস্রারে যায় ও সমাধি হয়। তখন দেহেতে প্রেমের লক্ষণ ফুটে ওঠে। (১) তলপেটে দড়ার মতো হয়ে মহাবায়ু ওঠে (২) শরীর শীর্ণ হয়ে যায় (৩) বুক ফুলে ওঠে।

সহস্রারে মহাবায়ু ঈশ্বরমুখী হয়ে কেন্দ্রীভূত হয় অর্থাৎ point of union-এর দিকে যায়, তখন স্থূলদেহে তলপেটে দড়ার মতো হয়ে যায়। সেই সময় সূক্ষ্ম মন সম্পূর্ণরূপে বাহ্যচেতনাহীন হয়, পূর্ণ সমাধির দিকে অগ্রসর হয়। তখন স্থূল শরীর শীর্ণ হয়ে যায় বলে মনে হয়। পূর্ণ সমাধিতে একত্বলাভের অবস্থায় ঈশ্বর বাঁধা পড়েন, একটা প্রশান্তিভাব দেখা যায়। তাই বুক ফুলে ওঠে। সহস্রারের ঘটনা স্থূলদেহে কিছু লক্ষণ রূপে ফুটে ওঠে, বাইরের মানুষ দেখতেও পায়। এই ধরণের লক্ষণ ফুটলে বোঝা যায় যে প্রেম কোন তাত্ত্বিক জ্ঞানের বিষয় নয়, একটা সত্তাগত পরিবর্তন। আত্মিক সত্তার বিশেষ এক অবস্থা। এর পূর্ণ পরিণতিতে তাঁর প্রেমের দ্বারা মনুষ্য জাতিকে তিনি আত্মিকে এক করেন। সাধারণ মানুষের ঈশ্বরপ্রেম জাগে না, তারা বহির্মুখী। তিনি মানুষের অন্তরে প্রকাশ পেয়ে তাদেরকে তাঁর একত্ব দান করেন। তাঁর একত্ব লাভ করে সাধারণ মানুষের সূক্ষ্ম মনের গঠনের পরিবর্তন হয়। তারা অন্তমুর্খী হয়। তারা তাঁকে স্বস্বরূপ রূপে উপলব্ধি করে। তখন সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রেম জাগে। তখন যেন তারা প্রেমের দরবারে হাজির হয়। তাঁর সাথে এক হওয়ার আকাঙ্খা জাগে। এরপর তাঁকে আপন বৃহৎ সত্তা বলে উপলব্ধি হয় ও পূর্ণ প্রেম জাগ্রত হয়, যে অবস্থায় দ্বৈতবোধ থাকে না, শুধুমাত্র অস্তিত্ব নিয়ে প্রেম আস্বাদন করে।

● **প্রসঙ্গ ঃ বিদ্যামায়া।**

বিদ্যামায়া হল এক অখণ্ড চৈতন্য থেকে সৃষ্ট খণ্ড চৈতন্যের এক বিশেষ ধারা যা আংশিক বস্তুতত্ত্বের সাধক বা দ্বিতীয় স্তরের অনুভূতি সম্পন্ন সাধারণ মানুষকে

আত্মিক জগতে কিছুটা এগিয়ে দিয়ে একটা জায়গায় আটকে দেয় বা ঘুরপাক খাওয়ায়। পূর্ণব্রহ্ম বা অখণ্ড চৈতন্যের গুণ প্রকাশকারী অংশকে পূর্ণ ভাবায়। যেমন কেউ তার ইষ্ট কালী, কৃষ্ণ, যীশু এমনকি রামকৃষ্ণকে দেখে ভাবে পূর্ণ ঈশ্বর দর্শন হয়ে গেছে। আরও এগিয়ে সত্তার পূর্ণ প্রকাশকে জানা হয় না। কিছুমাত্র সংস্কার থাকলে বিদ্যামায়া সক্রিয় হয়। বিদ্যামায়া পূর্ণজ্ঞানের আবরণ স্বরূপ চেতনার স্তর। কিন্তু ষোল আনা বস্তুত্বের সাধন যাঁর, যিনি পূর্ণসংস্কার মুক্ত মানুষ, তাঁর আত্মিক অগ্রগতিতে বিদ্যামায়া কোন বাধা সৃষ্টি করতে পারে না। বরং তিনি বিদ্যামায়াকে চিনতে পারেন ও তাড়িয়ে দেন। জীবনকৃষ্ণের বিদ্যামায়া দর্শন হয় ৭ম ভূমিতে, বেদান্ত সাধন কালে। ষষ্ঠভূমিতে তিনি যে ইষ্ট দেখেন সেই ইষ্ট আবার সচ্চিদানন্দগুরুর রূপ নেয়। তাই ইষ্টকে ভগবান ভেবে ভুল করেন না। বিদ্যামায়ার ক্রিয়া হয় না।

বেদান্ত সাধনকালে জীবনকৃষ্ণ চারবার বিদ্যামায়াকে স্বপ্নে দেখেন, চিনতে পারেন ও তাড়িয়ে দেন। তাঁর দর্শন থেকে বিদ্যামায়া সম্পর্কে পূর্ণ ধারণা পাওয়া যায়। বিদ্যামায়া খণ্ডজ্ঞান স্বরূপ। এই জ্ঞান প্রচলিত ঈশ্বরীয় জ্ঞানের জাহাজ যেন। বেদান্ত সাধনকালে সাধকের ১২ বছর ধরে ব্রহ্মজ্ঞানের ফুট কাটে অর্থাৎ প্রচুর অনুভূতি হয়ে একজ্ঞানের উপলব্ধি হয়। কিন্তু বিদ্যামায়া যে কোন স্তরে সাধককে সন্তুষ্ট করে তার গতি থামিয়ে দিতে পারে। একজ্ঞানে পৌঁছানোর আগেই বোধ আসতে পারে যে, সর্বোচ্চ জ্ঞান তার হয়ে গেছে। সংস্কারে পূর্ণ মানুষের ক্ষেত্রে বিদ্যামায়া এই বোধ সৃষ্টি করে। প্রচলিত ধর্মগুলি আংশিক দর্শনকেই পূর্ণ বলে প্রচার করে এসেছে। এই ধারণা সংস্কারের রূপ ধরে যা বিদ্যামায়ারই এক রূপ তা সাধককে বিভ্রান্ত করতে চায়, পূর্ণ ব্রহ্মত্বের আস্বাদনে বাধা সৃষ্টি করে। কারও মধ্যে ঈশ্বরের সামান্য গুণ প্রকাশ পেলেই তাকে অবতার বলা হয়, ভগবান বলে দেওয়া হয়। যেমন রামকৃষ্ণের কথা, ‘‘অবতারকে দেখাও যা, ভগবানকে দেখাও তা।’’ কিন্তু ভক্তিধারার অবতার পূর্ণ ভগবান নয়। সেই সাধক ভক্তিরসে আবদ্ধ থাকে। এই ভক্তি তাকে পূর্ণ পুরুষে পরিবর্তিত হতে বা পূর্ণ পুরুষের বোধে যেতে বাধা সৃষ্টি করে।

জীবনকৃষ্ণ এই ভক্তিধারার অবতারত্ব অবস্থা অতিক্রম করে পুরুষে অর্থাৎ অখণ্ড চৈতন্য স্বরূপে পরিবর্তিত হন। তাঁর ‘‘ইউরোপীয় স্কলারশিপ’’ অর্থাৎ অপার বিশ্লেষনী ক্ষমতা জাগ্রত হয়। এই সময় তিনি চতুর্থ বা শেষবারের মতো বিদ্যামায়াকে তাড়িয়েছিলেন। দর্শন হলো, বিদ্যামায়া গেরুয়া কাপড় পড়ে বই

হাতে ছল করে ঘরে ঢুকল। উনি তৎক্ষণাৎ কাটারি, বঁটি, ও জাঁতি নিয়ে তাকে তাড়া করলেন। এই দর্শন থেকে বোঝা যায় যে গেরুয়া অর্থাৎ বাহ্যিক ত্যাগ (সংসার, কামিনী কাঞ্চন, আমিষ আহার, দামী পোষাক, অন্যান্য বিলাসিতা ইত্যাদি) এবং বই অর্থাৎ শাস্ত্রোল্লিখিত খণ্ডজ্ঞান বিদ্যামায়ার স্বরূপ। আপনা থেকে ত্যাগ হলে বিদ্যামায়ার প্রভাব থাকে না, কিন্তু বাইরে থেকে চেষ্টা করে ত্যাগ সাধকের অহং জাগ্রত করে আত্মিক অগ্রগতি রোধ করে। বিদ্যামায়া বোঝায় যে ত্যাগ ও শাস্ত্রানুশীলনই ঈশ্বরলাভের সর্বোচ্চ উপায়। তাই বিদ্যামায়া সাধারণ মানুষের মধ্যে ঈশ্বরমুখী চেতনা জাগ্রত করেও একটা স্তরে আটকে দেয়। চরৈবেতি মন্ত্রে অর্থাৎ এক জ্ঞানের দিকে নিরন্তর এগিয়ে যাওয়ার মননে সাধক থাকতে পারে না। কাটারি, বঁটি ও জাঁতি দিয়ে অর্থাৎ সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণের দ্বারা বিদ্যামায়ার রূপ সর্ম্পকে অবগত হন ও বিদ্যামায়াকে নিষ্ক্রিয় করেন। একমাত্র প্রাণশক্তির ক্রমাগত স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশ হতে থাকলে কোন অবস্থাকেই সাধকের চূড়ান্ত (ultimatum) বলে মনে হয় না।

বস্তুতত্ত্বের সাধনে সাধক যেমন বিদ্যামায়াকে চিনে তাড়িয়ে দেন তেমনি অবতারতত্ত্বের সাধন শেষে বিদ্যামায়াকে আশ্রয় দেন অর্থাৎ বিদ্যামায়া তাঁরই অংশরূপে থাকে, তাঁরই অধীনস্থ থাকে। বর্তমানে সমষ্টিচৈতন্য রূপে সাধারণ মানুষের অন্তরে তাঁর প্রকাশে তাদের মনন শক্তি বৃদ্ধি পাচ্ছে, বিদ্যামায়া ভক্তি বা খণ্ডজ্ঞান রূপে তাদের গতি রুদ্ধ করতে পারছে না। তারা অখণ্ড চৈতন্যের সাথে একত্ব বোধে বোধ করার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

● প্রসঙ্গ ঃ আত্মিক জগতে কাল ও স্থানের নাশ।

বস্তুতত্ত্বে আত্মা সাক্ষাৎকারের পর ১২ বছর ধরে ব্রহ্মজ্ঞানের ফুট কাটে অর্থাৎ প্রচুর অনুভূতি হয়ে একজ্ঞানের উপলব্ধি হয়। এই স্তরে একটি গুরুত্ব পূর্ণ উপলব্ধি হ'ল কাল ও স্থানের নাশ। সাধক ক্রমাগত ভবিষ্যৎ দেখতে থাকেন। আজ যা দেখেন কাল বা দুদিন পর তা মিলে যায়। অর্থাৎ খুব কম সময়ের ব্যবধানে ভবিষ্যৎ দর্শন মিলে যায়।

জীবনকৃষ্ণ বেদান্ত সাধনকালে এক বছর ধরে ক্রমাগত ভবিষ্যৎ দেখেন। তিনি যখন লণ্ডনে যান, কোন জাহাজ যাবেন, সেই জাহাজে তাঁর কেবিন নম্বর কতো, লণ্ডনে কোথায় থাকবেন, সেখানকার রাস্তাঘাট, ব্যাঙ্ক ইত্যাদি সমস্ত স্বপ্নে আগে দেখেন এবং পরে তা হুবহু মিলে যায়। আরও অনেক ভবিষ্যৎ দেখার

অনুভূতি থেকে তিনি বোঝেন যে হবে আর কোথায়, সব হয়েই আছে। অর্থাৎ অতীত ও ভবিষ্যৎ বর্তমানেই নিহিত। এখান থেকে বোঝা যায়, যে জ্ঞান তাঁকে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে ধারণা দেয় সেই জ্ঞানের উৎস তাঁর ভিতরেই। বিলেত অর্থাৎ নবজাগরণের ধাত্রী ভূমি জগৎ চৈতন্যের দিকে তাঁর বোধের যাত্রা ও তার বিকাশের পথের খুঁটিনাটি জানা শুরু হয়েছে এই বেদান্ত সাধন কালে। বিলেত থেকে ফেরার এক সপ্তাহ আগে তিনি স্বপ্নে দেখেছিলেন যে, পরে যখন আমেরিকা যাবেন তখন এইসব জায়গা আবার দেখে যাবেন। অর্থাৎ ভবিষ্যতে সমষ্টিচৈতন্য রূপে বিকাশ লাভের সময় জগৎ চৈতন্যের বিষয়গুলিকে আবার নতুন দৃষ্টিভঙ্গিতে বিশ্লেষণ করে ও উপলব্ধি করে এগিয়ে যাবেন। তিনি বোঝেন যে এক অখণ্ড চৈতন্যই অতীত বর্তমান, ও ভবিষ্যৎ জুড়ে প্রবহমান। এই চৈতন্য শাশ্বত। সকল কাল জুড়ে এক অখণ্ড চৈতন্যই আছে, এই বোধেই কালের নাশ হয়। এই বোধ সম্পূর্ণতা পায় স্থিত সমাধিতে। স্থিত সমাধিতে লয় হলে সাধকের চৈতন্য এক অখণ্ড চৈতন্যে পরিবর্তিত হয়। সাধক বোঝেন, 'আমিই আছি'। আমার চৈতন্য অনন্ত কাল ধরে প্রবহমান—এই বোধ দৃঢ় হয়। খণ্ড চেতনা খণ্ডকালের ধারণা দেয়। কিন্তু অখণ্ড চৈতন্যের ধারণা কালের নাশ ঘটায়।

এই কালের নাশ বিষয়টি সম্পূর্ণ আত্মিক জগৎ কেন্দ্রিক। এমন নয় যে স্বপ্নে দেখা বিষয় ভবিষ্যতে সব মিলে যাবে। অর্থাৎ আমাদের জীবনের সবকিছু হয়েই আছে এমনটি নয়। তবে কিছু কিছু যে মিলে যায়, তা থেকে বোঝা যায় যে, যা আছে দেহভাণ্ডে তাই আছে ব্রহ্মাণ্ডে। ফলে সাধক বাইরের জগৎ সম্পর্কে নির্লিপ্ত হয়ে যান।

একই ভাবে স্থান সম্বন্ধে বিভিন্ন দর্শনের উপলব্ধিতে স্থানের নাশ হয়। স্থানকে দুভাবে দেখা যায়। এক—স্থান মানে জায়গা যেখান থেকে ধর্মীয় চেতনার উদ্ভব হয় বলে মনে করা হয়। যেমন মন্দির, মসজিদ, গির্জা, সিনাগগ, আবার কাশী, বৃন্দাবন, নবদ্বীপ, মক্কা, জেরুজালেম ইত্যাদি স্থান থেকে ঈশ্বর আরাধনার মাধ্যমে ধর্মীয় চেতনার সৃষ্টি হয়—এইরকম প্রচলিত ভাবনা আছে।

দ্বিতীয়ত, স্থান মানে ভাবাদর্শগত অবস্থান (position) বা ভিত্তি (ideology) যেখান থেকে আধ্যাত্মিক চেতনার সৃষ্টি হয়েছে বলে ধরা হয়। বৈদিক মত, তান্ত্রিক, শৈব, বৈষ্ণবীয়, ইসলামীয়, খ্রীষ্টিয় ইত্যাদি মতাদর্শ থেকে ঈশ্বরীয় চেতনার সৃষ্টি হয় বলে মনে করা হয়। কিন্তু জীবনকৃষ্ণ বেদান্ত সাধনকালে

বিভিন্ন দর্শনের বিশ্লেষণ করে উপলব্ধি করেন যে সমস্ত আধ্যাত্মিক চেতনার উৎস হ'ল একজ্ঞান রূপে অখণ্ড জগৎ চৈতন্য। তিনি গোটা কোলকাতাটা স্বপ্নে ভিতরে দেখলেন। তিনি বুঝলেন যে, এ কোলকাতা বাইরের স্থূল কোলকাতা নয়, এ হলো কোলকাতার মানুষের ঈশ্বর সম্পর্কে বিবিধ চেতনা যার সবকিছুর উৎস তাঁর ভিতরেই। আরও বিভিন্ন দর্শনের পর তাঁর আত্মার মধ্যে জগৎ বা বিশ্বরূপ দর্শন হয়। তিনি নিঃসন্দেহ হলেন যে মনুষ্য জাতির বহু চেতনার উৎস তার আত্মা বা একজ্ঞান যা তিনি ধারণ করেছেন। তিনি বুঝেছিলেন যে স্থান মাহাত্ম্য বলে কিছু নেই। বাহ্যিক কোন স্থান থেকে ধর্মীয় চেতনার সৃষ্টি হয় না। বাইরের ভাবাদর্শগত স্থানেও খণ্ড চেতনা রয়েছে যেখান থেকে ধর্মীয় চেতনার সৃষ্টি হয় না, বরং সমস্ত খণ্ড চেতনার সৃষ্টি একজ্ঞান থেকেই। প্রকৃত পক্ষে কাল ও স্থানের নাশ সম্পূর্ণতা পায় যখন তাঁর বোধ হয় যে তিনিই অখণ্ড চৈতন্য।

তারপরই তাঁর চেতনার বিক্ষেপ ঘটান সাধারণ মানুষের মধ্যে। সাধারণ মানুষ তাঁর চেতনা লাভ ক'রে একজ্ঞান ধারণা করে এবং চিরকালীন এক চৈতন্য সত্তাই আছে এই উপলব্ধি হয়। তখন তাদেরও স্থান ও কালের নাশ হয়।

● **প্রসঙ্গ ঃ পরমাত্মা দর্শন।**

ধর্ম মানে জীবাত্মার সঙ্গে পরমাত্মার একত্ব উপলব্ধি। বেদমতে আত্মা ও পরমাত্মা এক। একজন মানুষের বস্তুতত্ত্বের সাধন হয়ে তার জীবাত্মা পরমাত্মায় পরিবর্তিত হয়। তিনি আত্মার পরম রূপ জানতে পারেন। পরে সেই পরমাত্মার আরও বিকাশ ঘটে। তখন বহুমানুষের অন্তরে ঐ মানুষটার চিন্ময় রূপে সেই পরমাত্মার পরিচয় ক্ষুদ্ররূপে প্রকাশ পায়। তাদের আত্মিক জীবন লাভ হয়। তাদের চৈতন্য সত্তা ঐ পরমাত্মার সঙ্গে একত্ব উপলব্ধি করে ও তাদের একজ্ঞান লাভ হয়, ধর্ম হয়। পরমাত্মার সঙ্গে এই একত্বে সূক্ষ্ম দ্বৈতবোধে প্রেম আস্বাদন হয়, যদিও তা বস্তুত আপন বৃহৎ সত্তার সঙ্গে মিলন, অদ্বৈতবোধে নিজের রস নিজে আস্বাদন।

বস্তুতত্ত্বের সাধনে সম্যক সমাধি হয়। সাধক পরমাত্মা দর্শন করে পরমাত্মা হয়ে যান। তখন তার চিন্ময় রূপে পরমাত্মার ক্ষুদ্র রূপ বহু মানুষের অন্তরে প্রকাশ পায়। সেই পরমাত্মার সঙ্গে তাদের হয় সংযোগ সমাধি তথা একত্ব।

সপ্তম ভূমিতে সচ্চিদানন্দগুরু যে আত্মাকে দেখিয়ে দেন সেই আত্মা হ'ল

জীবাত্মা। কেননা তখনও দেহবোধ তথা ব্যষ্টির আমি বোধ আছে। এরপর আত্মার মধ্যে জগৎ বা বিশ্বরূপ দর্শন, বিশ্ববীজবৎ দর্শন ও জগৎ স্বপ্নবৎ দর্শনের পর আত্মার পরম রূপ পরমাত্মা দর্শন হয় তূরীয় অবস্থায়। সাধক দেখেন স্বল্প শুভ্র কুয়াশার মধ্যে ফিকে জ্যোৎস্নার ন্যায়। যেহেতু এই দর্শন হয় সগুনে তাই এই দর্শনে আত্মাই যে পরম সত্য, পরম এক তা পরিষ্কার ধারনা হয় না। ধীরে ধীরে সেই জ্ঞানের উন্মোচন হবে তাই কুয়াশা দেখা যায়। সগুনে পরমাত্মার পূর্ণরূপ প্রকাশ পায় না।

এরপর জড় সমাধিতে বোধমাত্র অবস্থায় জগৎ চৈতন্যকে নিজের স্বরূপ বলে জানতে পারেন। এখানেই সগুণ সাধনার সমাপ্তি। তারপর নির্গুণের সাধনে স্থিত সমাধিতে বোধের লয়। চেতনা ফিরে এলে বোধ হয় আমি না, তুমি। শুরু হয়, তুমি তুমি, তত্ত্বজ্ঞান। শেষে আমি তুমিতে পরিবর্তিত হয়, আমিই আছি এই বোধ হয়। আত্মার সাধন শেষ হয়। এরপরও নিষ্ক্রিয়ভাবে ‘আমি তুমি’ অর্থাৎ দ্বৈতভাব থাকে যা সম্পূর্ণভাবে উচ্ছেদ হয় নির্গুণে পরমাত্মা দর্শনে। সাধক তখন দেখেন তার মাথার চামড়া গুড়িয়ে গেল ও সহস্রার দর্শন হলো। দ্বৈতঅবস্থা রূপ সূক্ষ্ম অহংকারের আড়াল সরে গেল। সহস্রারে উজ্জ্বল বিদ্যুৎ রেখা দেখা গেল। নির্গুণের শক্তি সাধককে পরম সত্য তথা পরম একের বোধ দান করে। তখন ‘তুমি’ সম্পূর্ণভাবে ‘আমি’র দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়েছে। এর পর নিগম শুরু হয়। চৈতন্য সাক্ষাৎকার ও চৈতন্যের অবতরণ বা প্রকাশ ঘটে। দেহের ভিতর ছোট্ট দেহী মানুষ রতন দর্শন হয়। ব্যষ্টিতে নিজেই যে ঈশ্বর অর্থাৎ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ হয়ে গেছেন তা বুঝতে পারেন। এখানে সগুণের প্রভাব বেশী। পরে আরও আত্মিক বিকাশ হয়। ১২ বছর পর বিশ্বব্যাপিত্বের পর্যায়ে সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ বা বিকশিত ব্রহ্ম হন, বস্তুতত্ত্বে ব্রহ্ম দর্শনের ফলে। তখন দর্শন হয়, সহস্রারের ঢাকনা খুলে গেল ও পরমব্রহ্মের ধারনাগত রূপটি অনুভূত হলো। তিনি পরমাত্মা পরমেশ্বর, বা পরমব্রহ্ম হয়ে ওঠেন।

এই অবস্থা না হলে একত্ব বা ব্রহ্মত্ব দান করা যায় না। এটি ভূমানন্দ বা সচ্চিদানন্দ অবস্থা। এখানে নির্গুণের ক্রিয়া বিশেষ ভাবে দেখা যায়। তিনি বিশ্বব্যাপিত্ব লাভ করেন।

তাহলে দেখা গেল বস্তুতত্ত্বের সাধনে তিন পর্যায়ে পরমাত্মা দর্শন হয়। এরপর তা প্রকাশ পায় জগতের মানুষের মধ্যে। তারা ঐ মানুষটির চিন্ময় রূপে পরমাত্মা, পরমেশ্বর বা পরমব্রহ্ম দর্শন করে। ধীরে ধীরে তাকে আপন সত্তা

বলে বোধ হয়। শেষে তার সাথে একত্ব লাভে নিজের সত্তাহীন অস্তিত্ব অনুভব করে ও আত্মিক এক জ্ঞানের ধারনা লাভ করে।

● **প্রসঙ্গ ঃ দেহতত্ত্ব।**

দেহতত্ত্ব মানে মানুষের স্থূলদেহের ভিতর যে আত্মিক দেহ রয়েছে তার ক্রমবিকাশ ও পরিণতি লাভের কথা। এই কথা শুনলে মানুষের বহির্মুখী মন অন্তর্মুখী হয়।

রামপ্রসাদের একটি গানে এই দেহের পরিবর্তনের ধারাটির বর্ণনা আছে ইঙ্গিতে। সেখানে বলা হয়েছে—

‘‘শ্যামা মা কী কল করেছে, কালী মা কী কল করেছে
চোদ্দ পোয়া কলের ভিতর কতরঙ্গ দেখাতেছে।’’

শ্যামা বা কালী মা হল চোদ্দ পোয়া স্থূল দেহের ভিতর আত্মিক দেহ অর্থাৎ আদ্যাশক্তির কথা। এই আদ্যাশক্তি প্রসন্ন হলে ভাগবতী তনু সৃষ্টি করে। এটি আশ্চর্য কল বা দেহ যা বিচিত্র রূপ ধরে সহস্রারে নানান দর্শন অনুভূতি সৃষ্টি করে। এর পরিণতিতে নতুন এক কল সৃষ্টি হয়—আত্মা। সে বিষয়ে বলছেন—

‘‘আপনি থাকি কলের ভিতরি কল ঘোরে ধরে কলডুরি
কল বলে আপনি ঘুরি জানে না কে ঘোরাতেছে।’’

আত্মার মধ্যে জগৎ দর্শন হয়। ফলে সাধকের মন আত্মস্থই থাকে—বাইরে যে জগৎ নেই, কোথায় যাবে? কল ঘোরে অর্থাৎ আত্মার বিবর্তন হয় নির্গুণের সূক্ষ্ম আকর্ষণে, নির্গুণে লয় হবার অভিমুখে—সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের ধারাপথ বেয়ে। আত্মা—আত্মার মধ্যে জগৎ—জগৎ বীজবৎ—বীজ স্বপ্নবৎ ইত্যাদি দর্শন হতে থাকে। বিশ্বরূপ দর্শনে আমার মধ্যে এত বড় জগৎ—এই ভেবে ভেল্কি লেগে যায়। পরবর্তী দর্শনগুলিতেও খুঁত খুঁত ভাব থেকে যায়। পরে বোধাতীত অবস্থায় পৌঁছে নির্গুণে লয় হলে ও শেষে তত্ত্বজ্ঞানে, ‘আমি তুমি, তুমি আমি’ করতে করতে ‘‘অহমস্মি’’ উপলব্ধি হলে বোঝা যায় বাইরে থেকে কেউ ঘোরায়নি, সবটা নিজের সত্তার বিবর্তন—self evolution—আপনা হতে হয়েছে।

‘‘যে কলে জেনেছে তারে, কল হতে হবে না তারে
কোন কলের ভক্তিডোরে আপনি শ্যামা বাঁধা আছে।’’

তত্ত্বজ্ঞানের পর অবতারতত্ত্বে ছোট্টদেহী পরমভক্ত মানুষরতন দর্শন হয়। এই ভক্তি আপন বৃহৎ সত্তার সঙ্গে একত্ব উপলব্ধির প্রক্রিয়া তথা রসাস্বাদন।

মানুষরতন দর্শন করে সাধক তার ব্রহ্মস্বরূপ উপলব্ধি করেন স্পষ্টভাবে। তিনি আর কল হবেন না অর্থাৎ এটিই তার চূড়ান্ত আত্মিক দেহ যা অপরিবর্তনীয়। তিনি এখন—বৈশ্বিক দেহ (cosmic body) সম্পন্ন এবং তার রূপ বস্তুত অরূপের রূপ হয়ে গেছে। তার আদ্যাশক্তি নির্গুণ ব্রহ্মে পরিবর্তিত হয়ে গেছে, সুতরাং তার রূপ এখন নির্গুণের রূপ—ব্রহ্মরূপিনী কালীর রূপ।

তাঁর চিন্ময় রূপ বহুমানুষের সহস্রারে ফুটে ওঠে—তাদের আত্মিক দেহের গঠন পুনর্গঠন চলতে থাকে— শেষে তার সাথে একত্ব উপলব্ধি করলে, তাকে আপন সত্তা বলে বোধ হয় ও জানা যায় তিনি নির্গুণের ঘনমূর্তি। আমি বোধমাত্র, এটুকু আমার অস্তিত্ব। তার প্রতি ভক্তি অর্থাৎ এক হবার ব্যাকূলতা বহির্মুখী মনকে অন্তর্মুখী করে ও চেতনার অপমৃত্যু থেকে মানুষকে রক্ষা করে।

● **প্রসঙ্গ ঃ রহস্যময়ী মায়া।**

একজন সাধকের সাধন প্রক্রিয়ায় মায়া নানাভাবে প্রভাব বিস্তার করে। বাহ্যিক জগতে যেমন মায়া থাকে তেমনি আধ্যাত্মিক জগতেও মায়া নানাভাবে ক্রিয়াশীল থাকে। তবে বস্তুতত্ত্বের সাধন হয় যার তার ক্ষেত্রে বাহ্যিক ও আধ্যাত্মিক জগতের মায়ার রহস্য ভেদ হয়। বেদ বিভিন্নভাবে মায়ার অস্তিত্ব বর্ণনা করেছে। ঐশ্বরিক মায়া (ঋকবেদ), ভ্রমসৃষ্টিকারী মায়া (যজুর্বেদ) ও সৃষ্টির শক্তি (অর্থব বেদ) হিসেবে মায়াকে বর্ণনা করা হয়েছে। উপনিষদ বাহ্য জগতের মায়াকে ভ্রম বলেছে। তাকে কাটিয়ে অন্তরে সত্য জগতের রূপ সন্ধান করতে বলেছে। জীবনকৃষ্ণের ব্যষ্টির সাধনের ধারায় মায়ার স্বরূপ সম্পূর্ণ রূপে উন্মোচিত হয়। পঞ্চকোষের সাধনে কোশের আবরণ সরে গিয়ে যখন সত্তার সৃষ্টি ও প্রকাশ হয় তখন মায়া ভ্রম সৃষ্টি করে। সাধক বুঝতে পারেন না যে এই সৃষ্টি ও প্রকাশ ভিতরে হচ্ছে না বাইরে হচ্ছে। যেমন মনোময় কোশে মন এলে চারিদিকে জ্যোতি দর্শন হয়। সাধক বাইরে যেদিকে তাকান সেই দিকেই জ্যোতি দেখেন। তিনি বুঝতে পারেন না যে এই জ্যোতি তিনি বাইরে দেখছেন না ভিতরে দেখছেন। আবার বিজ্ঞানময় কোশে পঞ্চম ভূমিতে মন এলে নিজের সত্তা অর্ধনারীশ্বরে (ঊর্ধ্বাঙ্গ পুরুষ, নিম্নাঙ্গ নারী) পরিবর্তিত হয়ে দর্শন দেয়। তখন সাধকের মধ্যে ভ্রম সৃষ্টি হয় যে, এটা হয়তো তার স্থূল দেহগত পরিবর্তন। জীবনকৃষ্ণের মধ্যেও মূহুর্তের জন্য এই ভ্রম সৃষ্টি হয়েছিল। তিনি যে আত্মিক জগৎ সৃষ্টির উৎস, অর্ধনারীশ্বরের এই তাৎপর্য তখন ধরতে পারেন নি। কিন্তু

জীবনকৃষ্ণের সাধন যেহেতু আপনা থেকে, তাই পরে ঐশ্বরিক মায়া ক্রিয়াশীল হয়ে ঐ ভ্রম কাটাতে সাহায্য করেছিল। এ যেন মায়ার কৃপা। তার পরেই ষষ্ঠ ভূমিতে জ্ঞান চক্ষু উন্মীলন হয়। তাঁর ভাগবতী তনু যেন জ্ঞান (আত্মা সাক্ষাৎকার ও আত্মা সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান) ধারণের উপযুক্ত আধার হয়ে ওঠে। তাঁর কাছে জ্যোতি দর্শন বা অর্ধনারীশ্বর হওয়ার রহস্য উদ্‌ঘাটিত হয়।

ষষ্ঠ ভূমির পরবর্তী দর্শন ইষ্টমূর্তি। জীবনকৃষ্ণের ক্ষেত্রে সচ্চিদানন্দ গুরু তাঁর ইষ্ট কালীকে দেখিয়ে বলে দেন, এই তোর ইষ্ট। ইষ্ট আবার সচ্চিদানন্দ গুরুর রূপ ধরেন। কালী অর্থাৎ তার ভাগবতী তনু কিভাবে সচ্চিদানন্দে পরিবর্তিত হয় তা লক্ষ্য করতে বলছেন।

তারপর রহস্যময়ী মায়ামূর্তি দর্শন হয়। তিনি স্নিগ্ধা, ধীরা, ভ্রূমধ্যে হাতের বুড়ো আঙুল ঠেকিয়ে নৃত্যপরা, কৃশাঙ্গী, অপূর্ব লাবণ্যময়ী। বসন ফিকে নীলাম্বরী। মূর্তিতে আনন্দ যেন সর্বাঙ্গ দিয়ে উচ্ছ্বলিত হয়ে ছড়িয়ে পড়ছে। তার দৃষ্টি ভূমিতে আনত ও আবদ্ধ। এই দৃষ্টি বুঝিয়ে দেয় ইনি রহস্যময়ী মায়া।

এই দর্শনে সাধকের ভ্রম দূর হয়। বোঝেন সব ভিতরে দর্শন হচ্ছে। আর তা আদ্যাশক্তিরই পরিবর্তিত রূপ। এনার প্রসন্নতায় মন জাগতিক সমস্ত সৌন্দর্য ও আনন্দের আকর্ষণ থেকে মুক্ত হয়ে সম্পূর্ণ অন্তর্মুখী হয় ও স্নিগ্ধ হয়, ধীর হয়। সূক্ষ্ম মন লাভে কৃশাঙ্গী অর্থাৎ একমুখী হয়। ইনি নৃত্যপরা, নৃত্যধীর। এই নৃত্য সাধকের প্রাণচৈতন্যের ছন্দবদ্ধ গতিশীলতাকে বোঝায় যা মায়ার কৃপালাভে অব্যাহত থাকে। এই নৃত্যের সঙ্গে একটা শব্দ হয়—এ হ'ল অনাহত শব্দ। ভূমিতে আনত ও আবদ্ধ দৃষ্টি বোঝায় মায়ার কৃপা না হলে সাধকের মন ষষ্ঠভূমিতে আবদ্ধ হয়ে যায়। আর এগোতে পারেন না। রহস্য জনক উপায়ে (যা জানা যায় না) সৃষ্টি শক্তির দ্বারা তিনি ভাগবতী তনুকে আত্মায় তথা জ্ঞান সমুদ্রে পরিবর্তিত করেন। তারপর সপ্তম ভূমিতে প্রবেশের দ্বার খুলে দেন। সেখানে বুড়ো আঙুল আকৃতির আত্মা বা ভগবান দর্শন হবে। সেখানে মায়া নেই, ভ্রম নেই, আর সৃষ্টিশক্তিকেও জানা যায়। তবে পরেও আবার ঐশ্বরিক মায়া প্রকাশ পায় যতক্ষণ না মায়ার তথা দেহের রহস্য সম্পূর্ণ ভেদ হয় ও সাধক পূর্ণ একজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হন। তখন জীবনমৃত্যুর রহস্য ভেদ হয়।

সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে মায়ার প্রভাব খুব বেশী। বাহ্যিকে মায়া পূর্ণরূপে ক্রিয়াশীল থাকে। মায়ার প্রভাবে বাইরের অনিত্য বিষয়কে নিত্য বলে আঁকড়ে ধরে। বহির্মুখী মন অন্তর্মুখী হতে পারে না আবার অন্তর্মুখী মন ঈশ্বর প্রাপ্তির

পথ নির্বাচনে মায়ার দ্বারা বিভ্রান্ত হয়। তাই রামকৃষ্ণদেব বলেছেন, ভক্তিতে মানুষ আটকে যায়।

বর্তমান সময়ে সমষ্টিচৈতন্যের ক্রিয়াশীলতায় সাধারণ মানুষের মন অন্তর্মুখী হচ্ছে। এই অবস্থায় ঐশ্বরিক মায়া বিদ্যামায়া রূপে ক্রিয়াশীল হয়। ভক্তির সংস্কার, খণ্ডজ্ঞান, ব্যষ্টির সাধনের সংস্কার ইত্যাদি তাঁর স্বরূপ প্রকাশে বাধার সৃষ্টি করে। ভ্রমাত্মক মায়ার ক্রিয়া সবচেয়ে বেশী থাকে, অন্তরের বিষয়গুলি সবসময় বাইরের বলে মনে হয়। কিন্তু একত্বের চেতনায় থেকে মনন সাধনে যুক্ত থাকলে মায়ার রহস্যময়তা দূর হয়। তখন ভ্রমাত্মক মায়া দূর হয় ও মনের ঈশ্বরমুখী গতি অব্যাহত থাকে। ফলে অখণ্ডচৈতন্য তথা সমষ্টিচৈতন্যকে আপন সত্তা বোধ হয় ও একজ্ঞান লাভ হয়।

● প্রসঙ্গ ঃ **অবতার লীলা।**

অবতার সম্বন্ধে প্রচলিত ধারণা হ'ল—ঈশ্বর মানুষ রূপে জন্মগ্রহণ করে নানা লীলা প্রদর্শন করে অধর্ম নাশ করেন ও ধর্ম স্থাপন করেন। কিন্তু সত্য হ'ল একজন মানুষের দেহে আপনা হতে সাধন হয়ে ঈশ্বর দর্শন হয় ও তিনি ঈশ্বরে পরিবর্তিত হন। অতঃপর সেই ঈশ্বর বা অখন্ড চৈতন্যের অবতরণ তথা প্রকাশ ঘটে তাঁর দেহে। সেই মানুষটি অবতার আর তার দেহে অবতীর্ণ চৈতন্যের প্রকাশ হওয়াকে অবতারলীলা বলে।

আত্মা কৃপা করে সচ্চিদানন্দগুরু রূপে দেহ থেকে মুক্ত হন, এই থেকে আরম্ভ করে দেহের মধ্যে অখণ্ড চৈতন্যের মানুষরতন হওয়া পর্যন্ত সমস্তই অবতারলীলা। এই প্রকাশের তিনটি অবস্থা (১) সগুণ (২) নির্গুণ ও (৩) অবতারতত্ত্ব।
সাধক এই সমগ্র সাধন ধারা উপলব্ধি করেন অবতারতত্ত্বের সাধনের সময়। তিনি যেন নিজের রস নিজে আস্বাদন করেন। অবতার তত্ত্বের সমস্ত কথা দেহতত্ত্বে প্রকাশ পায়। অবতারলীলার মধ্যে আর চার রকম লীলা আছে,— নরলীলা, জগৎ লীলা, ঈশ্বরলীলা ও দেবলীলা। এই লীলাগুলির দেহতত্ত্বে প্রকাশেরও দুটি দিক আছে- (১) সাধকের নিজের মধ্যে উপলব্ধি হওয়া আর (২) অপর মানুষের মধ্যে প্রকাশ হওয়া।

(ক) **নরলীলা**—নরদেহে শ্রীভগবান প্রকাশ হয়ে লীলা করেন। এই প্রকাশের লীলা তিন রকমের

(১) পঞ্চ কোষের সাধনের মাধ্যমে ''সগুন-নির্গুণ'' ও ''আগম-নিগম'' সাধনের ফল হিসাবে সাধকের দেহে শ্রীভগবানের ''অবতারত্ব'' দ্বারা প্রকাশ ঘটে। নরদেহ যেমন একাধারে 'স্থূল' দেহটি বোঝায় তেমনি দেহতত্ত্বে নরদেহ হল ভাগবতী তনু যা আদ্যাশক্তির (বা ভগবানের) কৃপার ফলে সংস্কারমুক্ত দেহ। এই দেহেই তিনি প্রকাশিত

হন বিভিন্নরূপে অর্থাৎ লীলায়। এই লীলার অন্তিম অবস্থা হল তার জগৎরূপে প্রকাশিত হওয়ার আকাঙ্ক্ষা।

(২) স্থিত সমাধির পর তত্ত্বজ্ঞানে মন নেমে আসে। 'আমি না- তুমি' পরে 'তুমি আমি, আমি তুমি'' করে শেষে অহমস্মি অর্থাৎ আমিই আছি, আমিই অখণ্ড চৈতন্য-এই জ্ঞান হয়। এরপর নিগমে অখণ্ড চৈতন্যের অবতরণ ও প্রকাশ ঘটে। নিজের মধ্যে এই অখণ্ড চৈতন্যের প্রকাশ এবং অন্যের মধ্যে তার প্রকাশিত রূপ দেখার আকাঙ্ক্ষা জাগে।

(৩) নরলীলার বাহ্য প্রকাশের ধারায় দেখতে পাওয়া যায় তিনি বহু মানুষের মধ্যে সচ্চিদানন্দগুরু রূপে প্রকাশ পেয়ে লীলা করেন। তখন দ্বিতীয় স্তরের মানুষের নরদেহে তার চিন্ময় রূপ (অবয়ব) প্রকাশ পেয়ে বা বিশেষ কোন দর্শন থেকে একজ্ঞানের শিক্ষা শুরু হয়ে জগৎ-চৈতন্যকে তথা একক নরকে জানার, তার সঙ্গে এক হবার ইচ্ছা জেগে ওঠে, এ তার নরলীলার প্রকাশ।

মানুষ হয়েছেন তো ঠিক মানুষ। তবে কামকাঞ্চন বাদ অর্থাৎ চৈতন্যময় পুরুষ। তবে সাধারণ মানুষের যে গুণ, নিজেকে (নিজের জগৎ চৈতন্য সত্তাকে) দেখার একটা আকৃতি তারও থাকে।

ঠাকুর যখন তার ভাইপো অক্ষয়ের মৃত্যু সংবাদ শুনে ''ওরে অক্ষয় রে তুই কোথায় গেলি রে'' বলে কেঁদে উঠছেন, তার এই কান্না আসলে অপরিবর্তনীয় অক্ষয় সত্তায় পরিবর্তিত হওয়ার ব্যাকুলতার প্রকাশ।

রামকৃষ্ণলীলায় ফাগুর দোকানের হিঙের কচুরী শাশ্বত, নরলীলার স্মৃতি বিজড়িত। গিরীশকে কচুরী খেতে দিয়ে বলছেন, কচুরী কিন্তু রজোগুনের। এই কথায় বোঝা যায় উনি খাওয়ানোটাকে আত্মিকে দেখছেন। তিনি সচ্চিদানন্দ অবস্থা লাভ করে মানুষটাকে চিরকাল ধরে তার ব্রহ্মত্ব আস্বাদন করাতে চান। তার হাত ভাঙার পর তিনি ডাক্তারকে বলছেন, বাবু, সচ্চিদানন্দ লাভ না হলে কিছু হ'ল না। তার এই কথার দ্বারা অন্যের মধ্যে সচ্চিদানন্দ গুরু রূপে প্রকাশ হওয়ার আকাঙ্খাই ব্যক্ত হয়েছে।

নরলীলার কথা বলতে গিয়ে পুরানের কথা দিয়ে জীবনকৃষ্ণ বলছেন, পূর্ণব্রহ্ম রামচন্দ্র সীতার শোকে কেঁদেছিলেন। রাম-এক। সীতা এখানে একের একত্ব। রামের কান্নার দ্বারা তার একত্বের বাহ্য প্রকাশ ঘটুক, তার চিন্ময় রূপে ঐ একত্ব অন্যের ভিতর প্রকাশ পাক—এই ব্যাকুলতাকে বোঝানো হয়েছে। জীবনকৃষ্ণ যখন বলছেন, ''আমার ব্রহ্মত্ব জগতের সকল নরনারী শিশুবৃদ্ধ সকলে এই মুহূর্তে লাভ করুক—'' এখানেও তার সেই আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পেয়েছে। কদমতলা নিবাসী অমূল্য রায় জীবনকৃষ্ণের আঙুল মচকে দেওয়ার পর যখন অনুতপ্ত হয়ে তার পা ধরে বলতে লাগলেন যে জগাই মাধাই উদ্ধার হয়েছিল আর আমি উদ্ধার পাব না? তখন উনি তাকে তুলে বুকে জড়িয়ে

ধরে বললেন, আপনার স্থান পায়ে নয়, আমার বুকে। আমিই জগাই, আমিই মাধাই, কাকে উদ্ধার করবো ? অর্থাৎ তাকে তাঁর সাথে এক করে নেবার তীব্র আকাঙ্ক্ষা এখানে প্রকাশ পেল। এসবই তাঁর নরলীলার অঙ্গীভূত।

তিনিই যে বহু হয়েছেন তা দেখতে চাইছেন। রাম অশ্বমেধ যজ্ঞ করে ঘোড়া ছেড়ে দিয়েছেন। ঘোড়া ফিরছে না দেখে নিজেই বেরিয়ে পড়লেন। তখন দেখলেন ঘোড়া কেউ আটকায়নি। দেরী হবার কারণ লবকুশ যে তার সন্তান সেই পরিচয় প্রদান করতে চায়, তাই তার প্রকাশ চাইছে। অবতার দেখেন জগতের সব মানুষই তার সন্তান- অমৃতস্য পুত্রা: । লবকুশ—জগৎরূপ রঙ্গমঞ্চের কুশীলব, সাধারণ মানুষ। তাই ‘‘বরাহ অবতারে বিষ্ণু ছানাপোনাদের মাই দেন।’’ তাই অবতারের পেটের মধ্যে সন্তান নড়াচড়া করার মতো অনুভূতি হয়। ঠাকুর বলেছেন—‘‘ওগো, সে যে লড়ে চড়ে।’’

(খ) **জগৎলীলা** —জগৎলীলা অবস্থায় আত্মাই এক রূপে জগৎ হয়ে লীলা করছেন। আত্মার মধ্যে জগৎ-এই অনুভূতি যখন উপলব্ধির স্তরে আসে, সহস্রার থেকে কণ্ঠদেশ পর্যন্ত জ্যোতিরূপে চৈতন্যের অবতরণ দর্শনের পর- তখন সাধক বোঝেন তার নিজের মধ্যেই জগৎ। এবার সহস্রার থেকে কটিদেশ পর্যন্ত চৈতন্যের অবতরণ ঘটে। তখন শুধু সগুণ নয়, সগুণ নির্গুণ মিলিয়ে যে বিরাট আত্মিক জগৎ অর্থাৎ যথার্থ বিশ্বরূপের উপলব্ধি হয়। আত্মিক জগতের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয় গুলিও প্রকাশিত হয় তার কাছে। তিনি বোঝেন এই জগৎ- যা আত্মিক, তার সব কিছু অর্থাৎ ঈশ্বর, মায়া, জীব, জগৎ সমস্তই তার মধ্যে, তিনিই এই জগৎরূপে প্রকাশ হয়েছেন। এই প্রকাশের দুটি অবস্থা-

(১) বাহ্যজগৎও চৈতন্যময়- চতুর্থভূমি স্তরে যে জ্যোতিদর্শন হয় তা অনুভূতির আলোকে সাধক নিজেকে (নিজের জগৎ-চৈতন্য সত্তাকে) জ্যোতির্ময় জগৎরূপে দেখেন ও তার রস আস্বাদন করেন।

(২) আত্মা-ঈশ্বর-ব্রহ্ম তিনই এক। আবার ব্রহ্মজগৎ আত্মার মধ্যে- এই উপলব্ধি অর্থাৎ নিজে ব্রহ্মজগৎ রূপে প্রকাশ পান। এটি বিজ্ঞানীর প্রথম অবস্থা। এ অবস্থায় তিনি ভক্তি ও ভক্ত নিয়ে থাকেন অর্থাৎ তিনি ভক্ত এবং জগৎচৈতন্যের সঙ্গে একত্ব উপলব্ধির আকাঙ্ক্ষা যেন ভক্তি। জগৎচৈতন্যের মধ্যেই তিনি আছেন। তাকে নিয়েই তিনি মননে রত থাকেন। এ যেন সূক্ষ্ম দ্বৈতবোধ সৃষ্টি করে নিজের রস নিজে আস্বাদন করা। এই অবস্থা প্রচলিত ভক্তিতত্ত্বের কাল্পনিক ভক্তিরস আস্বাদন নয়। ঠাকুরের মানুষরতন, মহাপ্রভুর শ্রীকৃষ্ণ বা যীশুর বরের অবস্থা নয়।

কষ্টহারিনীর ঘাটে নৌকা মধ্যে ভক্তসঙ্গে ঠাকুর রামকৃষ্ণ আছেন। সকলের খিদে পেয়েছে। লাটু মহারাজ এক ঠোঙা ছানার মুড়কি আনলেন ও ঠাকুরের হাতে দিলেন। ভাবলেন, ঠাকুর কিছুটা খেয়ে বাকীটা তাদের দেবেন। কিন্তু ঠাকুর সবটা খেয়ে নিলেন। মুড়কি খেয়ে ঠাকুরের তৃপ্তি দেখে বাকী চারজন ভক্তও তৃপ্ত হলেন।

আমিই জগৎ হয়েছি। আমার বাইরে কোন জগৎ নেই। এক আমিই আছি বোধে অধিষ্ঠিত ও তৃপ্ত হলেন। তিনি বাইরের জগতের চিন্তা করছেন না। তাই ভক্তদের কাউকে মুড়কি দেবার কথা মনে উদয় হয়নি। এই ঘটনায় তাঁর চেতনা নিজের ভিতরে বিক্ষেপ করে জগৎরূপে প্রকাশ হওয়া ও তা আস্বাদন করার বিষয়টি বাস্তবে প্রতিফলিত হয়েছে।

জীবনকৃষ্ণও সেইরূপ জগৎলীলায় তাঁর চেতনা ভিতরের জগতে বিক্ষেপ করলেন। তিনি জগৎ রূপে প্রকাশ হয়ে নিজের চৈতন্যের রস নিজে আস্বাদন করলেন।

তারই ফলস্বরূপ বহু মানুষের মধ্যে তার জগৎলীলার প্রকাশ শুরু হয়। সাধারণ মানুষের মধ্যে নরলীলার ফলস্বরূপ সচ্চিদানন্দ গুরুর প্রকাশের পর জগৎচৈতন্যকে জানা শুরু হয়। সাধারণ মানুষের প্রাণশক্তি পরিবর্তিত হয়ে তার রূপ নেয়। তারা সেই অখণ্ড চৈতন্যের মধ্যেই থাকে। তখন মানুষ তাকে ভগবান, ব্রহ্ম, পরমব্রহ্ম তথা স্বস্বরূপ রূপে জানতে শুরু করে। আত্মিক জগৎ সম্পর্কে সাধারণ মানুষ ধারণা পেতে থাকে। জগৎ চৈতন্যের বিক্ষেপিত রূপ সাধারণ মানুষের মধ্যে সগুণ ব্রহ্মের বোধ জাগ্রত করে ও তার প্রতি তাদের ভক্তি জন্মে।

(গ) **ঈশ্বরলীলা:**- বিজ্ঞানীর দ্বিতীয় অবস্থা হ'ল, ধাপে ধাপে জগতের মহাকারণে লয় হওয়া। আত্মাসাক্ষাৎকারের পর আত্মাকে জানা শুরু হয়। আত্মাই তাঁর রূপ প্রকাশিত করতে থাকে, তাঁকে বিশেষভাবে জানা যায়। এই হল আত্মার সাধন যা সাধককে বস্তুতত্ত্বে আত্মার মধ্যে জগৎ—জগৎ বীজবৎ পরে জগৎ স্বপ্নবৎ অনুভূতি দান করে শেষে নির্গুণে লীন করে বোধাতীত করে তোলেন। এই আত্মার সাধন হল ঈশ্বরলীলা। ঈশ্বরলীলায় জগৎকে নিজের মধ্যে গুটিয়ে নিয়ে সাধক নিজের নির্গুণ স্বরূপের পরিচয় লাভ করেন, সচ্চিদানন্দ চিদ্‌ঘনকায় বিগ্রহ হয়ে ওঠেন। তখন আমিই এই সমগ্র জগৎচৈতন্য বোধ দৃঢ় হয়। আমি একাই আছি-এই একজ্ঞান হয়-ভক্তি থাকে না।

স্থিত সমাধিতে জ্ঞান জ্ঞেয় জ্ঞাতা কিছুই থাকে না। পরে এক অখণ্ড চৈতন্য সত্তার উপস্থিতি অনুভব করেন তত্ত্বজ্ঞানে। এই সত্তা যে তিনিই তা ক্রমে উপলব্ধি হয়। অর্থাৎ তুমি আমিতে পরিবর্তিত হয়। আমি একাই আছি বোধ হয়। এই উপলব্ধির পূর্ণ প্রকাশ ঈশ্বরলীলায়। তখন তিনি পরম এক, ব্যষ্টির সাধনে ব্রহ্মত্বের পূর্ণ প্রকাশ তথা সচ্চিদানন্দ চিদ্ ঘনকায় বিগ্রহ হয়ে ওঠেন।

রামায়ণে আছে কালপুরুষ এল রামের কাছে। বলল, প্রভু আমি আমার কর্তব্য করতে এসেছি- আপনার লীলা সংবরণের সময় হয়েছে তা জানাতে এসেছি। রাম বললেন, তুমি কর্তব্যজ্ঞানে আসোনি। আমি তোমাকে স্মরণ করেছি তাই তুমি এসেছ। অর্থাৎ রাম জানেন তিনি পরম এক— তার ইচ্ছাতেই সব হয়।

জীবনকৃষ্ণ রবিবাবুকে বললেন, তুই নিজে থেকে আমার কাছে আসিস নি। আমার প্রয়োজনে তোকে টেনে এনেছি তাই অফিস করে বাড়ী না গিয়ে তুই এখানে ছুটে এসেছিস। তাই রায়বাবুর বিরুদ্ধে আমার কেসের জন্য টাকা তুই দিবি না, আমার পকেট থেকে নিয়ে যা।

এই ঈশ্বরলীলার প্রকাশ ধারায় সাধারণ মানুষের মধ্যে তিনি নির্গুন ব্রহ্মরূপে প্রকাশ পান। তাকে নির্গুণ ব্রহ্মরূপে যখন মানুষ দর্শন করে তখন তার প্রতি তাদের প্রেম জাগতে শুরু করে। এটি তার ঈশ্বরলীলার প্রকাশ।

(ঘ) **দেবলীলা:**- ঈশ্বরলীলায় বিশ্বরূপকে জানা ও তার সংহত অবস্থা লাভ হলো। অতঃপর জগতকে নিজের রূপে রূপায়িত করে তাঁরই চিন্ময় রূপে সেই জগৎকে আবার বিক্ষেপ করেন বহুর অন্তরে দেবলীলায়। এ যেন একের বহু হওয়া। one is all তখন মানুষ রতন দর্শন হয়। তার সারা কপাল জুড়ে শ্বেত চন্দনের ফোঁটা, বরের মতো, তিনি হাততালি দিয়ে হরিনাম করেন। দ্রষ্টার হাতের তালু কিরকির করে। এ তার আত্মিক অবস্থাকে নির্দেশ করে। তখন তিনি অবতার হন। সচ্চিদানন্দগুরু লাভ থেকে শুরু করে মানুষ রতন হওয়া পর্যন্ত সমস্তই যে তার আত্মিক বিবর্তন- self evolution তা উপলব্ধিতে আসে। তিনি পরম ভক্ত। কারণ তিনি পরম এক—তিনিই বহু হন— জগৎ হন। সেই জগতের সাথে একাত্মতা অনুভব করেন। সেটিই ভক্তি। ছোট্ট দেহী কেন? কারণ তখন তার ব্যষ্টিতে সচ্চিদানন্দ চিৎঘনকায় অবস্থা। পরে আরও বিকাশ হবে। এই অবস্থাতেই মধুবিদ্যার প্রকাশ ঘটে। জীবনকৃষ্ণের মধুপাত দর্শন ও মধুমোছার দর্শন থেকে বোঝা যায় যে তিনি তার চেতনার বিক্ষেপ ঘটান তারই

আত্মিক জগতে এবং তারই রসাস্বাদন করেন ভিতরে। দর্শন করেন যে ছোট শিশুর দল তাকে বেদীতে বসিয়ে পুজো করে দেবত্বে প্রতিষ্ঠা করে। এই শিশুর দল হল দেবতা। তিনি দেবতা সৃষ্টি করে নিয়ে দেবলীলার আস্বাদন করেন ভিতরে এর বাহ্যপ্রকাশে মানুষ তাকে সচ্চিদানন্দগুরু রূপে দেখে। পরে তার বিক্ষেপিত জগৎকে গুটিয়ে নেন ভিতরে— All is One হয়। বিশ্বব্যাপীত্বের পর্যায়ে সচ্চিদানন্দ চিৎঘনকায় বিগ্রহ হয়ে উঠেন। ব্যষ্টির গণ্ডি অতিক্রম করে বৃহৎ ব্যষ্টি বা জগৎ চৈতন্য হয়ে ওঠেন। এরপর দেবলীলার দ্বিতীয় পর্যায়ের বিক্ষেপে তাকে ভিতরে দেখে অসংখ্য সাধারণ মানুষ। নতুন করে one is all হ'ল। মানুষ তাকে ভগবান, ব্রহ্ম ইত্যাদি রূপে দেখতে থাকে। তখনও দ্রষ্টাদের খন্ড চেতনা থাকে। অখন্ড চৈতন্যের ধারণা হয় না। পরে সেই জগৎকেও গুটিয়ে নিয়ে ভূমানন্দ অবস্থা লাভ করেন। এই অবস্থা লাভ হলে তাকে সমষ্টিচৈতন্য বলে। এই সমষ্টি চৈতন্যের ক্রিয়াশীলতায় মানুষ তাকে নির্গুণ ব্রহ্মরূপে, অখন্ড চৈতন্যরূপে দেখে ও তার ফলস্বরূপ আপন সত্তারূপে উপলব্ধি করতে থাকে। ধীরে ধীরে তিনি দ্রষ্টাদেরকে আত্মিকে তার সাথে এক করে নেন ও একত্ব দান করেন— All in One হয়। সাধারণ মানুষও ব্রহ্মত্ব লাভ করে, ব্রাহ্মণ হয়- ব্রহ্মকে চেনার উপযুক্ত হয়। তাদের ব্রেণ পাওয়ার বৃদ্ধি পায় ও একত্বের চেতনা তথা একজ্ঞান লাভ করে। এ হলো সাধারণ মানুষের মধ্যে তার দেবলীলার প্রকাশ। তিনি সাধারণ মানুষের ভিতর থেকে ক্রিয়াশীল হয়ে তাদের নর থেকে দেবতায় উন্নীত করেন। এখানেই অবতার লীলার পূর্ণ প্রকাশ।

স্মৃতিচারণ

শ্রীজীবনকৃষ্ণের পুতঃসঙ্গ লাভে ধন্য কিছু মানুষের টুকরো কিছু স্মৃতিকথা এখানে উল্লেখ করা হলো।

দিলীপ কুমার ঘোষ—

১. জীবনকৃষ্ণ একদিন ঘরে আলোচনা প্রসঙ্গে বললেন, ''ধন্য বাংলাদেশ, ধন্য এই বাঙালী জাতি। আত্মা সব দেহেই আছে—হটেন্‌টট্‌, এস্কিমোরও আছে। কিন্তু দেখুন না, পাঁচশো বছরের মধ্যে বাঙালীরা মহাপ্রভুকে পেল, ঠাকুরকে পেল in succession. এদের চেয়ে বড় জাত পৃথিবীতে আর কি আছে! কেশব সেন লিখছে ঠাকুর সম্বন্ধে, ''জগতে ইনিই এখন শ্রেষ্ঠ মানুষ। এই কথা শুনে শিববাবু করজোড়ে বললেন, ''তাহলে আপনার কাছে একটি নিবেদন আছে। বাঙালী জাত, বাংলাদেশ যদি এত বড় হয়, তা হলে তাদের এত দুর্দশা কেন? আমাদের ত ক্রমশঃ ঠেলে ঠেলে পিষে মেরে ফেলছে''। এর উত্তরে জীবনকৃষ্ণ বললেন, ''ও মশাই আপনি তো বাহ্য জগতের কথা বললেন। সিংহরায় মশাই তৎক্ষণাৎ বলে উঠলেন, ''ইনি স্পিরিচুয়াল ওয়ার্ল্ডের কথা বলছেন।'' শিববাবু এবার উত্তেজিত ভাবে বললেন, ''আমি তা জানি। কিন্তু তবুও ওনার কাছে আমার এই আরজি—বাংলাদেশের দুরবস্থা যেন ঘোচে। না হলে বাঙালী লুপ্ত হয়ে যাবে।'' এর উত্তরে শ্রীজীবনকৃষ্ণ বললেন, ''ও শিববাবু, বাংলাদেশ ছোট হয়ে যাচ্ছে, বাঙালী জাত লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে—তা কই? আমি তো দেখছি বাংলাদেশ বড় হচ্ছে—বাঙালী জাত পৃথিবীতে আধিপত্য বিস্তার করছে। ধরুন না এই কথামৃতের কথা—পৃথিবীর সমস্ত শ্রেষ্ঠ ভাষাতেই এর অনুবাদ হয়েছে। এখন, এই বই যারা পড়বে, ঠাকুরের কথা যারা পড়বে, তারা কি বাঙালীর ভাবধারার সঙ্গে অমনি যুক্ত হয়ে পড়ছে না? বাঙালীর ভাবধারাকে তারা শ্রেষ্ঠত্ব দান করছে। কারণ তারা পড়ছে, ভাবছে। একজন ইংরেজ যখন ঠাকুরের কথা পড়ছে, একজন আমেরিকান যখন ঠাকুরের কথা পড়ছে, তখনই সে বাঙালী হয়ে যাচ্ছে। তা হলে বাংলাদেশ ছোট হচ্ছে কোথায়? সারা বিশ্বই তো দেখছি বাংলাদেশে পরিণত হয়ে যাচ্ছে।

২. কদমতলার ঘরে একবার এক সাধু এসেছিলেন। তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের

জীবন অবলম্বন করে একটি নাটক রচনা করেছিলেন। সেই নাটকের পাণ্ডুলিপি থেকে তিনি জীবনকৃষ্ণকে পড়ে শোনাতে লাগলেন। এক এক জায়গা থেকে উনি পড়ছেন আর জীবনকৃষ্ণ শুনে ওই অংশ কোথায় পেয়েছেন তা জানতে চাইছেন। সাধুটি তার যথাযথ উত্তর দিতে পারছেন না। আমরা বুঝতে পারছিলাম যে নাটককে জনপ্রিয় করার জন্য কি ভাবে কিছু পপুলার আইডিয়া ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। যেখানেই অসঙ্গতি দেখছেন, জীবনকৃষ্ণ বলছেন, ‘‘এটি কোথায় পেলেন’’? সাধুটি তার সঠিক উত্তর দিতে পারছিলেন না। সেদিনই আমাদের সাথে জীবনকৃষ্ণের পার্থক্যটি বুঝতে পারছিলাম। আমাদের পক্ষে কখনোই বোঝা সম্ভব নয় কোনটি অনুপ্রবিষ্ট অংশ আর কোনটি সত্য। এক সময় ওই সাধু বললেন, ‘‘আমি যে সিনটাতে ঠাকুরকে একটু বোঝাবার চেষ্টা করেছি সেটা পড়ি।’’ একথা শোনা মাত্র জীবনকৃষ্ণ রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে উঠলেন। বললেন, ‘‘আপনি কি বললেন! ঠাকুরকে বোঝাবেন? রামকৃষ্ণের ‘র’ এর ফুটকিটি বোঝাবার মত আধার পৃথিবীর আর কারো কখনও হবে না। সে এত বড়। বুঝলেন?’’ কথাটি বলেই তিনি সমাধিস্থ হয়ে গেলেন। সমাধি ভঙ্গের পর সাধুর থুতনিতে হাত দিয়ে বললেন, ‘‘ও বন্ধু, সে যে কত বড় তা আমি তোমায় বোঝাবো কি করে।’’ কিছুক্ষণ পর সাধুটি বললেন, ‘‘আমি বুঝেছি, আপনি খুব কষ্ট পাচ্ছেন। এবার যদি আসি, এসব নিয়ে আর আসবো না, উপদেশ প্রার্থী হয়ে আসবো।

সাধুটি নাটক রচনা করেছিলেন। এবার তিনি সাধুটিকে নাটক দেখা প্রসঙ্গে একটি ঘটনা বললেন। উনি বলতে শুরু করলেন—এখানকার একটা ঘটনার কথা বলি। কিছুদিন আগে ভবানীপুরের দিকে কালিকা থিয়েটারে ঠাকুরের সম্বন্ধে একটি থিয়েটার হয়। নাম ‘‘যুগাবতার।’’ অভিনয় খুব চমৎকার হয়েছিল। তা এখানকার কয়েকজন আমায় খুব ধরাধরি করলে ওই অভিনয় দেখবার জন্য। আমি তো কিছুতেই গেলুম না দেখে শেষে তারাই গিয়ে দেখে এলো। তারপর একদিন নগেনবাবুকে ধরলুম—তার সহজিয়া সমাধি লাভ হয়েছিলো। কথা বলতে বলতেই তিনি সমাধিস্থ হলেন। সমাধি ভঙ্গের পর বললেন, আহা! বড় আশা করেছিলুম। যাই হোক, তাকে বললুম, ‘‘থিয়েটার যাবার আগে একবারও কি মাথায় উঠলো না যে অতক্ষণ বসে বসে নারীর মুখ দেখবো কি করে! আপনারা সাধু হয়েছেন, সন্ন্যাসী হতে পারেননি। যার সন্ন্যাস হয়েছে সে কখনোই নারীর মুখ দেখবে না। নারীর সঙ্গ সে সহ্য করতে পারবে না।

যদি বলেন কেন? ওই তো, ঠাকুরও গেছিলেন। তার উত্তর হলো, ও ঠাকুর। আর আমরা তার কুকুর, হ্যাঁ তাই।"

৩. ১৯৫৮ সালের মে মাসে একদিন কেষ্ট মহারাজ-এর দর্শন প্রসঙ্গে বললেন, কেষ্টদা কয়েকদিন আগে দক্ষিণেশ্বরে ধ্যানে দেখছে অসংখ্য লোক ছাতি মাথায় দিয়ে যাচ্ছে আর আমি মরে গেছি। দেখেই তো দে ছুট। তারপর দ্যাখে আমি এখানে বসে দিব্যি ঘড় ঘড় করে নিঃশ্বাস নিচ্ছি। এই কথা শুনে আমরা ঘরের সকলে হো হো করে হেসে উঠলাম। তারপর জীবনকৃষ্ণ কেষ্ট মহারাজকে বললেন, এর মানে কি জানো? যতদিন না এই অসংখ্য লোকের সচ্চিদানন্দগুরুর আশ্রয় লাভ হচ্ছে ততদিন পর্যন্ত আমার দেহ যাবে না।

৪. ওই বছরই অর্থাৎ ১৯৫৮ সালের মে মাসে একদিন পাঠ ও আলোচনা শেষে আমরা কয়েকজন বসে আছি। উনি বললেন, কাল সকলেই চলে যাবার পর সুধীন আর নগেন বাবুকে বলছিলুম, দ্যাখ, ভাবনা-চিন্তা বলে কোন কিছু কোনদিন আমার মাথায় ছিল না। এ ক'দিন আমার মাথায় এক ভাবনা ঢুকেছে, কি করে এ জিনিস (অর্থাৎ সকলের তাঁকে দেখা) হবে? কবে হবে? তারপর একটু থেমে বললেন, এ ভাবনার অপর নাম ব্যাকুলতা। এখন ব্যাকুলতা হচ্ছে কেমন করে এ জিনিস জগৎময় ছড়াবে! আমি যেন এক দায়ে ঠেকেছি।

অনাথনাথ মণ্ডল—

১. ১৯৬৭ সালের জুলাই মাসের একদিনের কথা মনে পড়ছে। তখন তিনি বেশ অসুস্থ। ওই অবস্থাতেও তিনি ভিতরের চিন্তন এবং মননের যে কোন গভীরতায় চলে যেতেন তা ভাবলেও অবাক লাগে। সেদিন তিনি বলছিলেন, ঠাকুর বলছেন ব্রহ্মজ্ঞান মানুষকে জড় করে। তা এখন দেখছি আমার মাথাটা বাদ দিয়ে সমস্ত তো জড় হয়ে গেছে। মাথাটি বাদ দিয়ে বলছি এইজন্যে যে আজ সকালে পায়খানা থেকে এসে ধ্যান করলুম না। এই ক'দিন ধরেই ধ্যান করছি না। কারণ ভয় হয় যদি কিছু হয়। তাই শুয়ে পড়লাম বিছানায়। শুয়ে শুয়ে ভাবতে লাগলাম। আচ্ছা অজিত মাষ্টার কি করে ওই রকম দেখলো। ওহো, বুঝতে পারলুম, ওর Brain এর cell গুলো আমাতে পরিবর্তিত হয়ে গেছে, তাই জন্য ও পাঠক ও শ্রোতা সকলের মুখ আমার মুখ দেখছে। কি দেখছে? দেখছে, ''ত্বং জাত ভবসি বিশ্বতমুখঃ''। কোন অতীত যুগে ঋষি এই

বস্তুর কথা বলেছে। সে কোন যুগের কথা কেউ নির্ণয় করতে পারে না। কারণ যখন সংস্কৃত ভাষা হয়ে এই সমস্ত উপনিষদ লেখা হয়েছে তখন তারা বলছে আমরা শ্রুতি লিখছি। এ থেকে বোঝা যায় একটা জিনিস বা চিন্তা বাস্তবে ফুটতে এত দীর্ঘ সময় লাগে। অর্থাৎ মানুষের দেহগুলো তৈরী হতে এত সময় লাগে। ফ্রয়েড বলছে, সন্তানের মা-বাবা যা চিন্তা করে তা সন্তানের ভেতর বাস্তবে রূপ নেয়। কিন্তু আত্মা সাক্ষাৎকারের পর আর মা থাকে না, তখন বাবা। মা হচ্ছে আগম। আর বাবা হচ্ছে নিগম। সেজন্য নিগমে দেখায় বেদের ঋষির অবতরণ। আজ একটা নতুন জিনিস বেরোলো তো! মা-আগম আর বাবা নিগম। তাই বেদে দেখা যায় একদল ঋষি, তারা কেবল নিগম নেয়, আগম চায় না। আর চিন্তার কথা নিয়ে আমি আগে বলতাম, কেউ যদি কোন সৎ চিন্তা নিয়ে দেহত্যাগ করে, তার চিন্তা পরবর্তী যুগে ফুটে উঠবেই। কী করে হয়? কারণ প্রত্যেক মানুষ কি অতীত, কি বর্তমান, সব হচ্ছে তুই, সব হচ্ছে আপনি। অতএব একই আছে—এক আত্মাই আছে।

ক্ষিতীশ চন্দ্র রায় চৌধুরী—

একটা ঘটনার কথা বলি। ডিউটি উপলক্ষে রানীগঞ্জ স্টেশন মাস্টারের ঘরে বসে আছি। এমন সময় এক গেরুয়াধারী আগন্তুকের আবির্ভাব ঘটলো। স্টেশন মাস্টার শশব্যস্ত হয়ে অভ্যর্থনা করলেন। পরিচয় সূত্রে জানা গেল তিনি একজন ত্রিকালদর্শী পুরুষ। মুখ চোখের ও দেহের লক্ষণ দেখে ও কোষ্ঠী এবং কররেখা না দেখে প্রয়োজন বোধে দু-একটা প্রশ্ন করে তিন কালেরই একটা ছবি বলে দিতে পারেন। আমার এ বিষয়ে বরাবরই কৌতূহল ছিলো। আমার ও রাধুর বিষয়ে গতানুগতিক ভাবে বেশ কিছু কথা মিলেও গেল।

কলকাতায় পৌঁছে জীবনকৃষ্ণের ঘরে গিয়ে বসতেই কুশলাদি প্রশ্নের উত্তর দিয়ে সুযোগ বুঝে ত্রিকালদর্শী বৃত্তান্তটি সংক্ষেপে বললাম। শুনেই বললেন, শুধু শুনেই গেলি? কিছু বললি না? ওরে এসব শুনতেও নাই, ভোগের আকাঙ্ক্ষা জাগে।

এসব বিষয় কেউ বিশ্বাস করে আবার কেউ এসব মানতে চায় না, এটা জানি। কিন্তু এসব যে শুনতেও নাই, একথা যুক্তি সহ এই প্রথম শুনলাম। বেশ অদ্ভুত লেগেছিল জীবনকৃষ্ণের প্রতিক্রিয়া দেখে।

আনন্দ মোহন ঘোষ—

নানা স্থানে পাঠচক্র গড়ে ওঠায় ও ঘরের অনেকেই সেই সব পাঠচক্রে পাঠে নিযুক্ত থাকায় কদমতলার ঘর বেশ খালি। একদিন আমরা তিন চার জন আছি। জীবনকৃষ্ণ হাসতে হাসতে বললেন, যাক সব পাঠ করতে গেল। আয় আমরা আপনার করে বসি। তারপর বললেন, ওরা কি পাঠ করছে বল দেখি বাবা? বাবা, এই জগত তোরও নয় আমারও নয়। ভগবানের জগত। ভগবান যা করেন তাই হয়। আয় আমরা ঠাকুর ঠাকুর করি। আর ঠাকুরকেই বা কয়জন বুঝেছিল? একদিন দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের ঘরে ভক্তের ভিড়। ঠাকুর তাদের বললেন, পঞ্চবটিতে ভৈরবী এসেছে, দ্যাখ গে যাও। সকলেই ছুটলো, কেবল মাস্টার মশাই ছাড়া। তারই ঠিক ঠিক সন্ন্যাস হয়েছিল। কেননা ভৈরবী মেয়েছেলে, তাকে দেখলে নারী দর্শন হবে। তাই মাস্টার মশাই গেলেন না। বাবা মহামায়ার জগৎ, দৈব রক্ষা না করলে কোন উপায় নাই। তাই সদাই ত্রাহীমাম্ ত্রাহীমাম্। সন্তর্পণে থাকতে হয় বাবা, ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করতে হয়।

জিতেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়—

১৯৬০ সালের মার্চ মাসে একদিনের কথা। ঘরে আলোচনা প্রসঙ্গে জীবনকৃষ্ণ বললেন, ‘‘২২/২৩ বছর বয়সে স্বপ্নে চণ্ডীদাসকে দেখেছিলুম। সেই সময় যে সব নাটক লিখেছিলুম তাতে অনেক পদাবলী লিখতে হয়েছে, শিখেছিলুম চণ্ডীদাসের কাছ থেকে।

চণ্ডীদাস মানুষরতন দর্শন করে ‘‘সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই’’ এই কথার দ্বারা মানুষের ভিতর যে এক চৈতন্যময় পুরুষ আছে, সেই মানুষই সত্য, সেকথা বোঝাতে চেয়েছেন। কিন্তু পদকর্তারা পদাবলী রচনা করতে গিয়ে অন্তরের মানুষটির সাথে একত্বের কথা না বলে দ্বৈতবাদে কাল্পনিক ঈশ্বরের ভক্তিরসে মানুষকে আবেগাপ্লুত করেছেন ও কল্পনার জগতে ঠেলে দিয়েছেন। তাই জীবনকৃষ্ণকে তার পদাবলীতে দ্বৈতবোধ থেকে অদ্বৈত বোধে উত্তরণের কথা লিখতে হয়েছে। ‘‘বোধিসত্ত্ব’’ নাটকের একটি পদে তিনি লিখেছেন, ‘‘মরণ না হলে পিরীতি না হয় পিরীতির ধারা ভনে’’।

NOTE